কন্যাপীঠ

মণিলাল

: এই লেখকের অন্যান্য বই :

উপন্যাস

স্বয়ং সিদ্ধা ১ম ও ২য় পর্ব
অপরাজিতা
স্বয়ংবরা
রাগিনী
জাতিস্মর
পরম পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ
নতুন বৌ

ছোটদের জন্য

রানী লক্ষ্মীবাঈ
দুই ভাই
ছোট থেকে বড়
মন্দ থেকে ভালো
বাংলা মায়ের শহীদ ছেলে
নির্বাসিতা রাজকন্যা

নাটক

পেশোয়া বাজীরাও
ঝাঁসীর রাণী

কন্যাপীঠ

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানী
কলিকাতা-১২

সমর্পণ

আদবিণী বধূমাতা—পরম কল্যাণীয়া

শ্রীমতী চিন্ময়ী দেবীকে

এই গ্রন্থখানি সস্নেহে দিলাম।

আশীর্বাদক

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

পরিচয়

স্বাধীন ভারতে জাতির পারিবারিক সমস্যাগুলির মধ্যে 'পণপ্রথা'ই বর্তমানে অন্যতম সর্ব ভারতীয় সমস্যারূপে পরিচিত। এই সমস্যার চাপে মধ্যবিত্ত সমাজের জীবনযাত্রা দুর্বহ হইয়া উঠিতেছে বলিয়াই কেন্দ্রীয় পরিষদে ইহার সমাধানকল্পে একটি 'বিল' উত্থাপিত হইবার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় এবং যদিও তাহা বিধিবদ্ধ হয় নাই, তথাপি সম্ভাবনাও লুপ্ত হয় নাই। পণ-প্রথার অনিষ্টকারিতা অভিজ্ঞতাসূত্রে উপলব্ধি করা সম্ভব হইয়াছিল বলিয়াই এ-সম্পর্কে অনেকগুলি গল্প এবং "কুমারী সংসদ" নামে একখানি উপন্যাসও সযত্নে রচনা করি। পাঠক মহলে সেগুলি সমাদৃত হয়। ঐ সকল গল্প ও উপন্যাস বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হওয়ায় বুঝিতে পারা যায় যে, পণপ্রথার প্রখর চাপে শুধু বাঙালীর জাতীয় জীবন নহে, ভারতের বিভিন্ন সমাজ-জীবন নিষ্পেষিত হইতেছে। এমন কি উপন্যাসে বর্ণিত 'কুমারী সংসদ'-এর অনুকরণে প্রগতিশীলা মহিলারা নানাস্থানে পণপ্রথা নিবারণী সংস্থা খুলিয়া প্রতিকারে অবহিত হইয়াছেন, এমন সংবাদও পাওয়া গিয়াছে। 'কুমারী সংসদ'-এর পর কন্যাপীঠ রচনার বিশেষ সার্থকতাও আছে। উপন্যাসখানি প্রথমে "ঊষা" পত্রিকায় ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হয়, পরে এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানীর আগ্রহে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হই ।

৪২, বাগবাজার ষ্ট্রীট, কলি-৩
আশ্বিন, ১৩৬২
ইং সেপ্টেম্বর, ১৯৫৫

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

এক

মধ্য ক'লকাতায় মহিলা কলেজের ছাত্রীরা প্রিন্সিপালের অনুমতি নিয়ে 'স্নেহলতা কন্যাপীঠ' নামে একটি সংস্থা খুলেছে—প্রতি শনিবার ছুটির পর ডিবেটিং রুমে মেয়েদের সভা বসে। পাঠক-পাঠিকাদের স্মরণ থাকতে পারে, অগ্নিযুগে বাঙ্গলার ছেলেরা যখন নেতাদের ইঙ্গিতে জাতীয় আন্দোলনে বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করেছে, সেই সময় এই সহরের একাংশে দুঃসাহসিকা কুমারী স্নেহলতা পণপ্রথার চক্রে পিতামাতাকে নিষ্পেষিত দেখে রাজপুত বহ্নিবালাদের পদাঙ্ক অনুসরণে জ্বলন্ত অগ্নিমুখে আপনাকে সমর্পণ ক'রে তাঁদের নিষ্কৃতি দিয়েছিলেন। সেই শহীদ কুমারীর নামেই ছাত্রীদের এই সংস্থা। স্বাধীনতা যুদ্ধের শহীদ তরুণদের স্মৃতি-পূজার অনুসরণে—পণপ্রথার বহ্নিতে শহীদ কুমারী স্নেহলতা দেবীর আত্মাহুতির সেই স্মৃতিকে এঁরা জাতীয় জীবনে জাগ্রত ও স্মরণীয় করতে সচেষ্ট হয়েছেন।

সেদিন ছুটির পর বৃহৎ হলঘরটির মধ্যে কলেজের মেয়েরা সমবেত হয়েছে! উঁচু একটি টেবিলের উপর বেদীর মত শুভ্র বস্ত্রাবৃত আধারে স্নেহলতার পুষ্পমাল্য-ভূষিত আলেখ্যটি স্থাপিত হয়েছে। ধূপ ও ধূনাগুগ্‌গুলের সুগন্ধ ধুম্রে ঘরখানি সমাচ্ছন্ন। সভানেত্রী, সম্পাদিকা, সদস্যা এবং সাধারণ সভ্যাগণ প্রতিকৃতির পুরোভাগে দাঁড়িয়ে সমবেত কণ্ঠে স্নেহলতার প্রশস্তি-গান করছেন। গানের পর সভার কাজ আরম্ভ হবার কথা।

কুমারী লীলা দেবী হচ্ছেন সংস্থাটির স্থায়ী সভানেত্রী—ইনিও এই কলেজের একজন অধ্যাপিকা। বছর দুই পূর্বে ছাত্রী ছিলেন, কিন্তু কৃতিত্বের সঙ্গে এম-এ পাশ করে এই কলেজেই অধ্যাপনায় যোগ দিয়েছেন। বিবাহের বয়স উত্তীর্ণ হলেও ইনি এখনো পর্যন্ত অনূঢ়া এবং ছাত্রীদের বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্রী।

এঁর পরেই সম্পাদিকা রেখা দেবীর নাম করতে হয়! অষ্টাদশী তরুণী—চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রী, অত্যন্ত প্রতিভাময়ী ও বাক্‌পটিয়সী। সদস্যাগণের মধ্যে সুবর্ণা রায়, গৌরী সেন, সাধনা সোম, গীতা স্যান্যাল, কমলা বাগ্‌চী, সুপ্রভা গুপ্তা, শীলা বোস প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণী থেকে বেছে বেছে কার্যকরী সমিতির সদস্যাদের গ্রহণ করা হয়েছে। কলেজের অধিকাংশ মেয়েই সাধারণ সভ্যারূপে সংস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্টা ও যথারীতি চাঁদা দিয়ে থাকে।

সভারম্ভের পূর্বে প্রত্যহ যে প্রশস্তি গানটি সমবেতকণ্ঠে গীত হয়ে থাকে, তার মর্ম হচ্ছে: স্বাধীনতা লাভের পর দেশবাসী যেমন অগ্নি-যুগের শহীদদের স্মৃতিপূজা করে ধন্য হচ্ছেন, সেই আদর্শে আমরা, বাঙলার কুমারীরাও আমাদেরই মত এক কুমারী-কন্যা—যিনি নিষ্ঠুর পণপ্রথার বহ্নিতে প্রথম আত্মাহুতি দিয়েছেন,—স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে তাঁকেও স্মরণ করছি, আর বিধাতার নিকট প্রার্থনা জানাচ্ছি যে, বীর শহীদদের আত্মদানের জন্যই যেমন দেশ স্বাধীনতা লাভ করেছে, তেমনি সেই শহীদ কুমারী স্নেহলতার আত্মদান দেশের কুমারী কন্যাদের পরিত্রাণের উপলক্ষ হোক; বিলুপ্ত হোক কুখ্যাত পণপ্রথা—জয়ধ্বনি উঠুক কুমারী-কণ্ঠ থেকে মৃত্যু-বিজয়িনী স্নেহলতার নামে।

গানের পর সভানেত্রী লীলা দেবী বললেন: কন্যাগণ! তোমরা শুনে আনন্দিত হবে, আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে চলেছে। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের কন্যাগণও আমাদের কাজের সমর্থন ক'রে

সহানুভূতি জানিয়েছেন। আমাদের কেন্দ্রীয় পরিষদে পণপ্রথা উচ্ছেদের জন্য শীঘ্রই আইন রচিত হবে। পণপ্রথার উচ্ছেদ হোক, ভারতের কন্যাগণ শক্তিমতী হোক, এই কামনা করি। বন্দে মাতরম্।

সমবেত মেয়েরা ঘন ঘন করতালি দিয়ে ও 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি তুলে আনন্দ জ্ঞাপন ক'রল।

এই সময় সম্পাদিকা রেখা দেবী বললেন: দুখানি চিঠি এসেছে, সভানেত্রীর অনুমতি নিয়ে আমি পড়ছি। প্রথম চিঠির লেখক ছদ্মনাম ব্যবহার করেছেন। সে নামটি হচ্ছে—ভীমরুল। তিনি লিখেছেন: 'না জাগিলে এই ভারত ললনা, এ ভারত আর জাগে না, জাগে না, কবির এ গানটি খুব খাঁটি। কিন্তু আর একটা চলতি কথা আছে—'সোজা আঙ্গুলে ঘি ওঠে না।'…এটাও ফেলনা নয়। সময় বিশেষে অশিষ্ট ও অর্বাচীনদের দুরস্ত করবার জন্য বাঁকা পথ ধরতে হয়। আপনাদের সংস্থা হচ্ছে মেয়েদের নিয়ে, যতই সাহস আপনাদের থাক, কার্যকালে কঠিন হয়ে জোঁকের মুখে নুন দেওয়া হয়ত সহজসাধ্য হবে না। পণপ্রথার জাঁতায় নিষ্পেষিত হয়ে আমি এর উচ্ছেদের জন্য—কন্যাদের অনিষ্টকারীদের সায়েস্তা করবার জন্য অনেকদিন ধরেই সাধনা করছি। যদি প্রয়োজন হয়, সর্বান্তঃকরণে সাহায্য করতে আমি প্রস্তুত। আপনাদের মত আমিও দৃঢ়ব্রত; আমাকে বিশ্বাস করুন।

চিঠি শুনে সভায় একটা চাঞ্চল্য উঠল—বিভিন্ন চাপা কণ্ঠ থেকে স্বর নির্গত হ'লো—

—ভীমরুল!

—ওরে বাবা—সে আবার কে!

—মানুষ আবার ভীমরুল হয় নাকি?

লীলা: চুপ চুপ—

রেখা: আর একখানা চিঠি আছে—পড়ি। পত্রখানি একটি

কুমারী মেয়ের কাছ থেকে এসেছে,—তিনি লিখেছেন : আপনারা সমিতি খুলেছেন পণপ্রথা তোলবার জন্য। কিন্তু এই সহরের বুকের উপরে 'কন্যা-দায়োদ্ধার সমিতি' খুলে কুমারী মেয়েদের মাথা খাবার যে ব্যবস্থা হয়েছে—সে খবর রাখেন কি? এরা বিনা পণে মেয়ে পার ক'রে দেয়, বিয়ের খরচ-খরচা সব পাত্রই বহন করে। কিন্তু সে সব পাত্রের বানপ্রস্থ অবলম্বনের বয়স হয়েছে—পরপারে পাড়ি দেবার দিন বেশী বাকি নেই, অথচ শেষ বয়সে নাতনীর বয়সী কনের হাতের মালা গলায় পরতে সখটুকু পূর্ণ মাত্রায় আছে। এমনি এক বাহাত্তুরে বুড়োর গলায় আমাকে ঝুলিয়ে দেবার চক্রান্ত চলেছে! পারবেন আমাকে রক্ষা করতে? আমার ঠিকানা দিলাম, কিন্তু সাবধান—যেন জানাজানি না হয়, তাহলে আমার আর নিস্তার নেই।

চিঠিখানা শুনতে শুনতে মেয়েরা চঞ্চল হয়ে উঠল। বিভিন্ন কণ্ঠ থেকে ঝংকার উঠল : ঝাঁটা মারো, ঝাঁটা মারো।

এযে আরো ভয়ানক।—বুড়োকে-নিমতলা পাঠাও।

—সত্যিই আগে এর বিহিত করা উচিত।

এইভাবে অনেকেই মন্তব্য প্রকাশ ক'রে গায়ের ঝাল মেটাতে লাগল।

সভানেত্রী সকলকে শান্ত ক'রে ব'ললেন : সত্যি, রাগ হবার কথাই বটে। সমাজে কত রকমের জীব যে আছে ভাল করে না মিশলে জানা যায় না। যাই হোক, ত্নখানা চিঠিই ফাইলে রাখো, ওদের ত্নজনকেই ধন্যবাদ দিয়ে জবাব দেওয়া হবে। আর, আমি নিজেই চিঠি ত্নখানার তদন্ত ক'রে ফলাফল আসছে শনিবার সভায় তোমাদের জানাব। মোট কথা, এই মেয়েটিকে আমরা রক্ষা ক'রবই।

সভানেত্রীকে ধন্যবাদ দিয়ে সেদিনের অধিবেশন শেষ হল।

দুই

সিমলা অঞ্চলে একখানি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বাড়ী। চারদিকে সুশ্রী প্রাচীর—সামনেই ঝুলবারাণ্ডার নিচে একটু বাগান। কোলাপ্‌সিব্‌ল গেটযুক্ত মজবুত ফটক। বাড়ীর মালিকের নাম সদানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়! বয়স ষাট পার হয়ে গেলেও দেহ এখনও বেশ নিটোল ও মজবুত, প্রিয়দর্শন গম্ভীর মূর্তি, সুপুরুষ। এডভোকেট থেকে যুক্ত-প্রদেশের সর্বোচ্চ বিচারালয়ের বিচারপতির আসন অলংকৃত ক'রেছিলেন সদানন্দবাবু। সম্প্রতি অবসর নিয়ে ক'লকাতায় এসেছেন। বাড়ীর অনুপাতে পরিজন অল্প। সদানন্দবাবু বিপত্নীক। একমাত্র পুত্র শঙ্কর ও কন্যা রেখাকে নিয়েই তাঁর বর্তমান সংসার। ঘটনাচক্রে পুত্রকন্যার সঙ্গে পিতার ঘনিষ্ঠতাও বেশী দিনের নয়। সিমলা অঞ্চলে মাতুলালয়ে থেকেই এরা লালিত-পালিত, বর্ধিত ও উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়েছে। অবসর প্রাপ্তির পর ক'লকাতায় এসে এই নূতন বাড়ীতে পুত্রকন্যাকে এনেছেন তিনি—সেও খুব বেশী দিনের কথা নয়।

পুত্র শঙ্কর ইংরিজীতে এম-এ পাশ ক'রে পুনরায় বাঙলা ভাষায় এম-এ দেবার জন্য পড়াশোনা ক'রছে। সাহিত্যের দিকে গভীর নিষ্ঠা তার। একটা ছাপাখানা খুলে পাবলিসিং বিজনেস করবার বাসনাও আছে। ছেলের মনের ইচ্ছাটা কন্যার মুখেই সদানন্দবাবু শুনেছেন। কিন্তু কোন অভিমত প্রকাশ করেন নি কিম্বা আপত্তিও তোলেন নি। কাজেই রেখা দাদাকে বলেছে—পরীক্ষাটা হ'য়ে যাক, তখন কথাটা ভাল ক'রে পাড়া যাবে। গম্ভীরমুখ পিতার সঙ্গে

শঙ্করের কথাবার্তা অল্পই হয়, কিন্তু রেখাকে তাঁর সেক্রেটারীর কাজ করতে হয় ব'লে কথাবার্তা বলবার সুযোগসুবিধা তার যথেষ্টই আছে।

সেদিন বিকালের দিকে সদানন্দবাবু একখানা খবরের কাগজ পড়ছিলেন, আর রেখা তাঁর টেবিলের সামনের চেয়ারখানিতে ব'সে পুরানো কাগজগুলি র‍্যাকের উপর সাজিয়ে রাখছিল। সহসা সদানন্দবাবু কাগজ থেকে মুখ তুলে জিজ্ঞাসা ক'রলেন: এই বিজ্ঞাপনটার উপর লাল পেন্সিলের দাগ কে দিলে?

সপ্রতিভকণ্ঠে রেখা বলে উঠল: আমি দিয়েছি বাবা! আমাদের কন্যাপীঠে ঐ লোকটি একখানা চিঠি লিখেছেন কিনা, তাই বিজ্ঞাপনটা দাগ দিয়ে রেখেছি।

মৃদু হেসে সদানন্দবাবু ব'ললেন: বটে! ভারি মজার বিজ্ঞাপন ত! বলছে—বিবাহ ও বিভিন্ন ব্যবসায়ের নামে যেসব অনাচার দেশে চলেছে, তার প্রতিকারের ভার নিতে 'ভীমরুল' সর্বদাই প্রস্তুত।...পোষ্ট বক্সে লিখুন।

রেখা সহাস্যে বলল: আমাদের কিন্তু লিখতে হয় নি, ভীমরুল নিজেই লিখেছেন।

সদানন্দবাবু জিজ্ঞাসা করলেন: কি লিখেছেন?

রেখা উত্তর দিল: সোজা আঙ্গুলে ঘি ওঠে না, কোন দুষ্ট দুরন্ত লোককে দুরস্ত করবার প্রয়োজন হ'লে ওঁকে যদি জানান হয়, উনি সে দায়িত্ব নিতে পারেন।

সদানন্দ: তোমরা জেনেছ—আসলে ভীমরুলটি কে?

রেখা: এখনো জানা যায় নি; আমাদের প্রেসিডেণ্ট লীলাদি সে ভার নিয়েছেন।

সদানন্দ: তোমাদের সমিতির নামটা...

রেখা: আপনি খালি খালি ভুলে যান বাবা! নামটি হচ্ছে—স্নেহলতা কন্যাপীঠ।

সদানন্দ : হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঐ নামই বটে! বছর কতক আগে ঐ স্নেহলতা যখন গায়ে কেরসিন ঢেলে তার উপর দেশলাই জেলে আত্মহত্যা করে, খবরের কাগজে তাই নিয়ে খুব লেখালেখি হ'য়েছিল মনে আছে। আমি তখন এলাহাবাদে প্র্যাকটিস্ করি। ঐ নামে তোমাদের সমিতি খোলাটা ভারি রোম্যান্টিক হয়েছে। হ্যাঁ, এখন নামটি জিজ্ঞাসা করবার উদ্দেশ্য হচ্ছে—তোমাদের সভার মত আর একটা সভার বিজ্ঞাপনও কাগজে বেরিয়েছে, দেখ নি?

রেখা : কই না—

—এই দেখ।...বলেই সদানন্দবাবু হাত বাড়িয়ে কাগজখানা কন্যার হাতে দিলেন, বিজ্ঞাপনটি দেখিয়ে। রেখা এক নিশ্বাসে ছাপা ছত্র কয়টি স্পষ্ট গলায় প'ড়তে লাগল : 'বয়স্থা কুমারীদের বিনা পণে পাত্রস্থা করতে চান ত 'কন্যাদায়োদ্ধার সমিতি'তে আসুন।'

সদানন্দবাবু একটু গম্ভীর হয়ে বললেন : দেখ দেখি এদের Object কেমন Constructive, গরীবের ঘরের অরক্ষণীয়া মেয়েদের বিয়ে দিয়ে অভিভাবকদের দায়োদ্ধার ক'রতে চায়। আর তোমাদের সমিতি হচ্ছে Destructive—তোমরা চাও বিয়ে বন্ধ করতে।

মুখখানা শক্ত করে রেখা ব'লে উঠল : আমরা চাই পণপ্রথা বন্ধ করতে বাবা! এদের এই বিজ্ঞাপন প'ড়ে আমার মনে কিন্তু ভারি ধোঁকা লাগছে।

সদানন্দবাবু জিজ্ঞাসা করলেন : কেন?

রেখা উত্তর করল : আমরা এই সমিতির বিরুদ্ধে একটি মেয়ের কাছ থেকে একখানা সাংঘাতিক চিঠি পেয়েছি!

বিস্ময়ের সুরে সদানন্দবাবু বললেন : তাই নাকি? কি লিখেছে সে মেয়েটি?

রেখা বলল : ঐ সমিতিটা নাকি বয়স্থা মেয়েদের ফাঁদে ফেলবার

একটা জালের মত। বিয়ের সব কিছু খরচ যুগিয়ে বিয়ে পাগলা বুড়োরা নাকি বয়স্থা মেয়েদের বিয়ে করে। এমন ক'রেই হয় গরীব বাপের কন্যাদায় উদ্ধার! ঐ মেয়েটি লিখেছে বাবা, ঐ সমিতি তাকেও এক বুড়োর পাল্লায় ফেলেছে, মুক্তির আশায় সে আমাদের সাহায্য চেয়েছে।

সদানন্দবাবু বললেন: বা! সংগে সংগে ভীমরুলও অমনি পাখা মেলেছে—তবে আর ভাবনা কি! আচ্ছা, সেই মেয়েটির নামটা—

রেখা জানাল: নিরলা রায়।

মনে মনে কি ভেবে সদানন্দবাবু নামটি তাঁর ক্ষুদ্র নোট বুকে টুকে নিলেন।

প্রথম যৌবনে সদানন্দবাবু যখন এলাহাবাদ হাইকোর্টে য়্যাড-ভোকেটরূপে প্র্যাকটিস ক'রে লব্ধপ্রতিষ্ঠ, সেই সময় বর্ষীয়ান বিচারপতি নবগোপাল মুখোপাধ্যায়ের একমাত্র কন্যাকে বিবাহ ক'রেছিলেন—কিন্তু সে বিবাহ সুখের হয় নি। তিন বৎসর পরেই শিশুপুত্র জয়ন্তকে রেখে জজদুহিতা মনোরমা অকালে দেহত্যাগ করেন। সদানন্দবাবু স্থির ক'রলেন, পুনর্বিবাহের বয়স থাকা সত্ত্বেও মাতৃহীন শিশুর মুখ চেয়ে তিনি আর দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ ক'রবেন না। বছর কয়েক পরে পুত্রকে মাতামহ মাতামহীর কাছে রেখে তিনি ক'লকাতায় বেড়াতে গেলেন এবং অল্পকাল মধ্যেই ক'লকাতা হাইকোর্টের এক এটর্নীর কন্যাকে বিবাহ করতে বাধ্য হলেন। কিন্তু সে বিবাহের পরিণামও শুভ হ'লো না—যমজ পুত্রকন্যা প্রসব ক'রে তাদের শৈশবেই গৃহিণী নবতারা পরলোক গমন ক'রলেন—তখন সদানন্দের মন আবার ভেঙে গেল। এমন সময় খবর পেলেন—এলাহাবাদে তাঁর শ্বশুর-শাশুড়ী দুইজনেই একসঙ্গে প্লেগ রোগে আক্রান্ত হয়েছেন। এলাহাবাদের বিবাহের কথা সদানন্দ ক'লকাতায় প্রকাশ করেন নি। তিনি এখানকার পুত্রকন্যাকে শ্বশুরালয়ে রেখে

এবং নিজের তৈরী সিমলার বাড়ী ভাড়া দিয়ে—তার আয় পুত্র-কন্যার শিক্ষার জন্য বরাদ্দ করে পুনরায় এলাহাবাদে ফিরে গেলেন।

শ্বশুর-শাশুড়ী রক্ষা পেলেন না। সদানন্দ শ্বশুরের সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী পুত্র জয়ন্তের অছিরূপে এলাহাবাদেই রইলেন এবং এলাহাবাদ হাইকোর্টে বেরুতে লাগলেন। অল্পদিনেই তাঁর বিপুল প্রতিষ্ঠা হ'লো এবং কয়েক বৎসরের মধ্যে তিনিও শ্বশুরের পদ অধিকার করলেন অর্থাৎ হাইকোর্টের বিচারপতি হ'লেন। কালক্রমে জয়ন্ত এলাহাবাদ ইউনিভারসিটি থেকে প্রশংসার সঙ্গে এম-এ পাশ করল। পঠদ্দশাতেই শিক্ষয়িত্রীর কন্যা সুপ্রিয়ার সঙ্গে জয়ন্তর পরিচয় ঘটেছিল এবং সে পরিচয় ক্রমশঃ প্রেমে পরিণত হয়। শিক্ষয়িত্রী ভবানীদেবী তা জানতে পেরে—বিচারপতি সদানন্দবাবুকে এক পত্র লেখেন সব কথা উল্লেখ করে। দরিদ্রা নারীর এই স্পর্ধায় ক্রুদ্ধ ও উত্তেজিত হ'য়ে সদানন্দবাবু একদিন তাঁর বাড়ীর ঠিকানায় এসে বাহিরের দরজা থেকেই ভবানীদেবীকে ডাকেন। ভবানীদেবী এই ব্যাপারে বিস্ময়ে অভিভূতা হ'য়ে তাঁকে ভিতরে নিয়ে যাবার জন্যে অনুরোধ করতেই তাঁর মূর্তি ও কথায় স্তব্ধ হয়ে যান। সদানন্দবাবু দৃঢ়-স্বরে জানান—'না, আপনার সঙ্গে আমি আত্মীয়তা করবার উদ্দেশ্যে আসি নি, নিজের মুখে আপনার আস্পর্ধার উত্তর দিতে এসেছি। বামন হ'য়ে যারা আকাশের চাঁদ ধরতে হাত বাড়ায় তারা এক শ্রেণীর পাগল—পাগলা-গারদে তাদের আটকে রাখা উচিত। এর পরও যদি আমার ছেলের উপর লালসা রাখেন, তাকে বিগড়াতে চান, তাহলে জেলখানাই হবে আপনার স্থান।'

পরদিন সদানন্দবাবু এক পত্র পেলেন। ভবানী দেবী লিখেছেন—'আপনাকে নিশ্চিন্ত করবার জন্যে আমি মেয়েকে নিয়ে দেশান্তরে চলেছি। যে ধৃষ্টতা আমি ক'রেছিলাম, তার জন্যে ক্ষমা করবেন।'

ঠিক এইভাবে এক পত্র পায় জয়ন্তও। তাকে তার পিতার

অভিপ্রায়ের সঙ্গে জানানো হয় যে সুপ্রিয়াকে সে যেন ভুলে যায়—নিজের নাম মুছে ফেলবার জন্য সে দেশান্তরে চলেছে।···কিন্তু সেই পত্র নিয়ে জয়ন্ত ভবানী দেবীর বাড়ীতে গিয়ে দেখে—সে বাড়ীতে অপরে বাস করছে। তারা জানায়—কাল রাতের গাড়ীতে ভবানীদেবী তাঁর মেয়েকে নিয়ে চলে গেছেন। কোথায় গেছেন—তা বলে যান নি। তবে এলাহাবাদে আর তাঁরা আসবেন না।

এরপর একদিন দেখা গেল--জয়ন্তও অদৃশ্য হয়েছে। তার ঘরের টেবিলে সদানন্দবাবুর নামে এক পত্র পাওয়া গেল। সেই পত্রে জয়ন্ত লিখেছে—"ভবানী দেবীর মত মহীয়সী নারীর প্রতি যে অবিচার আপনি করেছেন—সারা জীবন ধরে তারই প্রায়শ্চিত্ত করতে আমি জীবন উৎসর্গ করেছি। আমাকে অনুসন্ধান ক'রে আপনার মূল্যবান সময় ও সুস্থ মনকে বিব্রত না করেন এই অনুরোধ। আমার জীবনে যে বিপর্যয় ঘটেছে—এ নূতন নয়; কিন্তু এর অবসান করা যায় কি না, তাই হবে আমার অবশিষ্ট জীবনের সাধনা।"

সদানন্দবাবু তলে তলে তাঁর কোন বিচারপতি বন্ধুর কন্যার সঙ্গে জয়ন্তের বিবাহের সম্বন্ধ পাকা ক'রে ভেবেছিলেন, সেই উপলক্ষে এক উৎসবের আয়োজন ক'রে কলকাতা থেকে দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর আত্মীয়-স্বজন ও পুত্রকন্যাদের এনে এখানকার রহস্যটাও সর্বসমক্ষে সুপ্রকাশ করে শান্তি পাবেন।

কিন্তু এই ঘটনায় সব ওলট পালট হয়ে গেল। পুত্রের নিষেধ সত্বেও তিনি অনুসন্ধানে বিরত হন নাই, ফলে জয়ন্তের কথাগুলিই নির্মম সত্য হয়ে দাঁড়ায়। ভবানী দেবীর কন্যার মতই সদানন্দবাবুর পুত্রের নামও মুছে যায়। এর পরে তিনি পেনশন নিয়ে এলাহাবাদের সম্পত্তির বিধিব্যবস্থা করে সেখানকার বাস তুলে ক'লকাতার বাড়ীতে স্থায়ীভাবে বাস করবার উদ্দেশ্যে চলে আসেন এবং নিজের বাড়ী ফিরিয়ে নিয়ে তাকে সর্বতোভাবে সুসজ্জিত করে ছেলে শঙ্কর ও কন্যা

রেখাকে নিয়ে সংসারী হন। কিন্তু তাঁর জীবনের ওদিককার ট্র্যাজেডি ছেলেমেয়ে বা আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবদের কাছে অজ্ঞাতই র'য়ে গেল।

ছেলে শঙ্কর এম-এ পরীক্ষার পর ইউনিভারসিটিতে বাংলা সাহিত্যের রিসার্চ ক'রছে। রেখা ক'লকাতার উইমেন কলেজে বি, এ, প'ড়ছে। এই কলেজের অন্যতম অধ্যাপিকা লীলাদেবী 'কন্যাপীঠ' সংস্থাটির প্রবর্তিকা এবং সদানন্দবাবুর কন্যা রেখা তার সম্পাদিকা। সংস্থার উদ্দেশ্যের কথা এই কাহিনীর প্রারম্ভেই বলা হয়েছে।

তিন

পড়ার ঘরে সেদিন ভ্রাতা-ভগিনী কন্যাপীঠের আলোচনা-প্রসংগে মুখর হয়ে উঠেছে। নিরলা ও ভীমরুলের চিঠির কথা বলি বলি করেও রেখা দাদাকে বলবার ফুরসদ পায় নাই। শঙ্করও ক'দিন তার রিসার্চ নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত ছিল—ইউনিভারসিটির লাইব্রেরী রুমেই তাকে অনেকটা সময় কাটাতে হয়েছে। এদিকে সদানন্দবাবুও রেখাকে তাঁর ঘরে ডেকে ঐ নিরলা মেয়েটির সম্বন্ধে এমন অনেকগুলি প্রশ্ন করেছেন—কন্যাপীঠের নিয়ম অনুসারে সম্পাদিকা রূপে যে সব কথা জানানো তার পক্ষে একান্ত অনুচিত। প্রশ্নের পর কন্যার মুখে কুণ্ঠার ছায়া দেখেই বিচক্ষণ পিতা অবস্থাটা উপলব্ধি ক'রে বলতে বাধ্য হন—'জানি মা সমিতির ভিতরকার কথা বাইরের কাউকে বলা ঠিক নয় এবং আমার প্রশ্ন করাও অযৌক্তিক। কিন্তু ঐ যে কন্যা-দায়োদ্ধার সমিতি বিজ্ঞাপন দিয়েছে কাগজে, ওদের রহস্যভেদ করবার উদ্দেশ্যেই আমি নিরলা মেয়েটির বাড়ীর ঠিকানা জানতে চেয়েছি। তদন্তস্যূত্রেই এটা প্রয়োজন হতে পারে মনে ক'রেই জিজ্ঞাসা করেছি।' এ অবস্থায় রেখার পক্ষে আর কঠিন হওয়া সম্ভব নয়—সে তৎক্ষণাৎ পিতাকে নিরলার পত্রের সকল কথা—কন্যাপীঠের অধিবেশনেও যেগুলি জানানো হয় নাই, সে সবও সদানন্দবাবুকে জানিয়ে দেয়। তিনিও নোটবুকে সেগুলি টুকে নিয়ে বলেন—'এখন আমার পক্ষে এ ব্যাপারটার রহস্যভেদ করা সম্ভব হবে।'

এরই ঠিক পর দিন রেখা দাদাকে কন্যাপীঠের খবরটা শোনাবার

অবসর পেল। এমন কি, দাদা কবি ও কবিতা লেখে, তাই তার কবিতার উপাদান যোগাবার অভিপ্রায়ে নিরলার হাতে লেখা আসল চিঠিখানাও দাদাকে দেখাবার জন্যে এনেছিল।

ভীমরুলের কাহিনী চেপে রেখে আগেই নিরলার আখ্যানটি সে তুলল: জানো দাদা, গেল শনিবার আমাদের কন্যাপীঠে ভারি রোমান্টিক কাণ্ড হয়ে গেছে, তোমাকে বলাই হয়নি।

শঙ্কর বলল: তাই নাকি? তাহলে এখন বল, অবসর আছে, শোনা যাক!

রেখা তখন নিরালা মেয়েটির সেই চিঠির কথাগুলি মুখেই ব'লে গেল। শঙ্কর ত শুনতে শুনতেই অভিভূত হ'য়ে প'ড়েছিল; রেখার কথা শেষ হ'তেই জিজ্ঞাসা ক'রল: মেয়েটির নাম কি রে?

রেখা বলল: কুমারী নিরলা রায়। পরক্ষণে মুখ টিপে হেসে জিজ্ঞাসা ক'রল নামটি বেশ মিষ্টি, নয় দাদা?

রেখার মুখে শেষের মন্তব্যটি শুনে শঙ্করের মুখখানা গম্ভীর হ'য়ে উঠল; রুক্ষস্বরে সে ব'লল; বেচারীর দুঃখের কথা বলেই ও-ধরণের কথাটা কি করে বেরুল রে? তাহলে নিশ্চয়ই ব্যাপারটা সত্যি নয় বল!

অপ্রতিভকণ্ঠে রেখা বলল: অন্যায় করেছি দাদা ওকথা ব'লে। কিন্তু নিরলা মেয়েটি যা লিখেছে সবই সত্যি—তার প্রাণের কথা। তোমাকে দেখাব ব'লে চিঠিখানা পর্যন্ত আমি সঙ্গে করে এনেছি—এই দেখ।

একখানা বইএর ভিতর থেকে চিঠিখানি বার ক'রে রেখা শঙ্করের হাতে দিল। শঙ্কর নিবিষ্ট মনে পড়তে লাগল। রেখা নিবদ্ধ দৃষ্টিতে শঙ্করের মুখের পানে তাকিয়েছিল, পড়া শেষ হ'তেই হাত বাড়িয়ে চিঠিখানা টেনে নিল। বিস্ময়ের ভঙ্গিতে গাঢ়স্বরে শঙ্কর বলল: কি হলো—কেড়ে নিলি যে?

রেখা বলল : পড়া তো হয়েছে—পাছে ঠিকানাটা দেখে নাও, তাই—

মৃদু হেসে শঙ্কর বলল : আমরা রিসার্চের ছাত্র জানিস, চোখে যা পড়ে, মনের মধ্যে দাগ কেটে বসে। যাক্‌গে, ঠিকানায় আমার দরকার কি! তবে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি জবাব দে—চিঠিখানা দিয়ে ঠিকানাটা চাপবার জন্যে এ চেষ্টা কেন ?

রেখা বলল : চিঠিখানা দেখানোই আমার অন্যায় হয়েছে। তবে এ থেকে তুমি কিছু প্রেরণা পাবে ব'লেই নিজের দায়িত্বে আমি দেখিয়েছি। তা ছাড়া, চিঠির কথা সভায় সবাই জেনেছে, কিন্তু নাম ঠিকানা চেপে রাখা হয়েছে। ওদুটো তাঁকেই জানানো হবে, যিনি এই সঙ্কট থেকে মেয়েটিকে রক্ষা করবার দায়িত্ব নেবেন।

শঙ্কর জিজ্ঞাসা করল : এমন দায়িত্ব নেবার জন্য লোক কেউ আছে নাকি ?

রেখা বলল : এখনো হাতেকলমে নেন নি, তবে ভার দেবার জন্য আহ্বান চেয়েছেন, আর সে জন্য প্রস্তুত আছেন।

গম্ভীরমুখে শঙ্কর প্রশ্ন করল : তিনি কে ?

রেখা বলল : ভীমরুল।

বিস্মিত দৃষ্টিতে শঙ্কর রেখার পানে তাকাতেই ভীমরুলের চিঠি এবং দুখানি পত্র সম্পর্কে সভানেত্রী লীলাদেবীর তদন্ত করবার কাহিনী সবই সে বলল।

শঙ্কর কিছুক্ষণ নীরব থেকে তারপর আস্তে আস্তে বলল : আমি একটা যুক্তি দিচ্ছি রেখা, নিরলা দেবীর তদন্তের ভারটা তুই নিজেই চেয়ে নে সভানেত্রীর কাছ থেকে।

উল্লসিত মুখে রেখা বলল : তুমি কি গণনা করে কথাটা বললে দাদা! কালই কলেজে লীলাদি আমার ওপরেই নিরলার ব্যাপারটি জানবার ভার দিয়েছেন ; সেই জন্যই ত চিঠিখানা এনেছি। কি

করব, কখন কি ভাবে গেলে নিরালায় নিরলা দেবীর সঙ্গে দেখা করবার সুবিধা হবে সে সব এখনো কিছুই ভাবিনি। কিন্তু আমাকে এ ভার নেবার জন্যে তুমি যে যুক্তি দিলে—কি উদ্দেশ্যে বল ত শুনি?

শঙ্কর বলল: তাহলে তোকে বলি, চিঠিখানা প'ড়ে ঐ মেয়েটির সম্বন্ধে সত্যিই আমার মনে কেমন একটা সহানুভূতির সঞ্চার হয়েছে। তুই ত জানিস, অনেক আগে থেকেই শক্ত ব্যাপার নিয়ে বুদ্ধি খেলাতে মাথা ঘামাতে আমি ভালবাসি। কিন্তু আমাদের জীবনে সে রকম ঘটনা কখনো আসে না, আর এলেও—তখনই পুলিশ ডেকে তাদের হাতেই দেওয়া হয়। নিরলা দেবীর চিঠিখানা পড়েই আমার মাথায় ওটা ঢুকেছে; এখন কথা হচ্ছে—ওর ভার যেমন তোর ওপর পড়েছে, তাই থাক, কিন্তু যা কিছু করবার আমিই করব—শিখণ্ডীর মতন তোকে সামনে রেখে।

রেখা সহাস্যে বলল: বেশ ত, এতে আমারই সুবিধে; তবে তোমাকেও কিন্তু হুসিয়ার হয়ে কাজে হাত দিতে হবে; শেষে যেন ঐ বুড়োর হাত থেকে নিরলা বেচারীকে বাঁচাতে গিয়ে নিজের হাতেই তার হাতখানা—

"থাম্ বলছি—মুখে কিছু বাধে না দেখছি।" বলেই শঙ্কর কোপ-কটাক্ষে ভগিনীর বিহসিত মুখখানার দিকে তাকাল।

চার

চোরবাগান বাই লেনের শেষ প্রান্তে পুরানো একখানা বাড়ীর বাহিরের ঘরে কন্যাদায়োদ্ধার সমিতির অফিস। দরজার উপর ছোট একটি সাইনবোর্ড টাঙানো, তাতে বাঙলা হরফে সমিতির নাম লেখা। ঘরের ভিতর দরজার সামনেই একখানা টেবিল অবলম্বন ক'রে পাশাপাশি দুই ব্যক্তি দু'খানি চেয়ারে উপবিষ্ট। পাশাপাশি বসলেও উভয়ের আকৃতির মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। একজন অত্যন্ত কৃশ, মাথার চুল, চোখের ভ্রু ও গোঁফ পাতলা এবং কটা কটা, চোখদুটি ছোট হ'লেও চাউনি কটমটে ও তীক্ষ্ণ; দেখলেই মনে হয় লোকটি যেন সব সময়ই রেগে বসে আছে। তার গায়ে খুব গাঢ় ধুসরবর্ণের লম্বা কোট, এবং একটা খয়েরী রঙের কম্ফটার কাঁধের দু'পাশ দিয়ে ঝুলছে। চেহারা দেখে মনে হয়, বয়স চল্লিশ বিয়াল্লিশ বছর। নাম—হরিশ হাজরা।

অপরটি বেঁটে, মোটাসোটা, মুখে পুরু চাপদাড়ি, চোখে সবুজ রঙের চশমা, তার চারিদিকেই পরকলা, মাথায় থলির মত কালো রঙের একটা টুপি, মুখের যতটুকু দেখা যায় রোদপোড়া গোছের, গায়ে বাদামী রঙের ঢিলে পাঞ্জাবী। বয়স অনুমান করা কঠিন। নাম শশী সেন।

ঘরের দরজার দুইপাশে দেওয়াল ঘেঁসে দু'খানা ক'রে কেদারা; পিছনের দিকে পাশাপাশি এক একটা আলমারি ও র‍্যাক। আলমারির কাঠের দরজা বন্ধ। র‍্যাকের উপর নানা আকারের খাতা পত্র,

ছাপানো কাগজের বাণ্ডিল, খেরো বাঁধা পুলিন্দা প্রভৃতি পাশাপাশি সাজানো।

হরিশ হাজরা ও শশী সেনের মধ্যে আকৃতিগত পার্থক্য যতই থাকুক, প্রকৃতিগত মনের মিল এদের অদ্ভুত রকম। হরিশের পরিকল্পনা এবং শশীর টাকায় এই প্রতিষ্ঠানটি গড়ে উঠেছে। শশী প্রয়োজন মত টাকা ঢাললেও উভয়েই সমান অংশীদার এবং কাজের ব্যাপারে শশী হরিশের হুকুম বা নির্দেশমত কাজ করতে কুণ্ঠিত নয়। সে জানে, শীর্ণ চেহারা, খিটখিটে স্বভাব এই মানুষটির কাছে এখনো তার শিখবার অনেক কিছুই আছে।

হরিশ জানে, এবারকার যুদ্ধের এক বিচিত্র দান—কালোবাজার। এরই আড়ালে থেকে অনেকেই অনেক রকমে অর্থ উপার্জন করেছে, হরিশ এবং শশীও ধুলামুঠি ধরে সোনার মুঠি গৃহজাত করেছিল। শশী চালাক, বাজার মন্দা পড়তেই সরে যায়; কিন্তু হরিশের লোভ দুর্নিবার, ঘুরে ফিরে পাড়ি জমাতে গিয়েই সে এমনভাবে নাস্তানাবুদ হয় যে, বানের জল সেঁধিয়ে ঘরের জল পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাবার মত অবস্থায় এসে সে প্রায় নিঃস্ব হয়ে পড়ে। সম্প্রতি শশীর সাহায্যে এই কন্যাদায়োদ্ধার সমিতি খুলে বসেছে পলাতক অর্থভাগ্যকে পুনরায় এই পথে পাকড়াও করে আনবার আশায়।

হরিশের ধারণা, এই ব্যাপারটি প্রকারান্তরে কালোবাজারের শাখা বিশেষ, অথচ নিঃশঙ্কচিত্তে এ ব্যাপার চালিয়ে দু'দিক দিয়েই অর্থ উপার্জন করা যায়। কে না জানে—দেশে টাকার যত টানাটানিই থাক্, বরের বাজার ঠিক আছে। সোনার বাজার যতই চড়ুক, লগন্সার মরশুমে সোনা কেনার হিড়িক ঠিক চলে। আর, এ ব্যাপারের আসল বড়ে হচ্ছে—পাত্রী বা কনে। তাই অনেক মাথা খেলিয়ে হরিশ কালোবাজারী প্ল্যান খাটিয়ে কনে সরবরাহের এমন এক উপায় উদ্ভাবিত করেছে, অভিভাবক পক্ষের কন্যাদায়োদ্ধারের

সঙ্গে সমিতির তহবিলও যার কল্যাণে স্ফীত এবং ফলাও হয়ে উঠবে।

হরিশ ও শশী দুজনেই মাথা খেলিয়ে সমিতির নিয়মকানুন রচনা করেছে। ফলে, কন্যাদায়গ্রস্ত অভিভাবক-পক্ষকে বিনাপণে কন্যাদায় থেকে উদ্ধার পাবার আগেই সমিতির তহবিলে দশটি টাকা দাখিল ক'রে নাম রেজিষ্টারী করতে হবে। সেই সঙ্গে ফরমে ছাপা কথা-গুলির পাশের ফাঁকা স্থান এইভাবে পূরণ করে দিতে হবে, যথা—কন্যার নাম, বয়স, বিশেষগুণ, শিক্ষা, অভিভাবকের নাম ও ঠিকানা এবং কন্যার বর্তমান বয়সের একখানি ফটো। সমিতির মহৎ উদ্দেশ্য—বিনাপণে অভিভাবককে কন্যাদায় থেকে উদ্ধার করা।

এই ভাবে দশটি টাকার সঙ্গে কন্যার আলেখ্য ও পরিচয়াদি সমিতিকে প্রদান ক'রে অভিভাবক-পক্ষ আশায় দিন গণতে থাকেন—কবে তাঁদের অদৃষ্ট প্রসন্ন হয়।

এদিকে আর এক পক্ষও সমিতির অফিসে এসে এই ভাবে টাকা দিয়ে তাঁদের নাম ধাম রেজিষ্টারী করেন ভাবী কনের আশায়। সাধারণতঃ এঁরা বর্ষীয়ান ব্যক্তি। বিবাহিতা পত্নী বিয়োগের পর পুনরায় বয়স্থা রূপসী কন্যার পাণিপীড়নের আশায় সমিতির দ্বারস্থ হন। প্রায়ই এঁরা ধনাঢ্য ব্যক্তি, বয়স্থা সুন্দরী পাত্রীর জন্য অকাতরে অর্থব্যয় করতে কুণ্ঠিত নন। এঁদের সম্বন্ধে সমিতির নিয়মকানুনও আলাদা। যেমন—কন্যা পছন্দ হলে, সেই কন্যা-সম্পর্কে সমিতির সিদ্ধান্ত স্বীকার করতে এঁরা বাধ্য থাকবেন। এঁদের চাহিদা-অনুসারে এই দাবী অনেক সময় নিলামের ডাকের মত ঊর্দ্ধমুখী হয়ে থাকে। কন্যার বয়স ও রূপ এ-ক্ষেত্রে ইন্ধন স্বরূপ হ'য়ে এই শ্রেণীর বৃদ্ধ পাত্রদের আগ্রহ-বহ্নিকে উদ্দীপিত ক'রে। ফলে, যে টাকায় শেষ পর্যন্ত রফা হয়, তা থেকে সমিতির প্রাপ্য, বিবাহের যাবতীয় খরচ, এবং ক্ষেত্র

বিশেষে কন্যার অভিভাবক-পক্ষের প্রণামী প্রভৃতি নির্দিষ্ট থাকে। অর্থাৎ বিবাহ ব্যাপারে যাবতীয় ব্যয়-ভার পাত্রকেই বহন করতে হয়। কন্যার অঙ্গ-সজ্জাদির দরুণ খরচ-পত্রের কথা আলাদা; পাত্র তাঁর রুচি ও সামর্থ অনুযায়ী কন্যার রূপসজ্জা করবেন। গাঁই গোত্র মিল হ'লে, বিশেষ রূপবতী কন্যা একাধিক প্রার্থীর চাহিদার পাত্রী বলেই সমিতিও বিশেষ দাঁও কষতে থাকে এবং হাজার এক টাকা পর্যন্ত দক্ষিণা আদায় করে নেয়।

বুঝতে এখন হবে যে, এই শ্রেণীর বিবাহবাতিকগ্রস্ত বিপত্নীক পাত্রদের চাহিদামত বয়স্থা রূপসী কন্যা সংগ্রহ ও সংযোগ করে আর্থিক স্বার্থসিদ্ধিই এই কন্যাদায়োদ্ধার সমিতির আসল উদ্দেশ্য। সুতরাং কন্যার অভিভাবক যেখানে একান্ত অসমর্থ, কিম্বা বয়স্থা কন্যা গলগ্রহ-স্বরূপ হয়ে যে সব অভাবগ্রস্ত অভিভাবককে বিব্রত করে তুলেছে, সমিতির প্রধান লক্ষ্য তাদের দিকে এবং তারাই সমিতির উদ্দেশ্য সর্বাংশে সিদ্ধ করে থাকে। এই শ্রেণীর অভিভাবকদের প্রলুব্ধ করে অফিসে এনে বন্দোবস্ত এবং নাম রেজিষ্টারী করবার জন্য সমিতির অনেকগুলি দালালও আছে।

মাঝে মাঝে সমিতির অফিসে একই সময়ে বিভিন্ন প্রকৃতির বিবাহবাতিকগ্রস্ত প্রার্থীদের সমাগমে নাটকীয় পরিস্থিতির উদ্ভব হয়ে থাকে। হয়ত, একই কন্যার ফটো একাধিক বিপত্নীক বৃদ্ধ প্রার্থীকে এমনই প্রলুব্ধ করে তোলে যে তারা সেই ফটো নিয়ে হুলস্থূল বাধিয়ে বসে। এমন কি, তাদের বয়স ও সামাজিক মর্যাদায় বিস্মৃত হয়ে এমন বিশ্রী কাণ্ড বাধিয়ে বসে যে, রাস্তায় লোক জমে যায়, তখন পাড়ার ভদ্রলোকেরা এসে তাদের নিরস্ত করেন।

একদিন সখারাম ও প্রিয়নাথ নামে দুই বর্ষীয়ান বিবাহবাতিকগ্রস্ত বিপত্নীক, মানিকজোড়ের মত সমিতি ভবনে এসে উপস্থিত দ্বিতীয় পক্ষের বয়স্থা কনের আশায়।

সখারামবাবুর একখানি পা প্রায় এক বিঘত পরিমাণ খাটো, সেজন্য তাঁকে বিশেষ ধরণের পাদুকা ব্যবহার করতে হয়; এ ছাড়া রূপা দিয়ে বাঁধানো লাঠির সাহায্যে বিশেষ একটা ভঙ্গিতে পদক্ষেপ করে হ্রস্ব পদের ত্রুটিটুকু তাঁকে সামলাতে হয়, আবার সময় সময় ধরাও পড়ে যান। তখন কেউ হেসে ফেললেই সর্বনাশ! সখারামবাবু একেবারে তেলে বেগুণে জ্বলে ওঠেন।

প্রিয়নাথবাবুর একটি চোখ নেই। ছেলেবেলায় তীর ধনুক নিয়ে যুদ্ধ খেলার ঝোঁকে একটি চোখ নষ্ট করে ফেলেন; পাথরের চোখ বসিয়ে যদিও কানা অপবাদ থেকে রেহাই পাবার ফন্দি এঁটেছেন, কিন্তু পরিচিত মহলে সেটা জানাজানি হয়ে গেছে। এখন এমনি হয়েছে, কারো মুখ থেকে যদি 'কানা' কথাটি ওঠে, আর তাঁর কানে বাজে, তাহলে তখনি স্থানকাল-পাত্র ভুলে মুখ খিঁচিয়ে তাকে তেড়ে যাবেন। এ হেন দুই শাঁসালো গ্রাহকের সমাগম হতেই হরিশ ও শশী প্রসন্ন-মনে তাঁদের অভ্যর্থনা করে বসাল। সখারামবাবু অবশ্য খঞ্জত্ব যথাসম্ভব গোপন করেই আসনে অধিষ্ঠিত হলেন।

সখারাম ও প্রিয়নাথ উভয়েই অনেকদিন ধরে সমিতির অফিসে আনাগোনা করছিলেন, কিন্তু একত্র সংযোগ এই প্রথম। টেবিলখানার দু'দিকে দুজন বসে পরস্পরকে বোধ হয় বোঝবার চেষ্টা করলেন বিনা সম্ভাষণেই। এঁরা উভয়েই পাত্রীর ফটো দেখে পছন্দ করেছেন, এখন পাত্রীপক্ষের পছন্দ হলেই কথাবার্তা পাকা হয়। সেই আশাতেই এদিন এসেছেন।

সখারাম প্রথমে হরিশকে উদ্দেশ্য করে প্রশ্ন করলেন: সে দিন যিনি দেখে গেলেন, কোন খবর দিয়েছেন?

একটু পরে গলাটাকে শানিয়ে হরিশ জবাব দিল: দিয়েছেন; তবে পছন্দ করেন নি।

মুখখানা ম্লান করে সখারাম বললেন: না হয়, আরো কিছু

চড়ান—ওর ওপর আর এক চাপড় !

হরিশ তিক্তকণ্ঠে বলল : আরে মশাই, পাত্রীর বাবাই উল্টে চাপড়াতে চায়—যা নয় তাই বলে শাসায় ! আপনাকে তো চালিয়ে দিয়েইছিলুম, লেংচেই না মাটি করে দিলেন ! কি দরকার ছিল আপনার ওঠবার ? বসে থাকলেই হোত !

হরিশের কথার পীঠে প্রিয়নাথবাবু খপ করে বলে উঠলেন : খোঁড়াকে কেউ কি মেয়ে দিতে চায় ?

কিন্তু কথাটা বলেই যেমন তিনি একটু ঝেঁকে বসতে গেলেন, অমনি খটাস্ করে একটা শব্দ হলো, আর প্রিয়নাথের বাম চক্ষুর মণিটী ঠিকরে পড়ল সখারামের খঞ্জ পায়ের জন্যে বিশেষ রকমে তৈরী পাদুকাটীর পাশেই ! হেঁট হয়ে সেটি কুড়িয়ে নিয়ে সখারামবাবু ব্যঙ্গের সুরে বলে উঠলেন : একেই বলে—ধর্মের কল বাতাসে নড়ে ! ম'শায়ের চোখ থেকে পাথরটি বেরিয়ে এসে বলছে—মেয়ের বাপেরা কানার পিছনেই আজকাল ছুটে বেড়ায় না !

আর যায় কোথায়—প্রিয়নাথবাবু তৎক্ষণাৎ চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে ঘুসি পাকিয়ে তেড়ে গেলেন সখারাম বাবুর দিকে ; সেই সঙ্গে মুখখানা বিকৃত করে বললেন : কি বল্‌লি—কানা ? দাঁড়া তো, আর একখানা ঠ্যাং ভেঙে দিয়ে বিয়ের সাধ ঘুচিয়ে দিই জন্মের মতন !

সখারামবাবুও সঙ্গে সঙ্গে টেবিলের দিকে ঝুঁকে ঝাঁ করে একটা তীক্ষ্ণমুখ কলম টেনে নিয়ে সেইটিই বাগিয়ে ধরে রণহুঙ্কার ছাড়লেন : আয় না আয়, ও চোখটাও গেলে দিয়ে বৌয়ের মুখ দেখবার সাধে তোর ছাই দিই !

শশী তাড়াতাড়ি উঠে দুজনকে থামিয়ে পুনরায় চেয়ারে বসিয়ে দিল ; তারপর চোখের নকল তারাটি প্রিয়নাথবাবুর হাত থেকে নিয়ে সখারামবাবুর চোখে ফিট করে বসাতে সাহায্য করল।

হরিশ বিনিয়ে বিনিয়ে বলতে লাগল: বিয়ের নেশা মগজে ঢুকলেই কি এমনি বেহুঁস হোতে হয় মশাই? একবারে যেন ছেলে-মানুষের বেহদ্দ!

প্রিয়নাথবাবু জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন: যে অবস্থা আমাদের চলছে হরিশবাবু, সেখানে হিসেব করে কিছু করা চলে না; আমি ভেবেছিলুম, আমার চোখের গলদটা এখানে কারুর জানা নেই, তাই ওঁর পায়ের দোষ ধরেছিলাম। এখন বুঝছি, ও কথাটা বলে ভালো করি নি।

প্রিয়নাথের কথা শুনে সখারামবাবুও জল হয়ে গেলেন। তাড়াতাড়ি পকেট থেকে রূপার সিগার-কেস বা'র করে প্রথমেই সবিনয়ে প্রিয়নাথবাবুর সামনে ধরে তারপর ধীরে ধীরে হরিশ ও শশীর দিকে এগিয়ে দিলেন। পরক্ষণে প্রিয়নাথবাবুও তাঁর সুদৃশ্য নস্যদানিটির ডালা খুলে জিজ্ঞাসা করলেন: চলবে কি?

ফলে একটু আগে দুই বিপত্নীক বিজাতীয় ক্রোধে যেমন মারমুখী হয়ে উঠেছিলেন, এখন একবারে গলাগলি ভাব! এই ঘটনার পর থেকে সমিতি ভবনে এঁদের নাম রটে যায়—মাণিকজোড়! এমনি নাটকীয় ঘটনা প্রায়ই সংঘটিত হয়ে সমিতির ক্ষুদ্র ঘরখানিকে হাস্যোজ্জ্বল করে তোলে। এখন আমাদের কথায় আসা যাক। সেদিন হরিশ ও শশী পাশাপাশি বসে সমিতির বর্তমান কর্মসূচী নিয়ে হিসাব করছে, এমন সময় সেই কক্ষে প্রবেশ করলেন গম্ভীরমুখে সদানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়।

আগন্তুকের সম্ভ্রমসূচক আকৃতি দেখেই সমিতির কর্তৃপক্ষদ্বয় অভিভূত হয়ে তাঁকে বিশেষভাবে অভ্যর্থনা করে বসালো। সদানন্দ-বাবু এক নজরে অফিস-গৃহের পরিবেশ ও অফিসের কর্মকর্তাদের চেহারা দেখে নিয়েই গম্ভীরমুখে বললেন: খবরের কাগজে আপনাদের প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন দেখে আমি এসেছি। আপনাদের উদ্দেশ্য যে

খুব মহৎ তাতে সন্দেহ নেই।

হরিশ ও শশী পলকের জন্য চোখ চাওয়া-চাওয়ি করে বুঝল যে, উঁচু দরের শাঁসালো এক মক্কেল এসেছে। যদিও লোকটার চেহারা ও হাবভাব দেখে কোন পদস্থ ব্যক্তি বা বড় ঘরনাওয়ালার লোক বলে মনে হয়, তাহলেও ভড়কাবার কিছু নেই। কেন না, এই ব্যাপার নিয়ে অভিজ্ঞতা-সূত্রে হরিশ জেনেছে যে, পয়সাওয়ালা সাধারণ গৃহস্থঘরের বিয়েপাগলা বুড়োদের চেয়ে পদবীওয়ালা বনেদীদের ভিতর থেকে যাঁরাই এই বাতিকগ্রস্ত হয়ে আসেন, তাক বুঝে তাঁদের চোখে কোন বয়স্থা রূপসী মেয়েকে একবার ধরাতে পারলে আর রক্ষা নেই, অমনি তাঁদের মুখ থেকে গাম্ভীর্যের মুখোস একেবারে খসে পড়ে, আর সেই কন্যাকে পাবার জন্যে ক্ষেপে ওঠেন। এদের মনে পড়ে যায়,—বাগবাজারের এক রায় বাহাদুরকে নিয়ে কি কাণ্ডই না হয়েছিল, সেই রহস্যময় ঘটনা নিয়ে একখানা বই পর্যন্ত বাজারে ছেপে বেরিয়েছে! সুতরাং চোখে চোখেই দুই মালিকের মধ্যে স্থির হয়ে গেল যে, মক্কেলটিকে যেমন করেই হোক বাগানো চাইই।

সদানন্দবাবুর প্রশ্নের উত্তরে হরিশ বলল: আজ্ঞে, উদ্দেশ্য আমাদের মহৎ বলেই আপনার মত বয়স্ক আর ভারিক্কী ব্যক্তিরাই এখানে পায়ের ধূলো দেন। আমরাও তাঁদের পচ্ছন্দমত পাত্রী ঠিক করে দিই। জানতে পারি—মহাশয়ের কোন পক্ষ, আর কি রকম পাত্রী প্রয়োজন?

সদানন্দবাবু মনে মনে কৌতুক উপলব্ধি করে কণ্ঠস্বরে কিঞ্চিৎ কোমলতা এনে বললেন: পক্ষ হারিয়ে আমি যে নিজের জন্যেই নূতন পক্ষের সন্ধানে আপনাদের প্রতিষ্ঠানে এসেছি—কি করে বুঝলেন?

হরিশ সহাস্যে বলল: দেখে দেখে ওটা আমাদের অভ্যস্ত হয়ে গেছে স্যার! কেউ দয়া করে এখানে এলেই আমরা বুঝতে পারি, কি মতলবে তিনি এসেছেন।

সদানন্দবাবুও মৃদু হেসে বললেন: বটে? তা'হলে এটা আপনাদের খুব যে বাহাদুরী তাতে ভুল নেই। কিন্তু একটা কথা বলি—সবাই কি নিজের জন্যে নূতন পক্ষের সন্ধানে আসেন? কন্যার পাত্রের সন্ধানেও তো আসতে পারে অনেকে।

এ প্রশ্নের উত্তরে শশী বলল: সেই যে কথায় বলে না—বিড়ালের গোঁফ দেখলেই চেনা যায় সে কোন জাতের। এখানেও ঠিক তাই, দর্শন-দারীতে আমরা মতলব ধরে ফেলি। মশাইকে দেখেই আমরা ধরে ফেলেছি, যে দরের আপনি মানুষ, তাতে বিনাপণে কন্যাদায় উদ্ধারের জন্যে এখানে আসাই সম্ভবপর নয়।

সদানন্দবাবু বললেন: পুত্রের জন্য পাত্রীর সন্ধানেও ত আসতে পারি?

হরিশ তৎক্ষণাৎ বলে উঠল: মশাই যে লক্ষ্মীমন্ত মানুষ—দেখলেই বোঝা যায়। পুত্রের ব্যাপার হলে পাত্রীর পিতাই আপনার বাড়ীতে দায় জানাতে যাবে, ঘটকরা দুবেলা আসা যাওয়া করবে, ওর জন্যে কন্যাদায়োদ্ধার আফিসে আপনার পায়ের ধূলো পড়ত না, স্যার!

সদানন্দবাবু সহজভাবেই বললেন: যখন এতটা বুঝেছেন, বৃথা আর কথা কাটিকাটি করতে চাইনে। কিন্তু তবুও একটা সমস্যা থেকে যাচ্ছে—

হরিশ: বলুন।

সদানন্দবাবু: শুধু কি তাহলে নূতন পক্ষলোলুপ বৃদ্ধদের সুবিধার জন্যই আপনারা এই প্রতিষ্ঠান খুলে বসেছেন? কন্যাদায়ে যাঁরা সত্যই বিব্রত, তাঁদের সেই দায় উদ্ধারের কি উপায় আপনারা করেছেন জানতে পারি—যাদের দুঃখমোচনের উদ্দেশ্যেই সমিতির এই নাম রাখা হয়েছে?

হরিশ এবার জোরে হেসে ফেলে বলল: আমরা ভেবেছিলাম, অনুমানেই আপনি সেটাও বুঝেছেন,—আমাদের বলার অপেক্ষা না রেখেই।

অমনি হরিশের মুখের কথা টেনে নিয়ে বলল: এক পক্ষে কি এ কাজ হয় মশাই, দু-পক্ষই চাই। নেগেটিভ পজেটিভ না হলে বিদ্যুতের ক্রিয়া হয় না—বিয়েটাও তাই। কন্যাপক্ষ না এলে আপনাদের খুসি করব কি উপায়ে বলুন? যাঁরাই কন্যাদায় থেকে উদ্ধার পাবার জন্য বিব্রত হয়ে পড়েন, তাঁরা ত এখানে আসেনই; তখন কন্যাদের পরিচয়—মায় ফটো পর্যন্ত রেখে যান। সেইগুলিই ত আমাদের সম্বল—আপনারা প্রার্থী হয়ে এলেই গাঁই-গোত্র মিলিয়ে ডালি সাজিয়ে দিই···বুঝলেন কথাটা, না এখনো সন্দেহ বা জিজ্ঞাস্য কিছু আছে?

সদানন্দবাবু বললেন: আর একটা কথা—ঐসব কন্যাদের জন্যে শুধু আমাদের মত পথহারা প্রার্থীরাই কি উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকেন? অর্থাৎ তরুণ পাত্রের উপযুক্ত তরুণী কন্যার সংযোগের কোন ব্যবস্থা এখানে থাকে না?

হরিশ এখন তিক্তকণ্ঠে বলল: আজ্ঞে না। কাঁচা বয়সের আইবুড়ো ছেলেরা—বিয়ের বাজারে যাদের সুপাত্র বলা হয়, সেই সব কার্তিকদের জন্যে এ প্রতিষ্ঠান নয়। তারা কি কেউ বিনা পণে বিকোয় মশাই? যে সব পাত্রের বয়স হয়েছে, অথচ পক্ষের পর পক্ষ হারিয়ে, বিয়ের সাধ যায় নি—তাঁরাই হচ্ছেন এই প্রতিষ্ঠানের পাত্র। পণ তো এঁরা নেবেনই না, বরং উলটে দেবেন।

সদানন্দবাবু পুনরায় জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন শেষের কথাটা শুনে। দৃষ্টির সঙ্গে প্রশ্নও তুললেন: বিয়ের পাত্র পণ তো নেবেই না, বরং দেবে! এ আবার কি কথা?

হরিশ তখন সমিতির নিয়মাবলী বার করে কথাটা খোলসা করে বুঝিয়ে দিল সদানন্দবাবুকে। আগাগোড়া সমস্ত বুঝে সদানন্দবাবু তৎক্ষণাৎ মনিব্যাগ খুলে দশটাকার একখানি নোট দাখিল করে বললেন: বেশ, আমার নাম তা'হলে আপনাদের খাতায় রেজেষ্টারী

করে নিন।

টাকা জমা ক'রে অর্থাৎ সদানন্দবাবুকে কন্যাদায়োদ্ধার সমিতির রেজিষ্টার্ড গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত করে নিয়ে হরিশ একখানা বাঁধানো খাতা খুলে প্রশ্ন ক'রে পর পর শূন্য স্থানগুলি পূরণ করতে লাগল। কি নাম তাঁর, কত বয়স, কি পেশা, কোন্ পক্ষ, কি রকন কন্যা চান ইত্যাদি। আগেকার মতই মনে মনে কৌতুক বোধ করে সদানন্দবাবু উত্তর দিয়ে চললেন; তবে তিনি যে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি, সে কথা গোপন রেখে সরকারী আফিসের পেন্সনভোগী বলেই পেশার ঘর পূরণ করালেন।

লেখার পাট শেষ হলে, তিনি বললেন: যে সব পাত্রী আপনাদের হাতে আছে, আমারও পালটি ঘর হয়, এমন দু'একখানা ফটো এখন দেখান দেখি।

শশী তাড়াতাড়ি উঠে হরিশের নির্দেশ মত চারখানি ফটো দেখাল। এরা প্রত্যেকেই ব্রাহ্মণ কন্যা এবং সদানন্দবাবুর পালটি ঘর। সদানন্দবাবু নাসিকা কুঞ্চিত করে বললেন: এদের মধ্যে একটাও চলবে না, আরো ভালো পাত্রী চাই।

তখন দুই পার্টনার পরামর্শ ক'রে যে ফটোখানি সদানন্দবাবুর হাতে দিল, তিনি সেখানি দেখে বললেন: এ মেয়েটি মন্দ নয়। আমার পছন্দ হয়েছে। এর নাম এবং অভিভাবকের ঠিকানা বরং দিতে পারেন।

হরিশ বলল: আজ্ঞে স্যার, এ রকম ত দস্তুর নয়; আগে দর দস্তুরি পাকা হোক। তারপর, কথা হচ্ছে—এ মেয়ের ফটো দেখে আরো তিনজন পছন্দ করে গেছেন; তাঁদের মধ্যে এখন দেওয়া থোওয়া নিয়ে রেশারেশি চলেছে।

সদানন্দবাবু জিজ্ঞাসা করলেন: হায়েষ্ট দর কত উঠেছে? আর সে ব্যক্তির নাম জানতে পারি?

হরিশ বলল: আজ্ঞে না, সেও দস্তুর নয়। যাঁরা এখানে আসেন, নাম ঠিকানা তাঁদের চেপে রাখাই আমাদের নিয়ম। তবে দর কত উঠেছে সেটা বলতে পারি।

সদানন্দবাবু বললেন: বেশ, তাই বলুন।

হরিশ বলল: বিশেষ রূপসী মেয়ের ব্যাপারে আমাদের প্রতিষ্ঠানকে হাজার এক টাকা নমস্কারী দেবার নিয়ম। এটা হলো আমাদের পাওনা। এর পর বিয়ের খরচ। কন্যার পিতামাতার প্রণামী ইত্যাদি বাবদে মোটমাট থোক্ টাকা ধরে দিতে হয়। সেটা মেয়ের রূপগুণ যেমন, সেইভাবেই স্থির করি। কিন্তু এই মেয়েটির বাপ মা নেই, কাকার কাছে মানুষ, তিনিই এর অভিভাবক, তাঁর স্ত্রী আছেন। ঐ যে তিন ব্যক্তির কথা বললাম—মেয়েটিকে যাঁরা আগেই পছন্দ করেছেন, তাঁদের মধ্যে একজন অফার করে গেছেন স্যার—বিয়ের খরচ বলে মোটমাট আড়াই হাজার টাকা মেয়ের কাকাকে দিবেন, মেয়ের কাকীকে একখানা বেনারসী আর পাঁচভরির চুড়ি দিয়ে প্রণাম করবেন, তারপর পাত্রীকে তিনি নিজের পছন্দমত বস্ত্রালঙ্কারে সাজিয়ে দেবেন বিয়ের আগেই। এখন মশাই কি এর ওপরে পারবেন উঠতে ?

সদানন্দবাবু একটু গম্ভীর হয়ে বললেন: তা'হলে একটু ভেবে দেখতে হয়—ঝাঁ করে এখনি ত বলতে পারছি না। তবে মেয়েটি আমার চোখে লেগেছে। আর চোখে লাগলে টাকার ব্যাপারটা বড় কথা নয়। আচ্ছা, মেয়েটির নাম বলতে আপনাদের আপত্তি আছে কি ?

শশী না ভেবেই খপ করে বলে ফেলল: না, না, নাম বলতে আর আপত্তি কি ? মেয়ের নামটি ভারি মিষ্টি মশাই—নিরলা দেবী।

কিন্তু নামটি বলে হরিশের মুখের পানে চেয়েই শশী চমকে উঠল ; হরিশের মুখের চেহারা যেন বদলে গেছে। শশী বুঝল, হঠাৎ

এভাবে গায়ে পড়া হয়ে নামটি বলে সে ভাল করেনি, হরিশ চটে গেছে। অগত্যা সে মুখখানা নীচু করে নীরবে বসে রইল। কিন্তু শশীর মুখে নামটি শুনে সদানন্দবাবু উৎফুল্ল হয়ে ভাবলেন, তাঁর আসা তাহলে সার্থক হয়েছে। নিজের কন্যার কাছে এই নামটি শুনেই তিনি নোটবুকে লিখে নিয়েছিলেন। এখন বুঝলেন, এই রূপসী কন্যাটিকে নিয়ে যে অপ্রীতিকর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে, সেই সূত্রেই এই মেয়েটি কন্যাপীঠের সভানেত্রীকে পত্র লিখে প্রতিকার-প্রার্থিনী হয়েছিল। মেয়েটির ফটো দেখে সদানন্দবাবু সত্যিই বিমুগ্ধ হন এবং গাঁই গোত্রাদি জিজ্ঞাসা করে জানতে পারেন যে, সে-দিক দিয়ে কোনরূপ প্রতিবন্ধক নেই।

অবশেষে সদানন্দবাবু সহাস্যে বললেন: তা'হলে আজকের মত উঠি। এ মেয়ের ওপর যে দর উঠেছে, সে তো শুনলাম; এখন বাড়ী গিয়ে ভেবে দেখি—কি করতে পারি। পরে খবর পাবেন।

সদানন্দবাবুকে উঠতে দেখে হরিশও সঙ্গে সঙ্গে উঠে সবিনয়ে বলল: কন্যাপক্ষের ঠিকানাটা দিতে পারলাম না বলে, যেন রাগ করবেন না স্যার, আমাদের প্রতিষ্ঠানের নিয়ম ভেবে মাপ করবেন। আসবেন আর এক দিন, আরো দুটি রূপসী মেয়ের ফটো আসবার কথা আছে।

বিলক্ষণ! আসব বৈকি।—বলতে বলতে সদানন্দবাবু ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। হরিশও পরক্ষণে চোখ পাকিয়ে শশীকে বলল: নিরলার নামটা খপ করে শুনিয়ে দেওয়া হলো কেন? একবার আমার দিকে তখন তাকালেও না—জানো, কত বড় অন্যায় করেছ?

অপ্রস্তুতের মত মুখভঙ্গি করে শশী বলল: আমি ঠিক বুঝতে পারিনি হরিশদা! হঠাৎ কেমন—

মুখখানা বিকৃত করে হরিশ বলল: এখন চট করে ভোল পালটে লোকটাকে ফলো করো দেখি। ঘর বাড়ী কেমন, আর কি কাজকর্ম

করে, এ সব খবর ভাল ক'রে এখনি জেনে আসা চাই।

শশী তৎক্ষণাৎ পাশের ছোট ঘরখানির ভিতর সেঁধিয়ে গেল এবং মিনিট দুই পরে যখন বেরিয়ে এলো, তার মুখে সেই চাপ দাড়ীর চিহ্নও নেই, দিব্য ক্ষৌরিত মুখখানা। মাথা থেকে সেই টুপীটিও অদৃশ্য হয়েছে, বেশ সুবিন্যস্ত কেশপাশ, পিছন দিকে ব্রাস করা। এখন শশীকে দেখে মনে হয় যে, হরিশের চেয়ে সে বছর পাঁচেকের ছোটই হবে বয়সে। প্রতিষ্ঠানের আফিসে শশী দাড়ি এঁটে ছদ্মবেশে বরাবর উপস্থিত থাকে। পরে প্রয়োজন অনুসারে সে বিভিন্নরূপে বিভিন্ন স্থানে রওনা হয়ে হরিশের নির্দেশমত কাজ সম্পন্ন করে।

শশী জানে, সদানন্দবাবু পদব্রজেই তাদের আফিসে এসেছিলেন। কারণ, এই সঙ্কীর্ণ গলি পার হয়ে বড় রাস্তায় পড়তে তিন মিনিটের বেশী সময় লাগে। এ গলিতে কোন গাড়ীর প্রবেশ একরূপ দুঃসাধ্য। আফিস থেকে বেরিয়ে দ্রুতপদে শশী ছুটল সদানন্দবাবুকে অনুসরণ করে। তিনি ধীরে ধীরে বড় রাস্তার দিকেই যাচ্ছিলেন। বড় রাস্তায় গিয়েই একখানা রিক্সা ভাড়া করে হাঁকলেন: সিমলে ষ্ট্রীট—

রিক্সাখানা আরোহীকে নিয়ে বেরিয়ে যেতেই শশীও একখানা রিক্সা ভাড়া করে বলল: আগের ঐ রিক্সার ঠিক পিছনে পিছনে চল; ভাড়া নিয়ে গোল হবে না।

দু'খানি রিক্সাই সর্ট কার্ট ধরে আগুপিছু সিমলা ষ্ট্রীটের উদ্দেশে ছুটল। তখনো সন্ধ্যা হয় নাই; তবে দিনের আলো ম্লান হয়ে এসেছে।

পাঁচ

কন্যাপীঠের প্রতিষ্ঠাত্রী লীলাদেবী এক অদ্ভুত প্রকৃতির মেয়ে। সমাজ বা কৌলিক সম্পর্কে তাঁর আপনার জন কেউ আছেন কিনা সে তথ্য সবার অজ্ঞাত হলেও, আর এক দিক দিয়ে কলেজের প্রত্যেক মেয়েকে ইনি নিজের গুণে আপনার করে নিয়েছেন। সেই জন্যে কলেজশুদ্ধ মেয়েরা তাঁকে 'লীলাদি' বলেই জানে। প্রবেশিকা পরীক্ষার বৃত্তির টাকা ও গুটি দুই পরিবারের মেয়ে পড়িয়ে পরিশ্রমলব্ধ অর্থ সম্বল করে একটি বিশিষ্ট মহিলা মেসে আশ্রয় নিয়ে বরাবর ইনি পড়াশোনা চালিয়ে এসেছেন।

মহিলা কলেজের ছাত্রীরূপে ইনিই কন্যাপীঠ প্রতিষ্ঠা করেন। নারী-আন্দোলনে এই কলেজের যে-সব ছাত্রী বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করেছিলেন, লীলাদেবীর নাম তাঁদের প্রথমেই উল্লেখ ক'রতে হয়। সম্প্রতি এম-এ পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে প্রথম স্থান অধিকার করায় মহিলা কলেজের কর্তৃপক্ষ এঁকে উক্ত কলেজে অধ্যাপিকার পদে নিয়োগ পত্র দেন। এ ব্যাপারে ছাত্রী-মহলে বুঝি আনন্দ ধরে না, কিন্তু সেই সঙ্গে তাদের মনে নূতন ভাবনা ওঠে—অধ্যাপিকার আসন থেকে তাদের লীলাদি আর কি কন্যাপীঠের প্রেসিডেন্টের আসনে এসে বসবেন? কিন্তু সেই দিনই লীলাদেবী কন্যাপীঠের সদস্যাদের ডেকে জানিয়ে দিলেন: কন্যাপীঠের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ বরাবর বজায় থাকবে, যথাবিধি আমি এর সভানেত্রীর কাজ করে যাব। এই সর্তে প্রিন্সিপালকে রাজি করিয়ে তবে নিয়োগপত্র গ্রহণ করেছি।

কন্যাপীঠের কন্যারা তখন নিশ্চিন্ত হয়ে আরো বেশী উৎসাহে এ কাজে লেগে পড়ল। লীলাদেবী বিশেষ একটা বৈঠকে তাদের এভাবে আশ্বাস দিলেন: পণপ্রথার উচ্ছেদ না হওয়া পর্যন্ত কন্যাপীঠের কাজ দুর্বার গতিতে চলতে থাকবে। যে-সব অর্থলোভী অভিভাবক পণের নামে এই সামাজিক পাপে প্রবৃত্ত হবে, আমরা তাদের প্রত্যেককে 'পণ-পাহাড়' নামে চিহ্নিত করব; পথে-ঘাটে, ট্রামে-বাসে, আফিসে, বিদ্যাপীঠে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করে তাদের জীবনকে বিড়ম্বিত করে তুলব। এ কুপ্রথার অবসান আমরা ঘটাবই।

কলেজে অধ্যাপনা এবং কন্যাপীঠের কাজ ছাড়া লীলাদেবী সাময়িক পত্রে নিয়মিতভাবে লিখে থাকেন; এ থেকেও তাঁর কিছু কিছু অর্থাগম হয়। এখনো বিশিষ্ট ঘরের দুই তিনটি মেয়েকে সকালে সায়াহ্নে পড়ান। তাঁর কাজকর্ম সবই বাঁধা ধরার মধ্যে। ঘড়ির কাঁটার মত লীলাদেবীর কর্মবহুল জীবনের দিনগুলি বরাবর চলে এসেছে—একটু এদিক-ওদিক হবার জো নেই।

বাইরে থেকে কন্যাপীঠের প্রেসিডেন্টের নামে যে দু'খানি চিঠি আসে, তা' থেকে নিরলা নাম্নী মেয়েটির চিঠি সম্পর্কে তদন্তের ভার সম্পাদিকা রেখাদেবীর উপর ছেড়ে দিয়ে অপর চিঠির প্রেরকটির সঙ্গে তিনি নিজেই সাক্ষাতের সঙ্কল্প করেন। চিঠির লেখক 'ভীমরুল' নামেই নিজের পরিচয় দিয়েছেন। রহস্যময় নাম। নির্দিষ্ট ঠিকানায় গিয়ে নাম ধরে অনুসন্ধান করাও মুস্কিলের কথা। কিন্তু এ-সব ব্যাপারে লীলাদেবী একেবারে বে-পরোয়া। একদিন সকালের দিকে একলাই তিনি বেরিয়ে পড়লেন ভীমরুলের ঠিকানার উদ্দেশে।

উত্তর ক'লকাতার টালা অঞ্চলে প্রকাণ্ড একখানা আড়ত বাড়ী। সামনের দিকে খানিকটা খোলা জমির উপর গরুর গাড়ী, মোষের গাড়ী, ঠেলা গাড়ী সব ভীড় করে ঘেঁসাঘেঁসি অবস্থায় মাল তুলছে। বড় বড় প্যাকিং বাক্স, তেলের পিপে, চটের গাঁইট, তামাক পাতার

বস্তা, গুড়ের টিন চারদিকে স্তূপীকৃত হয়ে রয়েছে। খোট্টা, মাড়োয়ারী, নেপালী, উড়িয়া প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর শ্রমিকদিগকে ছুটোছুটি করতে দেখা যাচ্ছে—আশ্চর্য, এদের মধ্যে একটিও বাঙালী নেই! আড়তদারদের মধ্যে অবশ্য দু চার জন বাঙালী আছেন—এক একখানা ঘরে তক্তপোষের উপর বিছানো ছোট ছোট ফরাসে বসে নিবিষ্ট মনে আড়ত চালাচ্ছেন। বাহিরের লোকজন পূর্বাহ্ণেই এমনি কর্মব্যস্ত যে, লীলাদেবীর মত একটি সুদর্শনা বাঙালী তরুণীকে এহেন দুর্গম স্থানে একাকিনী আসতে দেখেও কারো মনে বিশেষ কোন কৌতূহলের উদ্রেক হলো না। এ অবস্থায় লীলাদেবীকেই প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে ব্লকের নম্বরটি জেনে নিতে হলো। সেই বিস্তীর্ণ আড়ত-বাড়ীটির পিছনে উপরে ওঠবার টানা সোপানশ্রেণী প্রত্যেক তলার প্রবেশ দ্বারের পাশ দিয়ে সর্বোচ্চ তলার দরজার মুখে গিয়ে শেষ হয়েছে। সে দ্বারটি খোলাই ছিল। সেখানে দাঁড়িয়ে লীলাদেবী দেখতে লাগলেন—সামনে উঁচু পাঁচিলে ঘেরা ময়দানের মত প্রকাণ্ড ছাদ। ডান দিকে ছাদের এক কোণে ময়লা জলের একটা বিরাট ট্যাঙ্ক; বাম দিকে তফাতে ছাদের একেবারে শেষ প্রান্তে কালো রঙের একটা দরজা—তার পাল্লাদুটি বন্ধ, কালো কালো বড় বড় দুটো কড়া বদ্ধ দরজার বুকে ঝুলছে। পাশের চূণকাম-করা দেওয়ালে ক্ষুদ্র একটা কালো রঙের তক্তা আঁটা রয়েছে। লীলাদেবীর বুঝতে বিলম্ব হলো না যে, ঐ খানেই ভীমরুলের সন্ধান মিলবে।

রুদ্ধ দ্বারের সামনে এসে দেওয়ালে আঁটা কালো বোর্ডে লেখা সাদা সাদা হরফগুলির দিকে তাকাতেই লীলাদেবীর বড় বড় দুটি চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠল। পালিস করা কালো তক্তার উপর সাদা হরফে সেই বাঞ্ছিত নামটি লেখা রয়েছে—'ভীমরুল'।

দরজায় লাগানো কড়া দুটির দিকে হাত বাড়াতেই হঠাৎ লীলাদেবীর চোখে পড়ল—চৌকাঠের গায়ে ইলেকট্রিক বেলের

সুইসটি টিপে গৃহস্বামীকে আহ্বানের নির্দেশ রয়েছে। নোংরা একটা পুরানো আড়ত বাড়ীর ছাদের উপর রহস্যময় নামধারী গৃহস্বামীর বাসস্থানের এরূপ আধুনিকতা লীলাদেবীর মত শিক্ষিতা আধুনিকা মেয়ের মনে একটা বিস্ময়ের দোলা দিল বৈকি! ক্ষিপ্রহস্তে সুইসটি টিপে দিয়ে সাগ্রহে তিনি 'ভীমরুল' নামধেয় মানুষটির প্রতীক্ষা করতে লাগলেন।

এক মিনিটের মধ্যেই দরজার দুটি কপাট দু' পাশে সরে যেতেই লীলাদেবী দেখতে পেলেন, দশ বারো বছরের একটি ছেলে—গায়ের রঙের সঙ্গে মিলিয়ে তৈরী করা পুরো হাতাওয়ালা টাইটজামা ও ইজের পরা অবস্থায় দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। পরক্ষণেই ছেলেটি যদি তার আকর্ণবিসারী সাদা সাদা দাঁতগুলির বাহার দেখিয়ে হাত দুখানি যুক্তকরে ললাটে না ঠেকাত, তাহলে হয়ত লীলাদেবী তাকে কষ্টি-পাথরে গড়া একটা মূর্তি বলেই ভ্রম করতেন। কিন্তু তাঁকে কোন প্রশ্ন করবার সুযোগ না দিয়েই একান্ত তৎপরতার সঙ্গে ছেলেটি দেওয়ালের হুকে টাঙানো এক গোছা ছাপানো ফরম থেকে একখানা কাগজ টেনে খুলে নিয়ে পাশের টেবিলের উপর রেখে সবিনয়ে বলল: বসুন—আপনার নাম ঠিকানা সব এতে লিখুন।

লীলাদেবী সবিস্ময়ে দেখলেন, ক্ষুদ্র একখানি লম্বাটে ঘর, কতকটা দরদালানের মত। কিন্তু ঘরের মেঝে থেকে দেওয়াল, ছাদ, এমন কি—আসবাবগুলি পর্যন্ত প্রত্যেকটি কালো রঙের পালিস করা। ঘরখানির আয়তন অনুযায়ী কালো রঙের একখানা লম্বা টেবিল এক ধারে রয়েছে, তার সামনে সাত আটখানা কেদারা—সেগুলিও কালো রঙ করা। একদিকে কালো কাঠের পার্টিসন—ছাদ পর্যন্ত তোলা, তার মাঝখানেই ভিতরে যাবার দরজা। লীলাদেবী বুঝলেন, গৃহ-স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার 'ওয়েটিং রুম' হচ্ছে এই ক্ষুদ্র স্থানটি। চেয়ারে বসে টেবিলের উপর রাখা স্লিপখানির দিকে তাকাতেই

দেখলেন, তার সবটুকুই প্রায় কালো, কেবল সাক্ষাৎকারীর নামে ঠিকানা লিখবার স্থানটুকুতে কাগজের স্বাভাবিক রঙ বজায় আছে। চেয়ারে বসলেই দেওয়ালে টাঙানো পাঁচজন মহামানবের ছবির দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট না হয়ে পারে না। তাঁরা হচ্ছেন—শিবাজী, শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, গান্ধীজী ও নেতাজী। ছবিগুলির ব্যাকগ্রাউণ্ড ও ফ্রেম কালো রঙের।

স্লিপের সঙ্গে পেনসিল ছিল; লীলাদেবী নিজের নামের নীচে লিখলেন—কন্যাপীঠের প্রেসিডেন্ট। স্লিপখানি নিয়ে দরজা ঠেলে ছেলেটি ভিতরে চলে গেল, মিনিট খানেক পরেই ফিরে এসে পুনরায় যুক্ত করযুগল কপালে ঠেকিয়ে আগেকার মতই হেসে বলল: ও ঘরে কর্তা একলা আছেন, আর কেউ নেই—আপনি যান।

কথার সঙ্গে স্প্রীংয়ের দরজা টেনে লীলাদেবীর ভিতরে প্রবেশে সাহায্য করল ছেলেটী।

সুপ্রশস্ত ও সুসজ্জিত একখানি ঘর। এখানেও আগাগোড়া কালো রঙের বাহার চোখের উপর বৈচিত্রের সঞ্চার করছে। প্রতিটী জানালার উপর ঝুলছে কালো রঙের পরদা; কালো কাঠের আলমারির কাঁচের দরজার ভিতর দিয়ে কালো চামড়ায় বাঁধানো বইগুলির আভা ফুটে বেরুচ্ছে। বিজলীর আলোর ডুমে কালো ঘেরাটোপ, পাখার ব্লেডগুলিও কালো রং করা; ঘরের মাঝে প্রকাণ্ড টেবিলখানার উপরে কালো আস্তরণ—তার চারদিকে কালো ফিতায় বাঁধা রাশি রাশি ফাইল। সামনের দিকে হাতল দেওয়া কালো রঙের একখানি কেদারা রয়েছে। টেবিলখানার অপর দিকে গৃহস্বামীকে দেখবার আশায় দৃষ্টিক্ষেপ করতেই লীলাদেবীর সর্বাঙ্গ শিউরে উঠল—চেয়ারখানা আবৃত করে এক অদ্ভুত মূর্তি স্থিরভাবে উপবিষ্ট! তাঁর মুখের উপর কালো রঙের একটা আবরণ ঠিক মুখোসের মত দেখা যাচ্ছে, কেবল মুখের দুটি ঠোঁট, চোখ ও কানের কাছে একটু ফাঁক—দেখবার, বলবার ও

শোনবার সুবিধাটুকুর জন্য। মূর্তির পরণে মিশমিশে কালো রঙের আলখাল্লা, জরদা রঙের এক খণ্ড রেশমী বস্ত্র গলায় জড়ানো, হাতের আঙুলগুলি থেকে মণিবন্ধ পর্য্যন্ত কালো রঙের হাত-মোজায় আবৃত।

মূর্তিই প্রথমে ঘরের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে দস্তানায় আবৃত হাত দুটি তুলে বললেন: নমস্কার! আমি জানতাম আপনাদের কেউ আমার সন্ধানে এখানে আসবেন। বসুন। আমিই ভীমরুল।

ভীমরুলের কথায় খাস পূর্ববঙ্গের সুর ও টান। লীলাদেবী যুক্তকরপল্লব দুটি তুলে প্রতিনমস্কার করে সামনের খালি চেয়ারখানায় বসলেন, তারপর বদ্ধদৃষ্টি ভীমরুলের মুখের উপর রেখে মৃদু হেসে পশ্চিম বঙ্গের উচ্চারণ ভঙ্গিতে বললেন: আপনার নাম শুনেই অবাক হয়েছিলুম, এখন বাসায় এসে তার পরিবেশ আর আপনাকে স্বচক্ষে দেখে আরো বেশী আশ্চর্য হয়েছি। মনে হচ্ছে, যেন কোন রহস্য-রাজ্যে এসেছি।

মানুষটির মুখের অধিকাংশ মুখোসে আবৃত থাকায় তার ভংগিটুকু জানবার উপায় ছিল না। চোখের দৃষ্টি থেকে উপলব্ধি করবার আশায় বুদ্ধিমতী লীলাদেবী নিজের দৃষ্টিকে প্রখর করলেন।

ভীমরুল তেমনি পূর্ববঙ্গীয় উচ্চারণভংগিতে বললেন: হতে পারে, আমি একটা রঙকে প্রতীক বলে মেনে নিয়েছি, সেই সঙ্গে নিজের স্বাভাবিক চেহারাটিকে তার আবেষ্টনে ঢেকে রেখেছি; কিন্তু এর জন্যে অন্য কিছু ভেবে যেন আমার ওপর অবিচার করবেন না লীলাদেবী। এ দুটোতেই আমার স্বাধীনতা আছে। আসলে আমার কাজ হচ্ছে অন্যায়ের সঙ্গে লড়াই করা। এ ছাড়াও, কোন মানুষ বা কোন প্রতিষ্ঠান অন্যায়ের প্রতিকার করতে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে শুনলেই আমার রক্তে দোলা লাগে, যেচে গিয়ে আমি তাঁদের কাজে হাত লাগাই। খবরের কাগজে আপনাদের প্রতিষ্ঠানের মহৎ উদ্দেশ্যের

কথা ছেপে বেরুতে, আমি এতই অভিভূত হই যে, মনে মনে বাহবা দিয়ে চুপ করে থাকতে পারিনি—চিঠি লিখে আমার সহানুভূতি জানিয়েছিলাম।

লীলাদেবী: মুখে বা কাগজে-কলমে অনেকেই আমাদের উদ্দেশ্যকে সহানুভূতি জানিয়েছেন।

ভীমরুল: আপনি ঠিক বলেছেন—এই ধরণের মৌখিক সহায়তাই বেশী পাবেন। আমি কিন্তু কথার চেয়ে কাজকেই বেশী পছন্দ করি। কথা আমরা অনেক বলেছি, কিন্তু এখন কাজের সময় এসেছে। আপনারা আপনাদের কন্যাপীঠ সম্পর্কে যে কোন একটা কাজের ভার আমার উপর চাপিয়ে পরীক্ষা করে দেখতে পারেন।

মনে মনে কি ভেবে লীলাদেবী বললেন: ভার যেন দিলাম, কিন্তু তার জন্যে······

এখানে ভীমরুলের চোখের দৃষ্টি হঠাৎ তীক্ষ্ণ হয়ে উঠতেই লীলা-দেবীর মুখের কথাটা আটকে গেল। অমনি ভীমরুলের মুখ থেকে প্রশ্ন উঠল: দক্ষিণার কথা বলছেন? তা'হলে আমাকে দিয়ে আপনাদের পোষাবে না। আমি ত জানি, সমাজের হিতের জন্যে কোমর বাঁধতে হলে, ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে হয়। আপনারা সকলেই ছাত্রী, আপনি না হয় হালে কলেজে একটা চাকরী পেয়েছেন; তাহলেও সংস্থার কাজে টাকা পয়সা ছাড়বার সামর্থ আপনাদের নেই। আমিও পয়সার প্রত্যাশায় বা অন্য কোন স্বার্থের খাতিরে ওভাবে চিঠি পাঠাইনি। আমি সত্যই এ ব্যাপারে ব্যথার ব্যথী। অনেক-গুলো জানা সংসার এই পণ-প্রথার আগুণে জ্বলে পুড়ে গেছে, আর আমার তা জানা আছে বলেই, আমার মনেও আগুন জ্বলছে: আমি যা করব, নিঃস্বার্থভাবেই করব; এমন কি, বাহবা নেবার লোভটুকুও নেই। এখন যদি বিশ্বাস হয়, বলুন—কোন্ কাজের ভার আমাকে দিচ্ছেন।

লীলাদেবী বললেন: দেখুন আপনার চিঠিখানা সত্যিই আমাদের মনে একটা উৎসাহ জাগিয়েছে। এখন আপনার চিঠির সংগে আপনাকে মিলিয়ে দেখবার উদ্দেশ্যেই আমি এখানে এসেছিলাম। যদি আপনার স্বরূপ মূর্তিটি ঠিক দেখতে পেতাম, তা'হলে আলোচনাটা অন্যভাবে হতে পারত। আমিও আপনাকে বোঝবার চেষ্টা করতাম। কিন্তু আপনি এমন রহস্যময় আবেষ্টনের মধ্যে রয়েছেন, যার জন্যে আপনাকে ঠিক উপলব্ধি করতে পারছি না। আপনিই বলুন, এ অবস্থায় ধোঁকা যদি লাগে বা মনে সন্দেহ জাগে, সেটা কি অন্যায়? কেমন করে বুঝব—যে ব্যক্তি নিজেকে লোকচক্ষুর আড়ালে রাখতে চান, স্বরূপ মূর্তি দেখাবার যাঁর সাহস নেই—আসলে তিনি কোনো 'ক্রিমিন্যাল' নন? তাঁর পিছনেও সরকারী অন্যায়-দমনকারীর দল ঘুরে বেড়াচ্ছে না? একটা ছাত্রীসংস্থা কেমন করে সেই লোকের সংগে যোগাযোগ রাখতে পারে?

ভীমরুলের দৃষ্টি পুনরায় প্রখর হয়ে উঠল। ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থেকে সে উত্তর করল: আপনার কথা শুনে আমি খুসি হয়েছি; আপনি যে কলেজের ছাত্রীদের একটা বিশিষ্ট সংস্থা পরিচালনার যোগ্য পাত্রী, আমি সেটা জান্‌তে পেরে আশ্বস্ত হচ্ছি। তা'হলে অসংকোচেই আমার কথা আপনাকে বলছি, আর—আমারও ভরসা আছে—কথাগুলো চাপাই থাকবে।

লীলা: আপনি আমাকে সব কথা খুলে বলুন, আমি অঙ্গীকার করছি, আপনার কথা আর ব্যক্ত হবে না।

ভীমরুল: সে বিশ্বাস আমার আছে। দেখুন, কোন বড় কাজ করতে গেলে তার পিছনে টাকা না হলে চলে না। কাজেই অন্যায়কে দমন করবার ব্রত নিতে হলে তার জন্যে দরাজ হাতে টাকা খরচ করতে হয়। তাই আমাকেও টাকা উপায়ের একটা রাস্তা বেছে নিতে হয়েছে। আপনার মত শিক্ষিতা মেয়েকে স্বীকার করতে হবে যে,

এ যুগের টাকাটা বাঁকা রাস্তা দিয়েই সহজে আসে—সে রাস্তাও খুঁজে নিতে হয়। অনেক কষ্ট বা সাধনা করে যা পাওয়া যায়, সে হলো সত্য ও ন্যায়ের পথ ; আর বাঁকা পথে যা পয়দা হয়, সে অন্যায় হতে বাধ্য। কিন্তু উপার্জ্জনের ব্যাপারে এই বাঁকা পথটাই এ যুগে অপরিহার্য হয়ে পড়েছে এবং দেশের বাণিজ্য যাহাদের মুখাপেক্ষী হয়ে চলে—তাঁরা পর্যন্ত এ পথের মোহ কাটাতে পারেননি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের এক কুখ্যাত আমদানী এই বাঁকা পথটি। বাঁকা পথের একটা মুখরোচক নাম হয়েছে—কালোপথ। সেই থেকে হয়েছে—কালোবাজার, কালো টাকা।

লীলা : তাহলে কালো পথে আপনার ভাগ্যও পাড়ি জমিয়েছে বলুন—আর সেই জন্যই আপনার প্রতিষ্ঠানটিকে কি কালো রঙে ঢেকে ফেলেছেন ?

ভীমরুল : আমার কথাগুলি আগে শুনুন—তারপর বিচার করবেন ইচ্ছামত। হ্যাঁ, বাঁকা পথে আমার ভাগ্যকে চালাতে হয়েছে বৈকি ! তবে অনেক ভেবে চিন্তে আমি আবার ওথেকে 'সর্টকাট' বা'র করে তথাকথিত 'অন্যায়'টির উপর এক পোঁচ সুগার কোটিং দিয়ে চলনসই করে নিয়েছি—যেটা আইনে বাধে না, অথচ উপার্জনও মন্দ হয় না।

লীলা : এখন ব্যাপারটি কি ?

ভীমরুল : দেখলাম—চাল, কাপড়, চিনি, কয়লা থেকে ওষুধ পথ্য নিয়েও কালো ব্যাপার চলছে ; কিন্তু আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে—অন্যায়কে দমন করা। কাজেই ও বাঁকা রাস্তায় পাড়ি জমানো খুব সোজা জেনেও আমাকে মুখ ফিরিয়ে একটা নতুন রাস্তা বা'র করতে হলো।

লীলা : সেটি কি ?

ভীমরুল : কলা-শিল্পের ব্যাপার।

লীলা ঃ সে কি?

ভীমরুল ঃ চমকাবেন না লীলাদেবী! এ যুগে এটিও বড় সোজা ব্যাপার নয়, অথচ মজা এই যে, এখানে তথাকথিত কালো ব্যাপারের মাতব্বর মহাজনদের কোন কম্পিটিসানই নেই। কলা বলতে এর সংগে সংশ্লিষ্ট অনেক কিছুই বুঝতে হবে। যেমন— খবরের কাগজ, মাসিক পত্র, ইস্কুল-কলেজ-পাঠ্য ছোট বড় অসংখ্য গ্রন্থ, সিনেমা, ষ্টেজ, ষ্টুডিও পর্যন্ত।

লীলা ঃ আপনি যে অবাক করলেন দেখছি! কালো ব্যাপারের সংগে শিক্ষা, সংস্কৃতি, শিল্পকেও এনে ফেললেন, মায় বই পর্যন্ত!

ভীমরুল ঃ তাহলে ছোট্ট এক উদাহরণ দিয়ে আগে আপনার সংশয় মোচন করা যাক্। কথা-সাহিত্যিক শরৎ চাটুজ্যে মশাই তাঁর খান দুই বইএর কপিরাইট শ' আড়াই টাকায় বেচে গিয়েছিলেন— আর যাঁরা কিনেছিলেন, তাঁরা তা থেকে লাখ আড়াই টাকা কামিয়েছেন, ভবিষ্যতে আরো কামাবেন। এখন বলুনত' এটা কি হেলা করবার মত কালো ব্যাপার? এমনি করে ফিরিস্তি দিয়ে কয়েক ক্রোড় টাকার হিসেব দাখিল করতে পারি। তারপর, খবরের কাগজে জাঁক করে যে কালোবাজারের কেচ্ছা ছাপা হয়— তাদের ব্যাপার বললে, ভাববেন যে, ভূত ছাড়াতে ওঝা যে সরষে ছড়ায়—সেই সরষের মধ্যেই ভূত ঢুকে আছে।

লীলা ঃ না, আমি হার মানছি; আপনি বলুন!

ভীমরুল ঃ খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিলাম—'না লিখেও যদি লেখক হতে চান, সাহিত্যের আসরে বসতে ইচ্ছা করেন, সম্পাদক সেজে নাম বাজাতে সাধ হয়, আপনার গান, আপনার গল্প সিনেমায় ছবির পরদায় ফুটিয়ে তুলতে কামনা জাগে, তাহলে ভীমরুলের সংগে দেখা করুন।'···বিজ্ঞাপনের সংগে সংগে চারদিক থেকে 'অফার' আসতে থাকে। এই টেবিলে চেয়ে দেখুন—ফাইলের পর ফাইল

জড় হয়ে আছে। এই ব্যাপার থেকে মোটা টাকা আমদানী হয়ে থাকে। এ গেলো এক দফা।

লীলা : দ্বিতীয় দফাটা কি ?

ভীমরুল : প্রথম দফার ব্যাপারটি বেশ জমে উঠতে দ্বিতীয় দফায় হাত বাড়ালাম। দেখলাম, বড় বড় নাম-করা সাহিত্যিকদের অনেকেই বিদেশী লেখকদের বই থেকে প্লট চুরি করে নিজের বইএর ভিত্তি রচেছেন। আমাদের ব্যাপার হলো—সেই সব বই হিন্দী, মারাঠি, গুজরাটি, তামিল, তেলেগু, আসামী, উৎকল প্রভৃতি ভাষায় তরজমা করে চড়া দরে বেচে দেওয়া।

লীলা : লেখকেরা কি আপত্তি করেন না ?

ভীমরুল : কি করে করবেন ? প্রথমতঃ বাঙলা আর ইংরাজী ছাড়া পৃথিবীর আর কোন ভাষার কোন খবরই বাঙ্গালী লেখকেরা বড় একটা রাখেন না। তারপর তাঁদের বিখ্যাত বই অন্য ভাষার মাধ্যমে অন্য নামে সিনেমায় রূপান্বিত হলে, চমকে যান, তর্জন গর্জন করেন—এই পর্যন্ত। যেখানে গোড়ায় গলদ, লড়বেন কিসের জোরে বলুন ? অনেকেরই জানা-শোনা একটা দৃষ্টান্ত বলছি, মিলিয়ে নিন ; নামকরা এক সাহিত্যিকের কোন বই-এর প্লট—মায় ডায়লগ পর্যন্ত নিয়ে ছবি তুললেন এক নামকরা প্রতিষ্ঠান। ফলে, সেই সাহিত্যিকের তরফ থেকে যেই হুঙ্কার উঠল, অমনি ছবিওয়ালা প্রতিষ্ঠানও পাল্টা হুমকি দিলেন—বলুন ঐ সাহিত্যিক, তিনিই কি এ গল্পের স্রষ্টা ? বাস্—আর কথা নেই। পরে জানা গেল, আসলে গল্পটা একখানি ইংরাজী নভেল থেকে না বলে নেওয়া। এখন আমি যদি ঐ গল্পের স্থান ও নামগুলো বদলে অন্যান্য ভাষায় চালাই—অন্যায় হবে ?

লীলা : কথাটা শুনেছিলাম মনে হচ্ছে। আচ্ছা, মানলাম—না হয়, এ সব ব্যাপারে মশায়ের খুব বাহাদুরী আছে। কিন্তু কন্যাপীঠের ব্যাপারে ভীমরুলের শুঁড় দুটো সুড় সুড় করে উঠল কেন ?

এ প্রশ্ন শুনে ভীমরুলের দৃষ্টি আবার প্রখর হয়ে উঠল; মনে মনে কি ভেবে দৃঢ়স্বরে বললেন: শুনবেন? এই দুটো চোখের ওপর অনেক সংসার এই নিষ্ঠুর পণ প্রথার ডাণ্ডায় ভেঙ্গে তছনছ হয়েছে—কত তরুণ মন পুড়ে ছাই হয়ে গেছে…নিজেও বড় কম দাগা পাই নি। তাই আপনাদের সমিতির কাজে লাগবার জন্যে ইচ্ছা করেই কোমর বেঁধেছি। যে কোন একটি কাজের ভার চাপিয়ে পরীক্ষা করে দেখুন।

লীলা দেবীও স্থির হয়ে কিছুক্ষণ ভাবলেন, তারপর আস্তে আস্তে বললেন: আজ আপনার সঙ্গে পরিচয় হলো মাত্র; যদিও আপনি রহস্যময় হয়েই রইলেন, তাহলেও আমি আপনার কথা শুনে আপনাকে বিশ্বাস করেছি: আপনার ওপরে এমন কোন কাজের ভার দিতে চাই, আপনার পক্ষেই যেটা সার্থক করে তোলা সম্ভব হবে। আপনি খবর রাখেন কিনা জানিনা—এই সহরে আমাদের প্রতিষ্ঠানের অনুকরণে আর একটি প্রতিষ্ঠান খোলা হয়েছে; তার পিছনে আছে কতকগুলো মতলব-বাঁধা দুষ্ট লোক।

ভীমরুল এই সময় বললেন: আপনি কন্যাদায়োদ্ধার সমিতির কথা বলছেন ত?

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে লীলাদেবী বলে উঠলেন: তাহলে দেখছি, ও খবরও আপনার অজ্ঞাত নয়। ঐ সমিতি সম্বন্ধে আমি এমন সব খবর পেয়েছি, শুনলে আর স্থির থাকা যায় না। এরা কন্যাদায়োদ্ধারের নামে কন্যাদের সর্বনাশ করছে। আপনি যদি সত্যিই কন্যাপীঠকে সাহায্য করতে চান, এই সাংঘাতিক সমিতিটার মুখোসখানা আগে খুলে দিন।

ভীমরুল বললেন: বেশ, আমি এ ভার নিলাম। কিন্তু এই কথাই আমাদের মধ্যে তাহলে পাকা হয়ে গেল যে, কন্যা-পীঠের

প্রেসিডেণ্ট লীলাদেবীর নির্দেশ মতই আমি কন্যা-দায়োদ্ধার সমিতির পক্ষে বোঝা পড়া করবার ভার নিলাম।

লীলাদেবী জিজ্ঞাসা করলেন: তাহলে আবার কবে আমাদের দেখা সাক্ষাৎ হবে, আর—কোনখানে, কি ভাবে সেটাও বলুন?

ভীমরুল বললেন: এইখানে—এইভাবেই। আসছে সপ্তাহে এই দিন, ঠিক এই সময়। এরই মধ্যে আমি আপনাকে ঐ সমিতি সম্বন্ধে খবর দেব।

যুক্তকরে নমস্কার করে লীলাদেবী বললেন: তাহলে এখন চলি?

ভীমরুল প্রতিনমস্কার করে টেবিলে সংলগ্ন সুইসটি টিপে দিতেই দরজা ঠেলে সেই কালো ছেলেটি এসে দাঁড়াল। ভীমরুল বললেন: এঁকে বাইরে রাস্তায় পৌঁছে দিয়ে এসো।

ছয়

সিমলা স্ট্রীটের মাঝামাঝি স্থানে একটা ছোট গলির সংযোগস্থলে সদানন্দবাবুর বাড়ী। রাস্তার পাশে বদ্ধগলির মধ্যে কনক্রিট দিয়ে শক্ত করে গাঁথা একটু পথ, তার পরেই সদানন্দবাবুর ফটকওয়ালা প্রাচীর-বেষ্টিত বাড়ী। ঐ গলিপথের বিপরীত দিকে একটা চায়ের দোকান ; দরজার উপরে সাইনবোর্ডে লেখা আছে—সিমুলিয়া রেষ্টুরেণ্ট।

কয়েক হাত ব্যবধানে এই পথে দু-খানা রিক্সা চলেছে। গলির সংযোগস্থলে এসে আগের রিক্সাখানা একটু থেমেই পরক্ষণে কনক্রিট বাঁধানো ব্লকের মধ্যে ঢুকল। এই সময় সন্নিহিত কোন দেবালয়ের পেটা ঘড়ি সশব্দে ঘোষণা করল—সময় এখন ছ'টা। পিছনের রিক্সাখানাকেও ঠিক এই স্থানে থামিয়ে শশী তাড়াতাড়ি নেমে পড়ল ; তারপর আস্তে আস্তে চায়ের দোকানে প্রবেশ করে একখানা কেদারা দখল করে বসল।

চায়ের দোকানে সাধারণতঃ এই সময় ভীড় জমে ; অফিস-ফেরতা বাবুদের অনেকেই দোকানে চায়ের পর্ব সেরেই বাড়ী ঢোকেন ; চেনাশোনা লোকের সমাগম হওয়ায় গল্প বেশ জমে ওঠে। শশীর সৌভাগ্যক্রমে এইমাত্র রেষ্টুরেণ্টের সামনে দিয়ে সদানন্দবাবু রিক্সায় বাড়ী ফেরায় তাঁকে নিয়েই আলোচনা চলছিল। শশী সহর্ষে দেহটাকে সোজা করে উৎকর্ণ হয়ে বসল। চায়ের পিয়ালায় চুমুক দিয়ে তখন জনৈক চশমাধারী তরুণ চায়ের টেবিলের ওপারে তার ঠিক সামনে

আর এক তরুণকে লক্ষ্য করে বলছিলেন: ব্যাপার কি রে—জজ-সাহেব যে আজ রিক্সা চড়ে ফিরলেন?

সামনের তরুণটি তখন ঠোঁটে কামড় দিয়েছে, সেই অবস্থায় কিছুটা অস্পষ্টস্বরে জবাব দিল: হয়তো পায়ে চোট লেগেছে, নয়তো বেশী দূরে পাড়ি দিয়েছিলেন—

আর এক ব্যক্তি একটু তফাৎ থেকে কথাটার সমর্থন করে বলল: এমনি কিছু হবে, নৈলে ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে এখান দিয়েই পাঁওদলে যান, আর ঘণ্টাখানেক পরে বেড়িয়ে পাঁওদলেই ফেরেন! সাধ করে কি আমরা ওঁর নাম দিয়েছি—পাঁয়তারাভাঁজা জজ!

লোকটির মন্তব্য শুনে অনেকেই হেসে উঠল। ইতিমধ্যে শশীর সামনে চায়ের পেয়ালা এসে গেছে, টোষ্ট তখনো আসেনি—তৈরী হচ্ছে। কিন্তু ছোকরাদের মুখে এই ধরণের কথা শুনে শশীর বুকের ভিতরটা ঢিপ ঢিপ করে উঠল—সর্বনাশ! যে লোকটি তাদের সমিতিতে গিয়েছিল, সে যার পিছু পিছু রিক্সায় চড়ে সন্ধান নিতে এসেছে, তাহলে ত সে কেউ-কেটা গোছের লোক নয়—একজন জজ! মুখের ভঙ্গি ও মনের ভাবটিকে সামলে নিয়ে শশী জিজ্ঞাসা করল: কার কথা বলছেন স্যার—যিনি এইমাত্র রিক্সায় চেপে ঐ গলির ভিতরে গেলেন? উনি জজ না কি?

প্রথমে যে ছোকরা কথাটা তুলেছিল, সে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে শশীর মুখের পানে চেয়ে বলল: আপনি জানতেন না বুঝি, অথচ ওঁরই পিছনে পিছনে রিক্সায় চেপে এলেন? ঐ যে, জজ সাহেবকে বাড়ীতে নামিয়ে দিয়ে রিক্সা ফিরে চলেছে।

এই সময় ঠুন্ ঠুন্ শব্দের ঝংকার তুলে রিক্সাখানি রেষ্টুরেণ্টের সামনে দিয়ে চলে গেল। শশী এক ঢোঁক চা গিলে বলল: হ্যাঁ, আমিও রিক্সায় এসেছিলুম, কিন্তু তাঁকে জানতুম না তো! এদিকে আজ আমি নতুন এসেছি কিনা! আচ্ছা, উনি কি হাইকোর্টের জজ?

সেই ছোকরাই বলল: হ্যাঁ, তবে পশ্চিমের হাইকোর্ট; তা হলেও লোকটা নামজাদা মশাই—সদানন্দ বাঁড়ুয্যের নাম সবাই জানে, এলাহাবাদ হাইকোর্টে জজিয়তি করতেন, এখন পেনশন নিয়ে নিজের বাড়ীতে এসে বসেছেন।

আর এক ছোকরা বলল: যেমন এজলাসে হরদম বসে থাকতেন, পায়ে বাত ধরে যেত; এখন তেমনি বেড়াচ্ছেন দুটি বেলা—বাত বলে, আমি আছি কোথায়? তাইতো, রিক্সায় চেপে ফিরতে দেখে এত কথা। লোকটা জজ হলে কি হবে, ভারি কিপ্টে মশাই!

আগের ছোকরাটি কিঞ্চিৎ প্রতিবাদের সুরে বলল: তা বলে, নাম করলে হাঁড়ি ফাটে—এমন কথা যেন বলিস নি রে! জানিস, এসেই এ বছর সিমলের দুর্গোৎসব ফণ্ডে মোটা টাকা চাঁদা দিয়েছেন!

হঠাৎ এই সময় মুখখানার বিচিত্র ভঙ্গির সঙ্গে কণ্ঠতালু থেকে একটা সুরের তরঙ্গ তুলে অপেক্ষাকৃত কম বয়সের একটি ছেলে বলে উঠল: ঐ যে বাপকো বেটাবেটি···জজ সাহেবের জোড়া রত্ন!

সেই ডেঁপো ছেলেটার দিকে কটাক্ষ করেই সামনের দিকে সকলেই তাকালেন। শঙ্কর ও রেখা তখন অসঙ্কোচে গল্প করতে করতে বাড়ী ফিরছিল। শশী জিজ্ঞাসা করল: এরা কি ঐ জজ সাহেবের ছেলেমেয়ে মশাই?

একজন বলল: আজ্ঞে হ্যাঁ। জানেন, ছেলেমেয়ে দুটিই রত্ন; ছেলে এম-এ পাশ করে রিসার্চ করে, আর মেয়েটি উইমেন্‌স্ কলেজে বি-এ পড়ছে।

সেই ডেঁপো ছোকরাটি এই সময় বলল: কিন্তু এই পর্যন্তই একসেলেণ্ট স্যার! এর পরেই ইনক্লাব মুর্দাবাদ···জজ-সাহেব এই বয়সে ছাদনাতলায় যাবার জন্যে পা ঘষছেন···সে খবর রাখেন?

খবর শুনে কেউ কেউ চমকে উঠল, কেউ মুখ টিপে হাসল; শশীর বুকের ভিতরটাও তখন উল্লাসে দুলে উঠেছে। তাহলে তার

গোয়েন্দাগিরি তো সার্থক হয়েছে। কিন্তু পরক্ষণে পাল্টা আলোচনার প্রসঙ্গটা তার কানে যেন কাঁটার মত ফুটতে লাগল। ডেঁপো ছেলেটার কথায় আপত্তি করে অপর ছোকরাদের একজন বলল : মিছে কথা, জজ সাহেবের গিন্নী পটল তুললেও, উনি আর এ বয়সে বিয়ে করে লোক হাসাবেন না। আমরা শুনেছি—ছেলে শঙ্করের বিয়ে দেবেন বলেই উনি মেয়ে খুঁজছেন!

ছেলেটা কিন্তু কথাটাকে আমলই দিল না; বলল : আপনারা খালি বাইরেটাই দেখেন স্যার, ভেতরের খবর রাখেন না—সেখানে বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ! জানেন, এক কেলাসের ছোঁচা আছে, যারা ছেলেদের কথা ভুলে যায়—ডাগর-ডোগর মেয়ে দেখলেই ছোঁক ছোঁক করে বেড়ায়, আপনাদের ঐ জজ-সাহেব হচ্ছেন—সেই দলের চাঁই। পরে সব জানতে পারবেন স্যার!

একজন মানী লোকের সম্বন্ধে চায়ের দোকানে বসে এই ধরণের আলোচনা করতে বোধ হয় অন্যান্য তরুণদের শিক্ষিত মন সায় দিল না; তারা আর এই অপ্রীতিকর প্রসঙ্গ নিয়ে কোন কথা বলল না। পাড়ার এই ডেঁপো ছোঁড়াটাকে তারা সকলেই জানত, তার প্রতি এরা কেউই প্রসন্ন ছিল না, দুর্জন জেনে তাকে ভয়ও করত। সত্যই, চৌদ্দ পনেরো বছরের চাপলি নামে এই ছেলেটা সারা পল্লীর যেন বিভীষিকা; তার কাছে লঘু গুরু জ্ঞান নেই, ভালো লোকের পিছনে লাগা যেন তার মজ্জাগত সংস্কার—অনধিকার চর্চায়ও তার বাধে না। অফিস-ফেরতা সমবয়স্ক যে তরুণদল চায়ের টেবিলে বসে এতক্ষণ জজ সাহেবের সম্বন্ধে আলোচনা করছিল, এই প্রসঙ্গের পর তারা সকলেই চলে গেল। দোকানে রইল শুধু শশী ও চাপলি। শশী ভেবেছিল, আলোচনাটি আরো কিছুক্ষণ চলবে এবং এই সূত্রে সে জজ সাহেব সম্পর্কে আরো অনেক তথ্য সংগ্রহ করতে সমর্থ হবে। এভাবে হঠাৎ বন্ধ হওয়ায় শশী একটু ক্ষুণ্ণ হলো। কিন্তু

ওরা সকলে উঠে যেতে মুখে একটা অপরূপ ভঙ্গি করে চাপলি শশীকেই উদ্দেশ করে বলল: শালুক চিনেছেন গোপাল ঠাকুর— যত সব ইয়ের দল মশাই! আসল খবরের ধার দিয়েও যাবে না, আবার খবর না হলে ভাত হজম হবে না—আমার কাছে স্পষ্ট কথা মশাই!

শশী হিসেব করে দেখল, এই ছেলেটা তার ছেলের চেয়েও বয়সে ছোট হবে, অথচ কথাবার্তায় যেন তার ঠাকুরদাদা। এই বয়সের ছেলের মুখে এমন পাকা পাকা কথা এর আগে সে কখনো শোনে নি। এ অবস্থায় ছেলেটিকে হাতে রাখলে তাদের কাজের অনেক সুসার হবে ভেবে শশী তার সঙ্গে আলাপ জমিয়ে ফেলতে সচেষ্ট হলো। খুঁটিয়ে খুটিয়ে জজ সাহেব, তাঁর ছেলে ও মেয়ের সম্বন্ধে অনেক কথাই জেনে নিল। নিজের পকেট থেকে পয়সা খরচ করে চাপলিকে একটা ডবল-কাপ চা ও চারখানা টোষ্ট খাইয়ে চাপলির ঠিকানাটিও নোটবুকে টুকে নিল। চাপলি বলল: আমার আসল ঠিকানা স্যার—এই চায়ের দোকান। দুবেলাই এখানে পাবেন। আসবেন মাঝে, মাঝে—অনেক খবর শুনিয়ে তাক লাগিয়ে দেব, বুঝলেন?

সাত

সন্ধ্যার পর কন্যাদায়োদ্ধার সমিতির অফিসে ফিরে এসে শশী হরিশকে সব কথা শুনিয়ে দিল—সিমুলিয়া রেস্টুরেন্ট বসে সদানন্দবাবুর সম্বন্ধে যে-সব প্রীতি ও অপ্রীতিকর কথা শুনেছিল।

হরিশ চমকে উঠে বলল: য়্যা! লোকটা তাহলে জজ?

শশী বলল: হ্যাঁ, তা বলে ঘাবড়াবার কিছু নেই—এখানকার হাইকোর্টের নয়, পশ্চিমের, তার ওপর পেনসন নিয়েছে—খোলস ছাড়া সাপ, ফণা নেই।

মুখখানা বেঁকিয়ে হরিশ বলল: কিন্তু ওরাই বেশী কামড়ায়; কাজের চাপে তখন বাইরে চাইবার ফুরসদ পেত না; এখন 'দেদার সময়, কোথায় কে অন্যায় করছে, সেই সব ধরার জন্যে ছোঁক ছোঁক করে বেড়ায়! তাইত, আগে জানলে কখনই ও লোককে মেম্বার করতাম না।

শশী উৎসাহ দিল: ভাবছ কেন, বাঘের পেছনে ফেউ ঘোরে—এমনি একটা ফেউ পেয়েছি। সে ওবাড়ীর সব খবর রাখে—ছোকরার চোখ মুখ দিয়ে কথা ত নয় যেন খৈ ফোটে!

বিস্ময়ের সুরে হরিশ বলল: ছোকরা?

শশী জবাব দিল: হ্যাঁ—যেন ধানি লঙ্কা। এত খবরও রাখে, শুনলে তাক লেগে যায়! আর সে ছোকরা বলেওছে—আমাদের এমন সব খবর দেবে যে তাক লেগে যাবে শুনে।

শশী তখন রেষ্টুরেণ্টে বসে সদানন্দবাবুর অনুকূলে ও প্রতিকূলে যে সব কথা শুনেছিল, পর পর হরিশকে শুনিয়ে দিয়ে বলল—এখন

এ থেকে তুমি এনালাইজ করে দেখ কোনটা ঠিক। তবে, আমার মনে হয় যে—এ ব্যাপারে ঐ চাপলি ছেলেটাকে হাতে রাখতে পারলে খুব কাজ দেবে। ও-পাড়ার, শুধু ও-পাড়ার কেন—তামাম কলকাতা সহরের অনেক নামকরা ঘরের কুলুজি ওর যেন নখদর্পণে! আমি বলি কি হরিশ দা, ঐ ছোকরাকে আমাদের দলে ভিড়িয়ে নিতে পারলে অনেক কাজ পাবে!

হরিশ মনে মনে একটু ভেবে বলল: আমি সে ছোকরাকে না দেখে কিছু বলতে পারছি না। জানো ত, মেয়ে নিয়ে আমাদের ব্যাপার, কিন্তু এইসব ছোকরার দলের একটা মস্ত দোষ হচ্ছে—এরা ভারি মেয়েনেঙড়া। যাই হোক, দু'এক দিনের মধ্যেই এই জজ সাহেবকে একটু নেড়ে চেড়ে দেখতে হবে। বেশ তো, তোমার ঐ চাপলি ছেলেটাকেও একদিন আনো এখানে, বেয়ে চেয়ে দেখা যাক। তারপর জজ সাহেবের ভারটা না হয় ওরই ওপরে দেওয়া যাবে।

এমনি সময় সমিতির এক শাঁসালো মক্কেল-গোষ্ঠী কলরব তুলে এসে উপস্থিত। একই আকৃতি ও প্রকৃতি বিশিষ্ট দুটি লোকের সম্বন্ধে সাধারণতঃ 'এক বৃন্তে দুটি ফুল' কথাটার উল্লেখ আছে। সেই সূত্রে হরিশ ও শশী তাদের সমিতির এই তিন মক্কেলকে বড় একটা গাছের তিনটি ডালের সঙ্গে তুলনা করে থাকে। তার কারণ, এদের বয়স, চেহারা, সাজ-গোজ রুচি-প্রকৃতি সবই এক রকমের। নামেও মিল আছে। প্রথম ব্যক্তির নাম হচ্ছে মুটবিহারী গাঙ্গুলী, দ্বিতীয় ব্যক্তি রামহরি মিত্র ও তৃতীয়ের নাম সাতকড়ি সামন্ত। তিনজনেই শিল্পপতি, সেয়ার মার্কেটের ডেলি প্যাসেঞ্জার এবং গৃহ-পরিজন-সংসার সত্ত্বেও রূপসী তরুণীর পাণিপীড়নের নেশায় উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে সমিতির করুণার উমেদার,—এখানকার খাতায় নাম লিখিয়েছেন। একজন ব্রাহ্মণ, একজন কায়স্থ, তৃতীয় জন মাহিষ্য। তিন জনেরই প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা, বিরাট কারবার ও যানবাহনের এলাহি ব্যাপার। বয়স প্রত্যেকেরই ষাটের

সীমা অতিক্রম করেছে যদিও, তথাপি ব্যয়বহুল ভোজ ও রীতিমত তোয়াজ দিয়ে বার্ধক্যকে ঠেকিয়ে রেখেছেন—নকল দাঁত, কলপ দেওয়া চুল ও চটুল সাজ-সজ্জার সাহায্যে। কিন্তু যারা এঁদের বয়সোচিত স্বাভাবিক আকৃতি দেখেছেন, এই কৃত্রিম সজ্জা দেখে তাঁরা চমকে ওঠেন, কলহাস্যে যেন ফেটে পড়েন।

এই দলটির সঙ্গে কারবার-সূত্রে হরিশ ও শশীর বহুদিন আগে থেকেই পরিচয়। তারপর এই সমিতির ব্যাপারে তিন ব্যক্তিই মুরুব্বী স্বরূপ হয়ে প্রচুর উৎসাহ দেন, পৃষ্ঠপোষকতাও করেন। রামহরি ও সাতকড়ি উভয়েই বিপত্নীক, পুত্র কন্যা পৌত্র দৌহিত্রাদিতে তিন বন্ধুরই সংসার পূর্ণ। নুটবিহারীর তৃতীয় পক্ষের পত্নীও বর্তমান, প্রত্যেক পক্ষের সহধর্মিণীও বংশ বর্ধনে যথেষ্ট আনুকূল্য ও সামর্থ প্রকাশ করেছেন; এমন কি, নুটবিহারীবাবুর তৃতীয় পক্ষের সহধর্মিণীও স্বামীকে পর পর যে কয়েকটি পুত্র ও কন্যা উপহার দিয়েছেন তাদেরও সন্তান সন্ততির কলরবে গৃহ তাঁর আনন্দময়! কিন্তু পত্নী আনন্দময়ী অনেক দিন থেকেই রুগ্ন অবস্থায় শয্যাশায়িনী থাকায় নুটবিহারী গোপনে গোপনে চতুর্থপক্ষ গ্রহণের জন্য অস্থির হয়ে উঠেছেন। অপর দুই বন্ধুও পর পর দুইপক্ষকে পরপারে পাঠিয়ে তৃতীয় পক্ষের জন্য কন্যাদায়োদ্ধার সমিতির শরণাপন্ন হয়েছেন—নুটবিহারীর মত তাঁদের কোন পক্ষই অবিশিষ্ট, জীবন্মৃত অবস্থায় ইহজগতে নেই।

নুটবিহারীর যুক্তি হচ্ছে—কর্মঠ ও সম্পন্ন পুরুষমাত্রেরই পত্নী অপরিহার্য। পত্নী যতই গুণশীলা বা সন্তানবতী হোক, রুগ্ন হলে বেকাম ঘোড়ার সামিল। এই জন্যই সাহেবরা অকর্মন্য ঘোড়াকে গুলী করে মেরে নিষ্কৃতি দেয়। স্ত্রী হত্যা নাকি পাপ এবং আইনেও বাধে, তাই রুগ্না পত্নীর পিছনে টাকা ঢেলে তোষণ ও পোষণ করা হয়ে থাকে। কিন্তু সে স্ত্রী স্বামীর কোন কাজেই লাগে না। এ অবস্থায় নূতন পক্ষ গ্রহণ করে মনকে তুষ্ট ও পুষ্ট করাই হচ্ছে সমর্থ ও বিত্ত-

পুরুষের একান্ত কর্তব্য। এ ব্যবস্থার যারা নিন্দা করে, এ কাজকে অন্যায় বলে, দল পাকিয়ে বাধা দিতে চায়, তারাই হচ্ছে সমাজের শত্রু। সরকারের উচিত তদের ক্রিমিন্যাল সাব্যস্ত করে সায়েস্তা করা।

নুটবিহারীবাবু হরিশকে স্পষ্টই বলেছেন—আমাদের সমাজের সেরা মেয়ে তল্লাস করে আমাকে তার পাত্তা দাও, দেখি তাকে আমি ছাঁদনাতলায় দাঁড় করাতে পারি কিনা। সেরা বলতে টাকায় নয়, রূপে। পড়তি ঘরের মেয়ে যদি রূপসী হয়, আমি তাই চাই। আমার যে দুই স্ত্রী গত হয়েছেন, প্রত্যেকেই ছিলেন রূপে রাণীর মত। তৃতীয় পক্ষে যে স্ত্রী রোগ ভোগ করছেন, বয়স হলেও সৌন্দর্যে তিনি কম নন। কাজেই চতুর্থ পক্ষে এমন কনে চাই—রূপে যিনি সবার উপরে টেক্কা দিবেন।

কাজেই পর পর অনেকগুলি পালটি ঘরের মেয়ের ফটো দেখিয়েও নুটবিহারীবাবুকে খুসি করতে না পেরে অবশেষে নিরলার ফটোখানা একদিন তাঁকে দেখানো হয়। তিন বন্ধুই সে দিন সমিতি ভবনে এসেছিলেন নূতনের সন্ধানে। নিরলা মেয়েটির ছবি দেখে তিন জনেই এমনি চমৎকৃত হন যে, কিছুক্ষণ তাঁদের মুখ থেকে কথাই নির্গত হয় নি। নুটবিহারী বাবু একদিক দিয়ে নিশ্চিন্ত ছিলেন যে, তাঁর সহচর দুই বন্ধু ফটো দেখে মুগ্ধ হলেও এই কন্যার প্রতি লুব্ধ হবেন না, কারণ—উভয়েই তাঁরা ব্রাহ্মণেতর, সে হিসাবে কন্যা তাঁদের পূজনীয়া।

এ অবস্থায় নুটবিহারীবাবু উৎসাহিত হয়ে সহর্ষে বলেন যে, কন্যা তাঁর পছন্দ হয়েছে; সুতরাং এই কন্যাকেই তিনি বিবাহ করবেন। কন্যাপক্ষকে এখনি জানানো হোক যে, তাঁদের দায়োদ্ধার করবার লোক পাওয়া গেছে।

দুই বন্ধু রামহরি ও সাতকড়ি নুটবিহারীর পত্নীভাগ্যের প্রশংসা

করে জানান যে, ভাবী বন্ধু পত্নীর ছবি দেখেই তাঁরা চমৎকৃত! তাড়াতাড়ি শুভ সংযোগটা হয়ে যাক। তারপর তাঁদের ভাগ্যও যাতে প্রসন্ন হয় সে দিক দিয়েও তাড়া দিতে ভুলেন না তাঁরা। অবিশ্যি, এমন কথা বলেন নি যে, নুটবিহারীর মত অনিন্দ্য-সুন্দরী কন্যারত্ন তাঁদেরও দাবী—ডাগর-ডোগর, স্বাস্থ্যবতী, সুশ্রী ও সাধারণ সুন্দরী—যাদের বলা হয় উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা—তেমনি দুটি কন্যা—তাঁদের শ্রেণী ও সমাজের পালটি ঘর থেকে পাওয়া গেলেই একসঙ্গে তিনটি শুভ কাজ নির্বাহ হতে পারে।

সে দিন কিন্তু রামহরি ও সাতকড়িকে দেখিয়ে আনন্দ দেবার মত কোন পাত্রীর ফটো পাওয়া যায় নাই। কতকগুলি খবর ছিল, সেগুলি উভয়কে শুনিয়ে ও তাঁদের অভিমত নিয়ে সেই সব পাত্রীর ফটো দাখিল করবার জন্য পত্র লেখা হবে, স্থির হয়ে যায়।

নুটবিহারীর আনন্দ ও উৎসাহ দেখে হরিশ ও শশী বিশেষভাবে উল্লসিত হয়ে ওঠে এবং নুটবিহারীবাবুকে জিজ্ঞাসা করে—কি ভাবে তা'হলে কথাটা পাড়া যাবে কন্যাপক্ষের কাছে?

নুটবিহারীবাবু তখন বলেন—কন্যাপক্ষের অবস্থার কথাটা আগে বলে ফেলে দেখি—কোন কথা না চেপে রেখে সবই ঠিক ঠাক শুনিয়ে দাও। সেই বুঝে আমিও দর দেব।

হরিশ বলল: কন্যার বাপ-মা কেউ নেই—কাকার কাছে মানুষ। কাকার নাম কালিদাস রায় চৌধুরী, শুদ্ধ শ্রোত্রিয়। সওদাগরী আফিসে চাকরি করেন; গোয়াবাগানে নিজেদের বাড়ীতে থাকেন, ঘরটা বনেদি। ছাঁপোষা মানুষ, ভাইঝির মত নিজের মেয়েটিরও বিয়ের বয়স হয়েছে, তবে তার চেয়ে বছরখানেক ছোট। স্ত্রী আছেন, আর আছে একপাল পুষ্যি। গলায় পড়া ভাইঝির বিয়েটা সস্তায় সারতে চান, সেই জন্যেই আমাদের সমিতিতে নাম লিখিয়েছেন।

নুটবিহারী বাবু জিজ্ঞাসা করেন—ভদ্রলোকের নিজের মেয়েটি দেখতে শুনতে কেমন ?

হরিশ জানায়—মাথায় প্রায় সমান সমান ; সব সময় ফিট্ ফাট্ হয়ে থাকে। স্কুলে যায় তাদের গাড়ী করে ; গান শেখে গানের মাষ্টারের কাছে। ভাল বরের হাতে দেবার জন্যে, যোগাড়যন্ত্রও চলেছে। কিন্তু চেহারার দিক দিয়ে ভাইঝির তুলনায় তার পাশেই দাঁড়াতে পারে না। অথচ, ভাইঝিকে সংসারের সব কাজ নিজের হাতে করতে হয়, ওরকম আদর যত্নও পায় না—ইস্কুলে যাওয়াও বন্ধ হয়েছে অনেক আগে। তাহলেও বাড়ীতে খুড়তুতো ভাই বোনদের বই পড়ে ওদের চেয়েও বেশী লেখাপড়া শিখেছে। আর গানের কি গলা, তাও গানের মাষ্টারের গান শুনে শুনে শেখা ; মেয়েটি সত্যই রত্ন। বয়স আঠারো উনিশ, কিন্তু গড়ন এমনি বাড়ন্ত আর ঝাঁপালো যে, আরো বেশী বয়সের মনে হয়।

নুটবিহারীবাবু মনের ব্যাগ্রতা চেপে রেখে বলেন—এমনি একটি রত্নই আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি। এখন এটিকে এনে আমার গলায় যদি ঝুলিয়ে দিতে পার—খরচার ব্যাপারে আটকাবে না। বিয়ের সব খরচপত্র আমিই দেব, আর মেয়েকেও সোনায় মুড়ে নিয়ে আসব ; তোমাদের পাওনা গণ্ডাও যোল আনা পাবে। কথাটা শীগ্‌গীর পাকা করে ফেলো।

এসব হলো প্রথম দিনের কথা—নিরলার ফটো দেখে এবং তার বয়সের সঙ্গে নানা গুণের কথা শুনে যে দিন নুটবিহারীবাবু এই ভাবে তাঁর মনের কথা বলেছিলেন। হরিশও সেই দিনই কালিদাস-বাবুর বাড়ীতে গিয়ে নুটবিহারীবাবুকে দায়োদ্ধারের যোগ্য পাত্র জানিয়ে বলেন—শুভস্য শীঘ্রম্, দেরী না করে তাড়াতাড়ি কাজটা সেরে ফেলুন।

কালিদাসবাবুও খেলোয়াড় লোক ; মনে মনে খুসি হলেও মুখে

অরাজির ভাব ফুটিয়ে জানান—আরে, রামঃ! অমন রূপসী মেয়েকে ওরকম বুড়োর হাতে তুলে দেব! লোকে দুষবে—কাজটা কি ভাল হবে বলতে চান?

হরিশ মনে মনে হাসে; ভাবে—তুমি যে জলের মাছ, আমি সেখানকার বক! আরো কিছু বাগাবার মতলব বই তো নয়! প্রকাশ্যে বলে—ওকে বুড়ো বলে মশাই? এখনো সোজা হয়ে চলেন—অঙ্গ দিয়ে লক্ষ্মী শ্রী ঝর ঝর করে ঝড়ে পড়ে, লোকে চেয়ে থাকে। তারপর—এক ডাকে চেনবার মত নাম; সেয়ার মার্কেটের রাজা, কত বড় অফিস আর কারবার! জানেন, মেয়ের ফটো দেখে পছন্দ হয়েছে বলেই রাজি হয়েছেন। নিজের মুখেই বলেছেন—বিয়ের বাবদে দেখাশোনার খরচপত্র থেকে স্থুরু করে আভ্যুদায়িক কাজকর্ম, আত্মীয়-কুটুম্ব আনা, রাখা, পাঠান, খাই দাই, গায়ে হলুদ, বিয়ের রাতের ভোজ, বাসি বিয়ে—সব খরচ খরচাই তিনি বহন করবেন, সম্প্রদানের আগেই মেয়েকে সোনায় মুড়ে দেবেন। ঘর থেকে একটি পয়সাও আপনার লাগবে না, উলটে বরং ঘরে কিছু সেঁধুবে। এখন বুঝে দেখুন।

কালিদাসবাবু তথাপি তখনি কথাটার সাফ জবাব দেন নাই—মুখখানা গম্ভীর করে বলেছিলেন যে, তাঁকে ভেবে দেখতে হবে। কেননা, এদিকেও এক জায়গা থেকে কথা এসেছে—গৃহস্থ-ঘর অবিশ্যি, কিন্তু ছেলে যেন সোনার চাঁদ—ভাল চাকরী করে; মেয়ে দেখে তারা খাঁইও কমিয়েছে—সামান্য কিছু গয়না দিয়ে সাজিয়ে দিলেই বিনা-পণে কাজ করতে রাজি। অবিশ্যি, কথা আমি দিই নি। তাই ভাবছি, না হয় কিছু খরচই হলো, কিন্তু তেজবরে বুড়ো বরের চেয়েও ঢের ভালো। সেই জন্যই ভেবে দেখতে চাই—কথা বুঝছেন?

কালিদাসবাবুর কথার ভঙ্গিতেই হরিশ তাঁর মনের ভাব বুঝেছিল; আসলে, কালিদাসবাবুর বর্ণিত কথাটা তাঁর কপোল-কল্পিত। হরিশ

এ থেকে এই সার তথ্য জেনে গেল যে, 'উড়ো খই গোবিন্দায় নমঃ' এখানে চলবে না—খইয়ের ধামায় তার পরিমাণটি দেখে তবে কালিদাস রায় কথাটা পাকা করতে চান।

এর পরবর্তী কথাবার্তায় সেইটিই পরিষ্কার হয়ে যায়। মুটবিহারী-বাবুর ফর্দ হরিশ রায় মশাইকে পড়ে শুনিয়ে দেয়—হাজার টাকা কালিদাসবাবুকে আগাম দেবেন। পাকা দেখা ও বিয়ের দিন স্থির হলেই কনের কাকীমাকে একখানি বেনারসী শাড়ী আর পাঁচ ভরির গিনি সোনার চুড়ি দিয়ে প্রণাম করবেন। কনের কথা আলাদা, বিয়ের আগেই তিনি তাকে সাজিয়ে দিয়ে যাবেন।

কালিদাসবাবু এমনি একটা বাঁধা-ধরা নির্ধারিত ব্যবস্থার মধ্যেই ও পক্ষকে আনতে চাইছিলেন। প্রস্তাবটির প্রভাব তাঁর মনের উপর পড়লেও, মুখে কিন্তু আনন্দের তেমন আভাস পাওয়া যায় নি সেদিনও। তিনি জেনেছিলেন, মাছ টোপ গিলেছে, বড়শী তার গলাতে বিঁধেছে, এখন খানিকটা খেলাতে ক্ষতি কি! সুতরাং 'না গ্রহণ না বর্জন' নীতি অনুসারে মুটবিহারীবাবুর অফারটি তাঁর মনের ফাইলে রেখে, সেই থেকে তিনি কথাবার্তা চালিয়ে চলেছেন!

হরিশ ভাবে, তার চাল কি সত্যই ব্যর্থ হয়ে গেল? মনে মনে সেও ঘাবড়ে যায়! সেইজন্য নিরলা মেয়েটির প্রসঙ্গ মুটবিহারীবাবুর জন্য রিজার্ভ না রেখে, অন্য চাহিদা এলেও উত্থাপন করে থাকে। যেমন—সদানন্দবাবুর চাহিদায় নিরলার ফটোখানি তাঁকে দেখাতে হয়েছিল। এদিকে মুটবিহারীবাবুও অধৈর্য হয়ে পড়েছেন—প্রায়ই চিঠি লিখে খবর নেন, তাগিদ দেন, মাঝে মাঝে নিজেও এসে উপস্থিত হন। সেই উদ্দেশ্যেই এদিন সমিতি-ভবনে সবান্ধব তাঁর শুভাগমন হয়েছে।

ওদিকে কালিদাসবাবুর বাড়ীতেও কথাটা জানাজানি হয়ে গেছে। কন্যা শিবানী আড়াল থেকে হরিশের প্রস্তাব শুনেছিল। সে অমনি

আহ্লাদে ফেটে পড়বার মত হয়ে নিরলাকে ডেকে বলে—শুনেছিস্ নিরদি, তোর যে পাথরে পাঁচ কিল! শিবের মত বর ঠিক হয়ে গেছে; তা ভাই বয়েসটাই কেবল শিবের মত, এদিকে ঢুঢু নয়—তোকে সোনা দিয়ে মুড়ে নিয়ে যাবে, বিয়ের খরচপত্র নিজে থেকেই দেবে। কথা পাকা, আমি শুনে এলুম যে!

নিরলাও এর আগে এ সম্বন্ধে একটু আভাস পেয়েছিল। প্রথম দিন এসে হরিশ যখন কথা পাড়ে, সেই সূত্রে গৃহিণী সারদামণি জিজ্ঞাসা করেছিলেন—কোথা থেকে সম্বন্ধ এনেছে এ মিনসে?··· কালিদাসবাবু বলেন—নুটু গাঙ্গুলীর নাম শোননি, খুব বড় লোক—ভারি কারবারী। কন্যাদায়োদ্ধার সমিতিতে গিয়ে নিরর ফটো দিয়ে এসেছিলুম, দেখে পছন্দ হয়েছে।······গৃহিণী জিজ্ঞাসা করেন—কি দিতে-থুতে হবে?······কর্তা বলেন—দিতে-থুতেই যদি হবে, তবে দায়োদ্ধার সমিতিকে দায় জানাতে যাই! ওরা নিজেরাই পাত্র যোগাড় করে দিয়ে কন্যাদায় উদ্ধার করে দেয়—বিয়ের খরচপত্র সব পাত্রপক্ষই বহন করে।···বিস্ময়ের সুরে গৃহিণী বলেন—ওমা এ যে নূতন কথা শুনি গা! পাত্রপক্ষ নাকি আবার টাকা না নিয়ে ঘর থেকে টাকা দিয়ে বিয়ে করে!······কালিদাসবাবু বলেন—হাতে যদি পয়সা থাকে, আর বয়স অনেকটা গড়িয়ে পড়ে, তাহলে ঘরের পয়সা দিয়েই মেয়ে নিয়ে যায়, বুঝলে? তবে মেয়েরও বয়স হওয়া চাই, চোখে লাগবার মত চেহারা চাই। নিরর ত ওসবে কমতি নেই, তাই না দশ টাকা খরচ করে ওখানে নাম লিখিয়েছিলুম—এখন বরাত!······গৃহিণী তখন মন্তব্য করেন—এখন বুঝিছি। ওরাও বুড়ো বর যোগাড় করে তাদের ঘাড় ভেঙে দায় উদ্ধার করে দেয়। আজকাল সহরে এতও হচ্ছে!

পাশের ঘরে বসে হাতের কাজ করতে করতে নিরলা কাকা-কাকীর কথাগুলি সেদিন সবই শুনেছিল। সে নিয়মিতভাবে

রোজকার খবরের কাগজখানা আগাগোড়া পড়ে, দেশের অনেক খবরও রাখে। কন্যাপীঠের উদ্দেশ্য ও তাদের সংস্থার কথা জানা আছে। কন্যাদায়োদ্ধার সমিতির খবরও সেদিন পড়েছে। ফলে ঘৃণায় ও রাগে তার পা থেকে মাথার চুলের ডগা পর্যন্ত নিস্‌পিস্‌ করে উঠে। সেই দিনই সে কন্যাপীঠের প্রেসিডেন্টের নামে এক পত্র লিখে ডাকে পাঠিয়ে দেয়। সেই পত্র কন্যাপীঠের সভায় পড়া হয় এবং রীতিমত চাঞ্চল্য জাগে। এদিকে শিবানীর মুখে খবরটা শুনে নিরলা মুখখানা বিকৃত করেই বলেছিল—একটা কথা আছে মনে রাখিস্‌ শিবি—ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে। এ দুর্ভোগ সত্যি যদি আসে, আর এমনি করেই কাকাবাবুর মাথা বিগড়ে যায়, তুইও এরপর পার পাবিনি জানিস্‌।

কথাটা শুনে শিবানী খানিকক্ষণ গুম হয়ে থাকে, তারপর মার কাছে গিয়ে নিরর কথাটা শুনিয়ে দেয়। মা ঝাঁঝিয়ে বলেন—তুই হতচ্ছাড়ি আড়াল থেকে কথা শুনে ওকে লাগাতে গেছলি কেন? সাপের সাত পা দেখেছ বটে! আসুন উনি।

ওদিকে সেই প্রস্তাব পাঠাবার পর কথাবার্তা পাকা করবার জন্যে লুটবিহারীবাবু প্রত্যহই তাড়া দিতে থাকেন। এক একদিন সশরীরে হাজিরও হন—ব্যাপারটার কি নিষ্পত্তি হলো সেটা জানবার জন্যে। কিন্তু যেদিনই আফিসে আসেন. এ-কথা সে-কথার পর হবু পাত্রীটির ফটোখানা দেখাবার জন্যে হরিশকে অনুরোধ করেন; পাছে হরিশ কিছু মনে করে বা বেজার হয়, সেজন্য সঙ্গে সঙ্গেই দশ টাকার একখানা নোট দাখিল করে বলেন—দেখ হে, কারবারী মানুষ আমি, অন্যায় অনুরোধ করি না, দেখবার আগেই দর্শনি ধরে দিচ্ছি; আর বলে রাখছি—যেদিনই এখানে এসে ফটো দেখতে চাইব, সেই সঙ্গে দশ টাকার একখানা নোটও বার করে দেব। এটা হচ্ছে দস্তুর। ত'ছাড়া, এমনি কোন না কোন অছিলা করে মাঝে মাঝে কিছু না দিলে, আফিস তোমাদের চলবেই বা কি করে!

হরিশ প্রথম প্রথম মৌখিক আপত্তি করেছিল : না, না ওসব কেন, বেশ ত—ফটো দেখাচ্ছি, দেখুন না—তাতে কি হয়েছে—

কিন্তু নুটবিহারীবাবু তার সে আপত্তিতে কান দেন নি, তাঁর যুক্তিও অকাট্য, শেষ পর্যন্ত হরিশকে হাত পেতে নোটখানা নিতে হয়।

এদিনও দু'চারটে কথার পর নুটুবাবু ফটোখানা দেখবার জন্যে ইশারা করেই সেই সঙ্গে দশ টাকার নোটখানা পাকিয়ে হরিশের কোলের উপর নিক্ষেপ করলেন।

নিবিষ্টমনে ভাববিহ্বল দৃষ্টিতে নুটবিহারীবাবু নিরলার ফটো দেখছেন, এমন সময় হরিশ বলল : মুস্কিল হয়েছে স্যার, এক জজসাহেব এসে ভারি বখেড়া বাধিয়েছেন—ঐ ফটো দেখে তিনি একবারে মাত! বলে গেছেন—এ মেয়েকে তিনি নেবেনই—

নুটবিহারীবাবু এতই গভীরভাবে ছবিতে মন নিবিষ্ট করেছিলেন যে, হরিশের কথার প্রথমাংশ তাঁর শ্রুতিস্পর্শই করেনি। ফটোর কথাটা কানে বাজতেই সোজা হয়ে বসে মুখখানা কঠিন করে বললেন : এই ফটো কাউকে দেখিয়েছিলে নাকি? তোমরা ত দেখছি—ভয়ঙ্কর লোক, কেন দেখালে? জান—কত বড় অন্যায় করেছ?

হরিশ মানুষ চেনে, সেভাবে ব্যবহার করতে জানে। তর্জনটা গায়ে মেখেই বলল : কি করি বলুন, হাইকোর্টের জজ নিজে এসেছিল; তারপর কোন ছবি দেখে পছন্দ না হ'তে শেষকালে ওখানা—ছবিগুলো ঘাঁটতে ঘাঁটতে বেরিয়ে পড়ে, উনিও নিয়ে বলেন, দেখি! তখন ত আর না বলতে পারিনে স্যার।

মনে মনে দারুণ ঈর্ষায় জ্বলে উঠবার মত হয়ে নুটবিহারীবাবু জিজ্ঞাসা করলেন : তারপর ফয়সলা কি হলো? দর হাঁকলে ত? বললে না কেন, কথাবার্তা পাকা হয়ে গেছে?

হরিশ সবিনয়ে বলল : আজ্ঞে, আমাকে কি আর সে কথা

শিখিয়ে দিতে হয়—বলেছিলাম বৈকি, সহরের মস্ত এক নামী মার্চেন্ট ঐ মেয়েকে পছন্দ করে গেছেন—তাঁর দেদার পয়সা। শুনে, জজ-সাহেব বললেন—আমারও যখন পছন্দ হয়েছে, পয়সার জন্যে আমি কি পিছুব বলতে চান? কত খরচ করতে হবে জেনে আমাকে লিখবেন; টাকার জন্য অটকাবে না। এই এখন অবস্থা দাঁড়িয়েছে হুজুর! বলুন কি করি? আর কিছু নয়, লোকটা জজ কিনা, তাই—

মুটবিহারীবাবু হুঙ্কার দিয়ে ওঠেন: রেখে দাও তোমার জজ, কত সে কামায় মাসে শুনি? চার হাজার, কি পাঁচ হাজার···এর বেশী ত নয়! জানো, লড়ায়ের দৌলতে এক একটা চালানে দশবারো হাজার পিটেছি—এমন চালান গেছে হপ্তায় গড়ে ডজনের কম নয়। সে নাকি আমার কাছে পয়সার বড়াই করে? যাক্, এখন কথা শোন—আর ছেঁদো কথায় ভুলছিনে, আজই গিয়ে মেয়ের কাকার সঙ্গে দেখা করে সব ঠিকঠাক করে ফেল। যে কথা হয়েছে, এর ওপরে তাঁর ট্যাঁকে যদি আরো দু'পাঁচশো গুঁজে দিতে হয়, পেছুব না—বুঝলে?

হরিশ এই কথাটি শুনবার প্রত্যাশায় কথাটা তুলেছিল। উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতেই মুখখানা প্রফুল্ল করে বলল: এর ওপর আর কথা কি! আজই আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করে সব বলব, আর চাক্ষুস দেখা শোনার একটা দিন স্থির করে কথাটা যাতে পাকা হয়ে যায়, সে কথাও পাড়ব।

প্রস্তাবটা শুনেই সবান্ধব মুটবিহারীবাবু উৎফুল্ল হলেন। মুটবিহারীবাবুর বন্ধু রামহরিবাবু বললেন: সত্যিই হে, অনেক দিন ধরে কথাটা চলছে, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে মুটু ঐ মেয়েকে স্বপ্নে দেখে, বিরহ আর সহ্য হচ্ছে না; এখন তাড়াতাড়ি দু'হাত মেলাবার ব্যবস্থা কর হে হরিশ ভায়া!

সাতকড়িবাবু বললেন: খালি খালি ফটো দেখে কি আর আশা

মেটে হে ! শীগ্‌গির একটা দিনস্থির করে মেয়ে দেখার ব্যবস্থা করে ফেল। আমরাও দেখতে যাব।

শশী এতক্ষণ চুপ করে বসেই এদের কথাবার্তা শুনছিল। সুযোগ পেয়ে এই সময় হাসতে হাসতে বলল : বিয়ের দিন আপনাদের দুই বন্ধুকে কিন্তু নিতবর সাজতে হবে স্যার ! নৈলে আসর বেমানান হবে।

দুই বন্ধু হেসে উঠলেন। নুটবিহারী বললেন : তোমার এ্যাসিষ্ট্যাণ্টও বেশ রসিক লোক দেখছি ! কথাটা বলেছে মন্দ নয়। যাক, এখন কথা মত কাজটা যাতে শীগ্‌গির হয়ে যায়, সেই চেষ্টাই কর।

আট

বেলা তখন বারোটা—হেদুয়া-অঞ্চলে লোক-চলাচল অনেকটা কমে এসেছে। এই সময় একখানা রিক্সা আরোহীর নির্দেশ মত কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের ট্রাম-রাস্তা থেকে হেদোর পাশ দিয়ে বিডন ষ্ট্রীটে ঢুকল; তারপর খানিকটা গিয়েই বাম দিকে মোড় নিয়ে গোয়াবাগান লেন ধরে এগিয়ে চলল। মিনিট কয়েক পরে একটা বাঁক পার হতেই রিক্সার আরোহী চাপা গলায় হাঁকল: রোখো এখানে।

ঘ্যাঁচ করে একটা শব্দ তুলে রিক্সা থামতেই পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশ বছর বয়সের এক পোষ্টাল পিওন তাড়াতাড়ি রিক্সা থেকে নেমে ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে সামনের দিকে হন্ হন্ করে খানিকটা এগিয়ে চলল। ডাকঘরের পিওনদের মতই তার পরণে খাঁকির ময়লা ঢিলে ইজের, গায়ের জামাটাও ঐ রংঙের—কোমরের দিকে বগলশ আঁটা। মাথায় পাগড়ী, চোখে নীল চশমা; কাঁধে চামড়ার একটা পুরানো ব্যাগ ঝুলছে, বামহাতখানা বেঁকিয়ে ব্র্যাকেটের মত করে কাগজ-পত্রের একটা পুলিন্দা নিয়েছে—তার মধ্যে এক রাশ চিঠি।

গলির এমন একটা জায়গায় এসে পিওনটি থমকে দাঁড়াল—যেখানে ফুটপাথের গায়ের দোকানগুলির দরজা এইমাত্র বন্ধ করে দোকানীরা স্নানাহারের উদ্দেশ্যে নিত্যকার অভ্যাস মতে চলে গেছে। এখন থেকে তিনটে পর্যন্ত এখানটা একটু নিঝুম হয়েই থাকে। এদিকে ফুটপাথের শেষ দোকানটির পরেই একটা ঘুঁজি। দেখলে মনে হয় যে, এখান থেকে বুঝি আর একটা গলি বেরিয়েছে। কিন্তু তা নয়;

এই ঘুঁজিটুকুর মধ্যেই একখানা বাড়ী, গলিটির নামেই তার নম্বর। ঘুঁজি রাস্তাটুকুর একদিকে ফুটপাথের গায়ের শেষ দোকানখানির দেওয়াল, অন্যদিকে একফালি সরু রক; তারই মাঝখানে এই ঘুঁজির বাড়ীখানির দরজা। রকের ছু'দিকেই একটু উঁচুতে জানালা দেখে জানা যায়, দরজার ছু'পাশে ছুখানি ঘর বিদ্যমান—সম্ভবতঃ বাহিরের ঘর বা বৈঠকখানাই হবে। দরজার সামনের পথটুকু সান বাঁধানো এবং নিরিবিলি। বাড়ীখানির মালিক হচ্ছেন কালীদাস রায় চৌধুরী; শ্রীমতী নিরলা দেবী এঁরই ভ্রাতুষ্পুত্রী।

পিওনটি রাস্তার ফুটপাথ থেকে নেমে এই গলির মধ্যে ঢুকেই রুদ্ধ দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। এরপর কি ভেবে ছুই দরজার জোড়ের মুখে ডান কানটি রেখে বোধ হয় জানবার চেষ্টা করল—বাড়ীর লোকজন কাজ-কর্মের জন্য জেগে আছে, কিম্বা উপর তলায় গিয়ে ঘুমাচ্ছে। প্রায় ছু'মিনিট সেইভাবে থেকে সম্ভবতঃ নীচেই সাড়া-শব্দ শুনে সে দরজার কড়া ছুটো নেড়ে দিল। ভিতর থেকে তৎক্ষণাৎ ভারী গলায় নারী-কণ্ঠের স্বর শোনা গেল : কে?

পিওনও সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল; ডাকপিওন—চিঠি।

আগের কণ্ঠেই ভিতর থেকে নির্দেশ এল : খেতে বসেছি—দরজার ফাঁক দিয়ে গলিয়ে ফেলে যাও।

পিওন এবার আগের চেয়ে জোর গলায় জানালো : এক্সপ্রেস্ ডেলিভারী চিঠি, চিঠির মালিক শ্রীমতী নিরলা দেবী। সই দিয়ে তবে চিঠি নিতে হবে।…বন্ধ দরজার মাঝখানের জোড়ের উপর মুখখানা রেখে কথাগুলি বলেই পরক্ষণে সেই জায়গায় কানটি পেতে ভিতরের কথাগুলিও পিওন শুনে নিল। আগের সেই নারীই বেশ বেজার হয়ে চিঠির মালিককে উদ্দেশ করে বললেন : 'আ মরণ! উকিলের চিঠিই ত সই দিয়ে নেয় শুনিছি। হিস্ ফিস্ চিঠি আবার কি র‍্যা নির?' এর উত্তরও পিওন শুনতে পেল। অত্যন্ত কোমল কণ্ঠের

সুমি স্বর পিয়নের কানে যেন মধু বর্ষণ করল। তার মনে হলো, সম্ভবতঃ চিঠির মালিক নিরলা দেবীই আগের মহিলাটিকে বুঝিয়ে বললেন—'হিস্ ফিস্ নয় কাকিমা, পিওন বলছে—এক্সপ্রেস ডেলিভারী চিঠি। অজকাল নিয়ম হয়েছে, দু আনার খামের উপর আরো দু আনার টিকিট দিলে চিঠি খুব শীগ্‌গির পৌঁছয়,—মালিককে সে চিঠি রেজিষ্টারী চিঠির মত সই করে নিতে হয়।' জবাব শুনে আগের মহিলাটি আরও বেশী বেজার হয়ে বললেন,—'তা এত গরজ হলো কার রে, যে দু আনা বেশী খরচায় তোকে চিঠি পাঠায়?'

মেয়েটি এবার মিঠে-কড়া সুরে উত্তর করল—'আমি কি করে বলব—আমার নামে চিঠি কখনো এসেছে?'

আগের মহিলাটি এ-কথা শুনে বললেন—'তোর ত খাওয়া হয়ে গেছে নির, ওঠ—তাড়াতাড়ি আঁচিয়ে চিটিখানা নিয়ে ছাখ্ কে পাঠিয়েছে।'

পিওন বুঝল যে, নিরলাদেবী এখনি চিঠি নিতে আসবেন। সে তৎক্ষণাৎ দরজার কাছ থেকে সরে এসে এক টুকরো কাগজে পেনসিল দিয়ে কয়েক ছত্র কি লিখতে লাগল। তার লেখাও শেষ হয়েছে, এমনি সময় দরজার খিল খোলবার শব্দ হলো। সেই সঙ্গে পিওনও প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ালো এবং তার মনের সমস্ত আগ্রহ ও কৌতূহল এক সঙ্গে দুটো চোখের মধ্যে এসে জড় হলো। দরজা খুলতেই নিরলা মেয়েটির অপরূপ মুখ ও চোখের দৃষ্টির সঙ্গে দরজার সামনে দণ্ডায়মান বর্ষীয়ান পত্রবাহকটির দৃষ্টিও বুঝি তারুণ্যের প্রখর শক্তিতে চশমার ভিতর দিয়ে বেরিয়ে মিশে গেল। পরক্ষণে মেয়েটি চোখ দুটি নত করতেই পিওন হাত বাড়িয়ে সেই লেখা চিরকুটখানি তার সামনে তুলে ধরল। মেয়েটি চোখ দুটি বিস্ফারিত করে পড়ল:

"আমি ডাকঘরের পিওন নই—পিয়ন সেজে কন্যাপীঠ থেকে সে দিনের চিঠির জবাব এনেছি। আপনার কাকিমাকে বলবেন, চিঠি

নয়, বইওলারা ক্যাটালগ পাঠিয়েছে। সেটাও আমি তৈরী করে এনেছি।'

লেখাটা পড়ে নিরলা পিওনের দিকে তাকাতেই সে মোড়ক বাঁধা একটা ক্ষুদ্র প্যাকেট, সেই সঙ্গে খামেভরা একখানা চিঠি নিরলার হাতে দিয়ে চাপা গলায় বলল,ঃ চিঠিখানা লুকিয়ে রেখে ক্যাটালগখানা দেখাবেন। আর এ চিঠির জবাব লিখে রাখবেন, পরশু দিন ঠিক এই সময় এসে নিয়ে যাব।

নিরলা বলল ঃ তাহলে আর একটু দেরী করে এসো—দেড়টার পর! কাকিমা তখন ওপরে গিয়ে ঘুমান, আর আমি একাটি পাশের ঘরে লেখা পড়া করি। রাস্তার দিকের জানালা আমি খুলে রাখব।

ঘাড় নেড়ে পিওন বলল ঃ বেশ, আমি দেড়টার পরেই আসব। আমি ওখানকার সব খবর রাখি ; আপনার চিঠিও পড়েছি। আপনি ভাববেন না—আমরা আপনার পেছনে আছি। পাছে কেউ সন্দেহ করেন, সেইজন্য ডাকঘরের পিওন সেজে আমাকে আসতে হয়েছে। আচ্ছা নমস্কার।

বলেই পিওন বেরিয়ে গেল ; নিরলাও সশব্দে দরজা বন্ধ করে চিঠিখানা ব্লাউজের মধ্যে ফেলে ক্যাটালগের মোড়কটা ছিঁড়তে ছিঁড়তে ভিতরে গেল। কাকিমা সারদামণি তখন কোলের ছেলে-মেয়েগুলোকে নিয়ে কলতলায় হাত-মুখ ধুচ্ছিলেন সশব্দে।

ওদিকে পিওনের দু-পায়ের গতিবেগ, আর মনের একটা তরল উৎফুল্ল ভাব যদি কোন বিচক্ষণ ব্যক্তি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লক্ষ্য করতেন, তা হলে তাঁর মনে এই প্রশ্নটাই সন্দেহের সৃষ্টি করত যে, এই বয়সের কোন বর্ষীয়ান পুরুষের পক্ষে ঐ ভাবে পথ চলা স্বাভাবিক কিনা!

বিডন ষ্ট্রীটে এসেই পিওন একখানা খালি রিক্সা থামিয়ে চেপে বসল ; বলল ঃ সিমলে ষ্ট্রীটে চলো।

খানিক পরে পিওনকে নিয়ে তার নির্দেশমত রিক্সাওয়ালা সদানন্দ-

বাবুর বাড়ীর সামনের রাস্তা দিয়ে দেউড়ির মুখে এসে রিক্সা থামল। পিওন রিক্সা থেকে নেমে ভাড়া চুকিয়ে তাকে বিদায় করে দিল। সাধারণতঃ এসময় ফটকে কেউ বসে না ব'লে—ভিতর থেকে বন্ধ থাকে। পিওনের সেটা অজানা নয় এবং নীচের তলায় লাইব্রেরী ঘরে সদানন্দ বাবুর কন্যা রেখা যে একাই নিবিষ্টমনে কেতাবের মধ্যে ডুবে থাকে, এ খবরটুকুরও সন্ধান সে রাখে। তাই দেউড়ীর গায়ে লাগানো বিজলির বোতামটি না টিপে, একটু ঘুরে লাইব্রেরীর খোলা জানালাটির কাছে দাঁড়িয়ে চাপা-গলায় হাঁকলো : চিঠ্‌ঠি হ্যায়।

শব্দটা রেখার কানে বাজতেই সে উঠে দাঁড়াল। সম্ভবতঃ জানালার ফাঁক দিয়ে ডাক-পিওনের চেহারাখানাও তার নজরে পড়েছিল। পিওন এমন অসময়ে এলেও বৈদ্যুতিক বোতাম টিপে তার আগমনবার্তা জানাবার কথা। হয়ত নূতন এসেছে ভেবে রেখা নিজেই চিঠি নেবার জন্য ফটকের দরজা খুলে দিল। এ কাজের জন্য যে লোকের এখানে মোতায়েন থাকবার কথা—এসময় তাকে উপরে গিয়ে সদানন্দ বাবুর অঙ্গ সেবা করতে হয়। তিনি ঘুমিয়ে পড়লেই তার ছুটি, আর প্রভুর চোখের ঘুমের ছোঁয়াছে তখন সেবকের চোখের পাতাগুলিও জড়িয়ে আসে। অগত্যা সিঁড়ির ঘুলঘুলির মধ্যে নিরাল স্থানটিতে দেহটি ছড়িয়ে দিয়ে সে বেচারাও অভ্যস্ত দিবানিদ্রার পাটটি সেরে নেয়। রেখা মেয়েটির স্বভাবটুকু ভারি নরম, সে এজন্য বৃদ্ধ বিশ্বস্ত ভৃত্য বেচারীকে আর ত্যক্ত করে না, এমন কি—বাইরে থেকে এ সময় ক্বচিৎ কোনদিন আহ্বান এলেও তাকে ব্যস্ত না করে নিজেই পড়া ছেড়ে উঠে দরজা খুলে দেয়। রেখাদের কলেজের ক্লাস ইদানিং সকালের দিকে বসে বলেই এসময় তাকে বাড়ীতে দেখা যায়। এ সব খবরও পিওন ভালো ভাবেই জানে এবং জানে বলেই আজ সে এমন এক দুঃসাহসিক কাণ্ড করে বসল যে, রেখার-মত শিক্ষিতা এবং আধুনিকা মেয়ের মুখের কথাও স্তব্ধ হয়ে গেল।

যেই এগিয়ে এসে রেখা ফটকের বড় বড় পাল্লা দুটি খুলেছে, অমনি পিওন ঝাঁ করে ভিতরে সেঁধিয়ে নিজেই ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়ে সোজা হন হন করে লাইব্রেরীর ভিতরে গিয়ে ঢুকল। অমনি রেখার চোখ দুটোও বড় হয়ে উঠল—পল্লব থেমে গেল ; ডাক ঘরের একটা পিওনের এ কি দুঃসাহস আর স্পর্ধা ! লোকটা পাগল নাকি ! অন্য কোন মেয়ে হলে হয়ত চেঁচিয়ে উঠত, কিন্তু রেখা সে চেষ্টা না ক'রে মনে সাহস এনে ধীরে ধীরে লাইব্রেরীর দরজার সামনে গিয়ে দেহটাকে টান করে সোজা হয়ে দাঁড়াল। পিওনটাও এই সময় সবেগে ঘুরে রেখার মুখোমুখী হোয়েই হিঃ হিঃ হিঃ করে হেসে উঠল। এ হাসিতো রেখার অপরিচিত নয়, তার চোখ দুটো বড় হয়ে উঠলো, পিওনও সঙ্গে সঙ্গে খপ করে মাথার পাগড়ী এবং কানের সঙ্গে তার দিয়ে আটকানো নকল কাঁচা-পাকা দাড়ি-গোঁফটা খুলে ফেলতেই রেখার চোখে মুখে তরল হাসি ফুটে উঠল ; হাসিমুখে সে বলল : হাসি থেকেই ব্যাপারটা বুঝতে পারি। কিন্তু এ কী কাণ্ড তোমার দাদা ?

পরণের উর্দীগুলো খুলতে খুলতে শঙ্কর বলতে লাগল : কেমন সেজেছিলুম বল, তুইও ভড়কে গিয়েছিলি। সেই নিরলা মেয়েটির বাড়ীতে এই সজ্জায় প্রথম য়্যাডভেঞ্চারে বেরিয়েছিলুম—সেখান থেকেই ফিরছি।

কি সর্বনাশ ! পিওন সেজে আলাপ করতে গিয়েছিলে নিরলা দেবীর সঙ্গে ?

হ্যাঁ, সহজে দেখা পাবার এর চেয়ে কোন ভালো আইডিয়া মাথায় আসে নি। ছাত্র-সমিতির বার্ষিক উৎসবে পোষ্ট্যাল পিওনের রূপ-সজ্জা প্রতিযোগিতায় আমি মেডেল পেয়েছিলুম। সমিতিতে সাজ পোষাকগুলো ছিল, এই ব্যাপারে কাজে লাগিয়ে দিলুম।

কি-ভাবে পিওন সেজে কাজটি বাগিয়ে এলো কন্যাপীঠের তরফ

থেকে তাহার কাহিনীটি আগাগোড়াই শঙ্কর রেখাকে শুনিয়ে দিল। সেই সঙ্গে এ-কথাও বলল যে, কোথাও সে নিজেকে ধরা দেয় নি: এমন কি—চিঠিখানাও নিজের নামে লেখে নি, যেভাবে নিরলা দেবীকে উৎসাহ ও আশ্বাস দেবার কথা বলে দিয়েছেন প্রেসিডেণ্ট লীলাদি, ঠিক সেই কথাগুলিই চিঠিতে লিখে তার নীচে 'কন্যাপীঠের সেবক' এই কটি কথা লিখেছে—কারও নাম দেয় নাই।

ভ্রাতার বুদ্ধির তারিফ করে রেখা জিজ্ঞাসা করল: নিরলাদেবীকে কেমন দেখলে?

শঙ্কর বলল: গেরস্ত ঘরের মেয়ে, দজ্জাল কাকীর কথায় তাড়াতাড়ি হাতমুখ ধুয়ে খুব সাধারণভাবেই চিঠি নেবার জন্যে ছুটে এসেছিলেন। সেইটুকু দেখার মধ্যেই অবাক না হয়ে পারি নি। সৌন্দর্য, স্বাস্থ্য-শ্রী, সপ্রতিভভাব—এই তিনটিই তাঁর চেহারা দিয়ে যেন ফুটে বেরুচ্ছিল—কলেজে নিখুঁত-ভাবে সাজগোজ করে কত মেয়েই ত আসে দেখেছি, কিন্তু এমনটি আর চোখে পড়ে নি।

উৎসাহের সুরে রেখা বলে উঠল: তাহলে দেখছি, লীলাদির কথাটাই হয়ত ফলে যাবে।

কি কথা? তিনি কি, বলেছিলেন শুনি?

মুখ টিপে হেসে রেখা বলল: তুমি নিরলাদেবীর ব্যাপারটি জেনে নিজেই তার সম্বন্ধে সন্ধান নিতে চেয়েছ শুনে, লীলাদি বলেছিলেন—খুব ভালো কথা, তবে কাজটা সব দিক দিয়েই ভালো হবে, ঐ বুড়োটার গ্রাস থেকে ছিনিয়ে শঙ্করবাবু নিজেই যদি নিরলাদেবীর কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তার হাতের মালাছড়াটি নেবার জন্যে স্বেচ্ছায় নিজের গলাটিও বাড়িয়ে দেন!

কথাটা শুনেই শঙ্করের মুখখানা রাঙা হয়ে উঠল। কিন্তু তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে শক্ত হয়ে বলল: দেখছি, মেয়েদের স্বভাবটাই এমনি হালকা—তা সে মেয়ে যত বড় বিদুষীই হোক।

অচেনা ছেলে-মেয়ের প্রসঙ্গ উঠলেই তাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে ফুলের মালা আর বাসরঘর।

রেখাও সঙ্গে সঙ্গে মুখ নাড়া দিয়ে উত্তর করল: কিন্তু এ-সব ব্যাপারে মেয়েরা যা ভাবে, তাদের চোখের সামনে যে-ছবি ভেসে ওঠে, একদিন সেটা বাস্তব হয়ে দাঁড়ায়—একথাটাও মনে রেখ মশাই?

এই নিয়ে রেখাকে ঘাঁটানো আর সঙ্গত মনে করল না শঙ্কর। নিরলার ব্যাপারে রেখার সাহায্য না নিলে তার কার্যোদ্ধার হওয়া কঠিন, কাজেই মিষ্টি কথায় আপোষ করে নিজের কাজটুকুর সুসার করতে সচেষ্ট হলো।

নয়

ভীমরুলের প্রতিষ্ঠানে লীলাদেবী আরও তুদিন গিয়ে দীর্ঘ আলাপ-আলোচনায় ভীমরুলের প্রতি বিশেষ আস্থাশীলা হয়েছেন। ইতি-মধ্যেই ভীমরুলের কাছে তিনি কন্যাদায়োদ্ধার সমিতির সম্বন্ধে সকল বৃত্তান্তই জানতে পেরেছেন। বয়স্থা কন্যাদের অভিভাবক-দিগকে কিভাবে তারা প্রলুব্ধ করে কাজ বাগিয়ে চলেছে, তার কাহিনী শুনে তিনি যেন আকাশ থেকে পড়েন। কিন্তু ভীমরুল আশ্বাস দিয়ে বললেন: নিরলা নামে যে রূপসী মেয়েটিকে নিয়ে বর্তমানে 'টগ অফ ওয়ার' চলেছে, এবং সহরের যে-ক'জন কন্যা-লোলুপ বৃদ্ধ এই প্রতিযোগিতায় কোমর বেঁধে যোগ দিয়েছেন, তাঁদের নাম ঠিকানাও আমি সংগ্রহ করে ফেলেছি। যদিও সমাজে এবং কাজের বাজারে তাঁরা রীতিমত প্রভাবশালী লোক, কিন্তু তাদের সব কটাকে এই নিরলা মেয়েটির ব্যাপারে এমনভাবে নাস্তানাবুদ করবে যে, তারই প্রচণ্ড ঝাপটায় ঐ দায়োদ্ধার সমিতির দরজা পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যাবে।

লীলাদেবী এ কথায় উৎসাহ পেয়ে বললেন: দেখুন, ওদিক দিয়ে আমরা যদি নিশ্চিন্ত হই—আপনি ঐ বুড়ো সয়তানদের দাবাবার ভার নেন, আমরা তা'হলে মেয়েদের দিকটায় ভাল করে নজর রাখতে পারি।

ভীমরুল বললেন: আমি ত সেই কথাই বলছি। ঐ বুড়োদের দলই বলুন, আর দায়োদ্ধার সমিতির কথাই তুলুন—ও তুটো দিকের ভারই আমি নিলাম। তবে যদি দরকার পড়ে, আমি

তখন আপনার সাহায্য চাইব। যাদের সাহস আছে, পুরুষদের সঙ্গে শক্ত হয়ে কথা বলতে পারেন, অর্থাৎ আপনাদের সমিতির মধ্যে যাঁরা বেশ য়্যাডভান্সড্—এমন দু'চারজন মেয়েকে তখন হয়ত প্রয়োজন হতে পারে।

লীলাদেবী উৎসাহের সুরে বললেন: এত বড় একটা শক্ত কাজে যখন মাথা দিয়েছি আমরা, নেহাত আমাদের অবলা ভাববেন না, সেরকম মেয়ে কন্যাপীঠে অনেক আছে।

ভীমরুল বললেন: খুব সুখের কথা। আজকাল প্রত্যেক মেয়েরই উচিত শক্ত হওয়া। অবিশ্যি ট্রামে-বাসে বা পথে-ঘাটে এমন শক্ত মেয়ে আজকাল দেখাও যায়।

এরপর একটু থেমে ভীমরুল জিজ্ঞাসা করলেন: আচ্ছা, নিরলা মেয়েটিকে আপনি দেখেছেন? তার ঐ চিঠিখানা ছাড়া সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ওঁর মনোবৃত্তির কোন পরিচয় পেয়েছেন?

লীলাদেবী একটু থেমে, মনে মনে কিঞ্চিৎ ভেবে, তারপর বলতে লাগলেন: তা'হলে আপনাকে এ সম্বন্ধে একটা য়্যাডভেঞ্চারের কথা বলি শুনুন—কন্যাপীঠের সেক্রেটারী রেখা দেবীকে ভার দেওয়া হয়েছিল—নিরলা মেয়েটির সঙ্গে দেখা করে সে খোঁজখবর নেবে। এখন তার এক ভাই, ইউনিভারসিটির বেশ নাম করা ছেলে—এম-এ, পাশ করেও আর এক সাবজেক্ট নিয়েছেন, সেই সঙ্গে রিসার্চ করছেন। এর ওপর ছেলেটি আবার কবি; আর—আপনারই মতন আমাদের কন্যাপীঠের উগ্র সমর্থক। ব্যাপারটি রেখার কাছে সব শুনে এখন তাঁর ঝোঁক হয়েছে, ছদ্মবেশে নিজেই নিরলা মেয়েটির সঙ্গে দেখা করে তার মনের খবরটি নেবেন। আমরা তাঁর প্রস্তাবে মত দিয়েছি।

ভীমরুল জিজ্ঞাসা করলেন: ছেলেটির নাম আর পরিচয় জানতে পারি?

লীলাদেবী বললেন : নিশ্চয়ই। তাঁর নাম শঙ্কর। অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে। তাঁর বাবা একজন অবসর প্রাপ্ত বিচারপতি।

ভীমরুল পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন : শঙ্কর ছেলেটির কাজ কিছু এগিয়েছে ? খবর কিছু পেয়েছেন ?

লীলাদেবী বললেন : হ্যাঁ। ছেলেটি মাথা খেলিয়ে এরই মধ্যে খানিকটা এগিয়ে গেছে। পোষ্টআফিসের পিওন সেজে সে মেয়েটির সঙ্গে দেখা করেছে।

এরপর শঙ্কর কিভাবে কৌশল করে গোয়াবাগান লেনে কালিদাস বাবুর বাড়ীতে গিয়ে নিরলার সঙ্গে নিরালায় দেখা করে, তারপর কন্যাপীঠের নাম-ছাপা প্যাডে সেক্রেটারী রেখার লেখা একখানি চিঠি বিলি করে আসে—সে কথা ভীমরুলকে খুলেই বললেন। শুনে ভীমরুল মন্তব্য করলেন : ছোকরার মাথা আছে দেখছি। বাড়ীর আর সবাই ছেলেটিকে পোষ্টআফিসের পিওন বলে জানবে, অথচ চিঠির মধ্যে আসল খবর চালাচালি হবে। ভালো আইডিয়া।

লীলাদেবী বললেন : তাছাড়া, নিজের পরিচয় গোপন রেখে কন্যাপীঠের একজন সেবক হয়েই একাজে হাত দিয়েছেন। আর ; মেয়েটি যে চিঠিখানা প্রথম পাঠায়, তারই জবাব দেওয়া চিঠি প্রথম দিন বিলি করে এসেছে। কন্যাপীঠের সম্পাদিকা সেই চিঠিতে এইভাবে নিরলাকে আশ্বাস দিয়েছেন যে,—তোমার চিঠি কন্যা-পীঠে এসেছে, ভয় নেই, নিশ্চিন্ত থাক ; ঐ বুড়োর গ্রাস থেকে আমরা তোমাকে রক্ষা করবই।

ভীমরুল বললেন : গোড়াপত্তনটি ভালোই হয়েছে। এখন কোন সয়তানী মতলব সেঁধিয়ে পিয়নজীর মনটি বিগড়ে না দেয়··· তিনি আবার কবি মানুষ কিনা !

লীলাদেবী মৃদু হেসে বললেন : কি ভেবে কথাটা আপনি বলেছেন তা বুঝেছি। আমিও যে ভাবি নি তা নয়। ধরুন, তাই

যদি হয়—তার পর, খবর নিয়ে জেনেছি, নিরলাও যখন পালটি ঘরের মেয়ে, যদি ওদের মধ্যে মিলনগ্রন্থী বেঁধে দিতে পারি—ক্ষতি ত কিছু নেই। এরকম ক্ষেত্রে আমাদেরও উচিত মেয়েটির একটা গতি মুক্তি করে দেওয়া। সে দিক দিয়ে এদের মিলনটা রাজ-যোটক হবে। নয় কি?

কণ্ঠস্বর কিঞ্চিৎ তিক্ত করে ভীমরুল বলে উঠলেন: কিন্তু মনে রাখবেন—রাজযোটকের পাত্রটি বিচারপতির পুত্র!

এমন সুরে ভীমরুলের মুখ থেকে কথাটা ধ্বনিত হলো যে, নিজের অজ্ঞাতেই লীলাদেবীর বুকের ভিতরটা যেন সহসা সবেগে নাড়া দিয়ে উঠল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি শক্ত হয়ে উত্তর করলেন: তা'হলেও কন্যাপীঠের পত্র যখন তার হাতে উঠেছে, সহজে নিষ্কৃতিও নেই।

ভীমরুল এ কথা শুনে কতকটা প্রসন্নভাবেই বললেন: যাক্। আপনাদের এই প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্যটি জেনে খুসী হলাম। ভাঙবার জন্য ডাণ্ডা তুলেও আপনারা নিষ্করুণ নন—যারা ঘর বাঁধতে চায়, আপনারা সেখানে শাঁখ বাজাতেও রাজী আছেন। খুব ভাল কথা। তাহলে আমিও এদিকে সন্ধান নেব—ঐ জজসাহেবটি কি প্রকৃতির। যদি বুঝি আপনার উদ্দেশ্যের অনুকূল, তাহলে তাড়াতাড়ি যাতে বরণডালা সাজাতে পারেন তারও ব্যবস্থা করব।

অতঃপর স্থির হলো যে, নূতন খবর ভীমরুলই সংগ্রহ করে লীলাদেবীকে জানিয়ে দেবেন। তবে কন্যাপীঠের দিক দিয়ে তাঁরা যেভাবে কাজ করে চলেছেন, তা চালাতে থাকুন—তাতে কোন অসুবিধা হবার কারণ নেই।

দশ

সেদিন খাওয়া-দাওয়ার পর রান্নাঘর ধোওয়া-মুছার পাট শেষ করে, কাপড় ছেড়ে নিরলা নীচের তলার বাহিরের ঘরে বিছানো তক্তাপোষের উপর বসেই ঘড়ির পানে তাকিয়ে দেখল—একটা বেজে সাতাশ মিনিট হয়েছে। কন্যাপীঠের পিয়নটির সেদিনের চিঠির জবাব নিতে আসবার কথা আজ। সকাল থেকেই বার বার পিয়নের বিচিত্র চেহারাটি নিরলার মনে পড়ছে। বর্ষীয়ান পিয়নটির কথাগুলির মিষ্টি সুর যেন এখনো তার কানের মধ্যে ধ্বনিত হচ্ছে—'আপনি ভাববেন না, আমরা আপনার পিছনে আছি। পাছে কেউ সন্দেহ করে, তাই ডাকঘরের পিয়ন সেজে আমাকে আসতে হয়েছে।'

নিরলার মনে প্রশ্ন জাগে—লোকটির সাজ-সজ্জা দেখে পোষ্ট-আফিসের পিয়ন বলেই মনে হয়—পশ্চিমা পিয়নদের মতই সাজ-পোযাক ও চেহারা তার। কিন্তু লোকটি তো প্রথমেই অকপটে বলেছে—পিয়ন হয়েই এসেছে। তাই ডাকঘরের পিয়নদের সঙ্গে যেভাবে কথা-বার্তা বলা হয়, নিরলাও ঠিক সেইভাবেই কথা বলেছে তার সঙ্গে, বিশেষ কোন সম্ভ্রম প্রদর্শন করে নাই। তবে এখন তার মনে সন্দেহ হচ্ছে, লোকটি যদি কন্যাপীঠের কোন বিশিষ্ট ব্যক্তিই হন? তার এ সন্দেহ ভুল না হতেও পারে। কেন না, ছদ্মবেশী পিয়নটিকে পশ্চিমাদের মত দেখতে হলেও, তার কথাগুলি হুবহু বাঙালীর মত। কথার সুরও কোমল এবং মিষ্ট। কিন্তু লোকটি পিয়ন সেজে এসেছে, তার মুখে এ-কথা শুনেও নিরলা ত তাকে

পিয়ন ভেবেই সেইভাবে সম্ভাষণ করেছে! এখন সেই ছদ্ম ব্যাপারটি বার বার নিরলার মনে যেন খোঁচা দিচ্ছে। সে ঠিক করে রেখেছে, লোকটি আজ এলেই তাকে যাচাই করে দেখবে এবং তার সঠিক পরিচয় নেবার চেষ্টা করবে।

বাহিরের দরজাটী খুললেই ঘুলঘুলির মত সান বাঁধানো প্রশস্ত পথটির দু'পাশে দু'খানি ঘর দেখা যায়। ডান দিকের ঘরখানি গৃহস্বামীর বৈঠকখানা; বাম দিকের ঘরের মধ্যে একজোড়া তক্তপোষ ও তার উপরে একখানা সতরঞ্চি বিছানো—এখানে বাড়ীর ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা করে। উভয় ঘর দিয়ে বাড়ীর ভিতরে যাবারও আলাদা দরজা আছে। দশটার পর কচি-কাচা ছেলে-মেয়ে ছাড়া আর সবাই স্কুলে যায়। দ্বিপ্রহরে আহারাদির পর নিরলা একাই এই ঘরে এসে আশ্রয় নেয়। এই সময় উপরে বাড়ীর গৃহিণী কোলের ছেলে-মেয়েদের নিয়ে দিবা-নিদ্রা উপভোগ করেন। চারটে বাজলেই নিঝুম বাড়ীখানা আবার জেগে ওঠে; ছেলে-মেয়েরা স্কুল থেকে ফিরে আসে। তাদের কলরবে সবার ঘুম ভেঙ্গে যায়। কিন্তু তার আগেই নিরলাকে ছেলে-মেয়েদের জলখাবার সাজিয়ে রেখে বাড়ীর বৈকালী পাট করবার জন্য প্রস্তুত হতে হয়। সুতরাং বেলা দেড়টার পর একটানা প্রায় দু'টি ঘণ্টা নিরলার অখণ্ড অবসর—এই সময়টুকু সে পড়াশোনায় কাটিয়ে দেয়।

নিরলাকে আর বেশীক্ষণ প্রতীক্ষা করতে হলো না এদিন। মিনিট কয়েক পরেই রাস্তার দিকের জানালা দিয়ে সেদিনের ছদ্মবেশী পিয়নটির খাঁকির পাগড়ী বাঁধা মাথাটা তার নজরে পড়ল। ঘরের এই জানালার দিকে তাকাতেই সে যেন পুরু চশমার ভিতর দিয়ে নিরলার বিহসিত মুখখানা দেখতে পেল। সঙ্গে সঙ্গে নিরলা চৌকি থেকে উঠতে উঠতে চাপা গলায় বলল: দরজার কড়া নাড়তে হবে না—খুলে দিচ্ছি।

ভিতরে ঢুকে পিয়নটী সহাস্যে নিরলাকে নমস্কার করতেই নিরলাও আজ অসঙ্কোচে যুক্ত করপল্লব দু'টি ললাটে ঠেকিয়ে সেদিনের ভুলটুকু সংশোধন করে নিল। তারপর পাশের ঘরে তক্তপোষের উপর আগন্তুককে বসিয়ে সেও খানিকটা তফাতে বসে তার মুখের দিকে তাকাতেই আগন্তুকই তাকে জিজ্ঞাসা করল: চিঠির জবাবটা লিখে রেখেছেন তো?

সামনের ডেস্কটির ভিতর থেকে খামে ভরা একখানা চিঠি বা'র করে নিরলা পিয়নের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল: হ্যাঁ, এই যে।

ছদ্ম-পিয়ন হাত বাড়িয়ে চিঠিখানা নিয়ে তার কাঁধে ঝোলানো চামড়ার ব্যাগের মধ্যে রাখল। নিরলা আড় চোখে সেটা লক্ষ্য করে একটু গম্ভীর মুখেই বলল: আজকের চিঠিখানা ভারী জরুরী, নতুন একটা খবর আছে; আজই যাতে ওরা পান—

এই পর্যন্ত বলেই নিরলা থেমে গেল। হয়ত তার পরের বক্তব্যটুকু ছিল—'সে ব্যবস্থা আপনি করবেন।' কিন্তু হাত তুলে নমস্কার জানালেও, সেদিন যাকে 'তুমি' বলেছে, আজ সেই লোকটিকেই 'আপনি' বলতে যেন তার সংস্কারে বাধছিল; তাই শেষের ক'টি কথা আর বলা হলো না। কিন্তু পিয়ন তার বক্তব্যটি উপলব্ধি করে তৎক্ষণাৎ জানিয়ে দিল: আপনি নিশ্চিন্ত থাকবেন, এক ঘণ্টার মধ্যেই চিঠি যথাস্থানে পৌঁছে যাবে। তারপর আসছে কাল ঠিক এই সময় এর জবাবও পাবেন।

কথাটা শুনে নিরলার মুখের ভাবটুকু যেন হালকা হয়ে গেলো। ছদ্ম-পিয়ন বক্র দৃষ্টিতে সেটা লক্ষ্য করল। ক্ষণকাল উভয়েই নীরব; উভয়েই যেন স্ব স্ব প্রশ্ন নিয়ে উদ্বিগ্ন, মুখ ফুটে কেউই বলতে পারছে না, যেন এমনি একটা ভাবে উভয়েই আচ্ছন্ন। নিরলাই মনের সঙ্কোচ কাটিয়ে এবং মনকে আয়ত্তে এনে প্রথমে বলল: একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?

ছদ্ম-পিয়নের অন্তরটি দুলে উঠল এই প্রশ্নটি শুনে, সাগ্রহে বলল : নিশ্চয়ই করবেন।

সম্বোধনগত সঙ্কোচ কাটিয়েই নিরলা বলল : সেদিন আপনি বলেছিলেন, ডাকঘরের পিয়ন সেজে এসেছেন কন্যাপীঠের চিঠি দেবার জন্যে। আপনাকে দেখলে মনে হয় পশ্চিমা হিন্দুস্থানী, কিন্তু কথাবার্ত্তা তো পরিষ্কার বাঙলায় বলেন। আপনার আসল পরিচয়টা কি জানতে পারি ?

ছদ্ম-পিয়ন উত্তর করল : আমাকে কন্যাপীঠেরই একজন বাঙালী কর্মী বলে জানবেন। যদিও কন্যাদের নিয়ে ঐ সমিতি, কিন্তু বাইরের কাজ করবার জন্য এমন দু'চার জন ছেলেও ঐ সমিতিতে আছেন, যারা ওদেরই মত পণ-প্রথার বিরোধী। আমিও ঐ দলের একটি ছেলে। তবে এ কথাও বলছি আপনাকে—অ-বাঙালী মেয়েও এই সমিতিতে আছেন।

স্বাভাবিক একটা লজ্জার আভায় নিরলার মুখ ও চোখ দু'টি সঙ্কুচিত হয়ে উঠল ; সেই সঙ্গে মুখখানা নীচু করে সে বলল : তা'হলে আপনার সাজ-সজ্জা সব ঝুটো বলুন ! অর্থাৎ আপনি ছদ্মবেশে—

ছদ্ম-পিয়ন মেয়েটির অভিপ্রায় বুঝতে পেরে তাড়াতাড়ি বলে উঠল : সেদিনই ত আপনাকে প্রথমেই বলেছিলাম, আমি পিয়ন সেজে এসেছি। প্রথম দিন নির্বিঘ্নে আপনার সঙ্গে পরিচিত হওয়াই ছিল আমার উদ্দেশ্য। অবশ্য, কন্যাপীঠের যাঁরা কর্ত্রী, তাঁরা সবাই আমার সজ্জার কথা জানেন। ছদ্মবেশে আমি এলেও আপনার ভয় বা সন্দেহ করবার কিছু নেই।

নিরলা মৃদুস্বরে ও সলজ্জভাবেই বলল : কিন্তু এ অবস্থায় কথা কইতে কেমন যেন সঙ্কোচ হয়। আপনি দেখছেন আমাকে, জেনেছেন আমি কে, আমি কিন্তু আপনার সম্বন্ধে অন্ধকারে রয়েছি। এই দেখুন না, প্রথম দিন পশ্চিমা পিয়ন ভেবে সম্মান করে কথাও বলি নি।

পুরু চশমায় কাচের ভিতর দিয়ে পিয়নজীর চোখ দু'টী চকচক করে উঠল চাপা হাসির আভায়। সেই সঙ্গে শ্মশ্রুল মুখেও হাসি ফুটিয়ে সে বলল ঃ সেজন্য আপনি একটুও কুণ্ঠিত হবেন না। আপনার বিপত্তির কথা জেনে আমরাও আজ কন্যাপীঠের মেয়েদের সঙ্গে সাগ্রহে যোগ দিয়েছি, যাতে এ বিপদ থেকে আপনি মুক্তি পান। আপনার মনের অবস্থা আমরা বুঝতে পারছি। যাক, আমি এখন চলি। আপনি প্রথমেই বলেছেন যে, আজকের চিঠিখানি ঠিক জায়গায় পৌছে দিতে হবে। তারপর, কাল এ সময় এর জবাব নিয়ে এলে আবার কথা হবে। আচ্ছা —নমস্কার।

শেষের কথাগুলি তাড়াতাড়ি বলতে বলতেই এমনি ব্যগ্রভাবে ছদ্ম-পিয়ন উঠে পড়ল যে, নিরলার পক্ষে আর কোন কথা বলা সম্ভব হলো না, নীরবে একটী প্রতি নমস্কার ভিন্ন। সঙ্গে সঙ্গে নিরলাও উঠে বাহিরের দরজা খুলে দিল। ছদ্ম-পিয়ন গলি পথে নেমেই সামনের বড় রাস্তার দিকে এগিয়ে গেল। নিরলাও দরজা বন্ধ করে ঘরের মধ্যে গিয়ে তার স্থানটীতে বসে এই ছদ্ম-পিয়নের কথাগুলি নিয়ে মনে মনে আলোচনা করতে লাগল।

ছদ্ম-পিয়ন গোয়াবাগান লেন থেকে বেরিয়ে বিডন ষ্ট্রীটে এসে একটা গ্যাস পোস্টের পাশে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল, এখন সে কি করবে বা কোথায় যাবে? মিনিট খানেক ভেবেই সে তার কর্ত্তব্য স্থির করে ফেলল—জনবিরল হেদোর উদ্যানে ছাউনি দেওয়া ছোট বিশ্রাম-স্থানটিতে বসে নিরলা মেয়েটির দেওয়া চিঠিখানা আগে সে পড়ে ফেলবে। যেহেতু, এই চিঠির সঙ্গে তার পরবর্ত্তী কাজের সম্বন্ধ জড়িয়ে রয়েছে। অসময় হলেও হেদোর এদিকটা জনশূন্য থাকে না। কিন্তু ছাউনীর নীচে বসবার বেঞ্চিটা এ-সময় খালি দেখে ছদ্ম-পিয়ন উৎফুল্ল হয়ে তার হাতের নকল চিঠি পত্রের বাণ্ডিল ও কাঁধের ব্যাগটি কোলে নিয়ে ঝুপ করে বসে পড়ল। মিনিট দুই

বিশ্রাম করেই তারপর একবার চারিদিকে তাকিয়ে নিকটে কেউ নেই বুঝতে পেরে আস্তে আস্তে ব্যাগ থেকে খামখানা বার করে, ভিতরের চিঠিখানা নিবিড় আগ্রহে পড়তে লাগল।

কন্যাপীঠের পক্ষ থেকে সম্পাদিকা রেখা দেবীই সে-দিনের চিঠিতে নিরলাকে আশ্বাস দিয়ে লিখেছিল যে, কন্যাপীঠের সভায় সর্ব-সম্মতিক্রমে তাকে ঐ বিয়ে-পাগলা বুড়োর হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে এবং কন্যাপীঠ অবস্থাটির উপর তীক্ষ্ণ লক্ষ্য রেখেছে। সুতরাং নিরলা যেন নিশ্চিন্ত থাকেন। এর পর যদি নূতন কোন পরিস্থিতি ঘটে, তা'হলে যেন তখনি লিখে জানান। পত্রবাহক বিশ্বস্ত লোক; অসঙ্কোচে এর হাতে চিঠি দিতে পারে। চিঠির আদান-প্রদানের জন্যই এই ব্যবস্থা করা হয়েছে।

নিরলা এই চিঠিতে তার জবাব দিয়েছে। এক অপরিচিতা সাধারণ মেয়ের মর্মব্যথা বুঝে কন্যাপীঠের শিক্ষিতা মেয়েরা তার প্রতি যে সহানুভূতি জানিয়েছেন এবং এই বিপদ থেকে তাকে উদ্ধার করবার আশ্বাস দিয়েছেন, এর জন্যে প্রথমেই সে মর্মস্পর্শী ভাষায় কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে। তারপর লিখেছে :

খুব সঙ্গীন সময়েই আপনি আপনাদের বিশ্বস্ত লোককে ডাকঘরের পিয়ন সাজিয়ে চিঠিখানা পাঠিয়েছেন রেখাদি! আমি এই লোককে চিঠি নিয়ে আসবার সময়টিও বলে দিয়েছি। কাক-চিলও তাহলে এভাবে চিঠি চালাচালির কথা জানতে পারবে না। এখন এ-ব্যাপারে নূতন একটা পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে। আমার পাণিপ্রত্যাশী যে বৃদ্ধটির কথা লিখেছিলাম, তিনি দেনা-পাওনার কথাবার্ত্তা পাকাপাকি করবার জন্যে খুব শীগগীর তাঁর বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে আমাকে পাকা দেখতে আসবেন শুনছি। এখন আমি কি করব—দয়া করে তাড়াতাড়ি জানাবেন। কেন না, মাঝে তিনটি দিন আছে। তাঁরা দেখতে এসে পরীক্ষা করতে চাইবেন নিশ্চয়ই। বিয়ের সমস্ত খরচ তিনি বহন

কববেন এবং তার দরুণ একটা থোক টাকা কাকাবাবুর হাতে ধরে দেবেন। কাকীমাকে একখানি দামী বেনারসী ও পাঁচ ভরির এক সেট্ চুড়ি দিয়ে প্রণাম করবেন; আমাকেও প্রতিমার মত নানা অলঙ্কারে সাজিয়ে নিয়ে যাবেন। এখন আমি কি করব, সেই পরামর্শ চাইছি আপনাদের কাছে। আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার আপনারা সকলে নেবেন।

আপনার ছোট বোন

নিরলা

নিবিষ্টমনে ছদ্ম-পিয়ন নিরলার লেখা চিঠিখানা পড়ছিল। পড়তে পড়তে তার সারা দেহ ও দেহের ভিতরের শোনিত-প্রবাহ চঞ্চল হয়ে উঠছিল, সেই সঙ্গে তার ইচ্ছা হচ্ছিল—এ-চিঠির জবাবটি এখনি সে ছুটে গিয়ে দিয়ে আসে নিরলা দেবীকে—তোমার কোন ভয় নেই দেবী! ঐ ধনগর্বী বৃদ্ধকে রীতিমত শিক্ষা দিয়ে আমিই তোমাকে রক্ষা করব!

কিন্তু মনের ইচ্ছা ত সব সময় পূর্ণ করা যায় না, তাই তাকেও সংযত হতে হয়। মনের উত্তেজনা দমন করে চিঠিখানা মুড়ে খামের ভিতর সবে মাত্র ভরেছে এমন সময় পিছন থেকে ক্রুদ্ধ কণ্ঠের হুমকীর মত একটা স্বর তাকে স্তব্ধ করে দিল :

'আমি তোমাকে য়্যারেষ্ট করছি।'

মুখখানা ফিরিয়ে পিছনে তাকাতেই ছদ্ম-পিয়ন সবিস্ময়ে দেখল—তার চেয়েও মাথায় বিঘত খানেক উঁচু এবং হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ দেহ, চোখে অত্যন্ত পুরু চশমা-পরা এক মূর্তি বেঞ্চির গায়ে গা দিয়ে দাঁড়িয়ে এই ভাষায় তাকে হুমকী দিয়েছে। পরণে তার খাঁকির হাফ্ প্যাণ্ট, পায়ে পুরু মোজা ও বুট জুতা, গায়ে খাঁকির সার্ট, কোমরে বাঁধা চামড়ার বেল্টটা ঝকমক করছে, হাতে একটা ফাইল, বাম হাতের কব্জিতে একটা রিষ্টওয়াচ বাঁধা। মুখখানা ঘন দাড়ি

ও গোঁফে এমনি আবৃত যে টিকালো নাক ও প্রশস্ত কপালটি ছাড়া আর কোন অংশ চোখে পড়ে না।

চিঠিখানা পড়ে ছদ্ম-পিয়নের মনের মধ্যে উত্তেজনার যে আমেজ ফুটে উঠেছিল, তার রেশটুকু তখনো একেবারে নিঃশেষ হয় নাই; কাজেই সম্পূর্ণ অপরিচিত ও অবাঞ্ছিত একব্যক্তির মুখে উদ্ধত কণ্ঠের এই হুমকী শুনে সেও সোজা হয়ে বসে দৃঢ় স্বরে বলে উঠল: তার মানে?

প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে পিছন থেকে অবলীলাক্রমে এক লাফে বেঞ্চিটা টপকে সে প্রশ্নকারীর পাশে একেবারে দেহ-ঘেঁসে বসে বলল: মানে হচ্ছে—পাবলিকের চিঠি খুলে পার্কের বেঞ্চিতে বসে পড়া পোষ্টাল আইনে পিয়নের পক্ষে একটা রীতিমত অপরাধ। কতকগুলো পিয়ন এভাবে চিঠি পড়ে স্বার্থ সিদ্ধি করে থাকে বলে উপরওয়ালার কাছে নালিশ গিয়েছে। সেজন্যে স্পেসাল অফিসার বাহাল হয়েছে এর কিনারার উদ্দেশ্যে। আমি তাদেরই একজন, তোমাকে য্যারেষ্ট করবার ক্ষমতা আমার আছে। যেহেতু বামাল সমেত তুমি ধরা পড়েছ। বলতে বলতেই আগন্তুক ঝাঁ করে ছদ্ম-পিয়নের হাত থেকে সেই সদ্যপঠিত চিঠিখানা তুলে নিল।

ব্যাপারটা সত্য মনে করেই ছদ্ম-পিয়ন মুষড়ে পড়ল। সত্যইত—বামাল সমেত সে ধরা পড়ে গেছে! কিন্তু যে-দিক দিয়ে ধরা পড়বার আশঙ্কা ছিল, সেদিকে সবার চোখে ধুলো দিয়ে এসে শেষে তাকে এমনভাবে ধরা পড়তে হলো—যেটা একেবারে অপ্রত্যাশিত। অবশ্য, এই ছদ্ম-ব্যাপারটা সে প্রকাশ করে দিলেই এখনি স্পেসাল অফিসার সাহেবের ধোঁতা মুখ ভোঁতা হয়ে যাবে তাতে সন্দেহ নেই; কিন্তু তার পরিণামটাও ভাববার কথা। এ-সূত্রে কন্যাপীঠের নামটাও এই লোকটার কাছে জানাজানি হয়ে যাবে। এমন কি, এখানে বিতর্ক বাধালে এখনি চারদিক থেকে লোক জড়ো হয়ে

একটা নূতন দৃশ্যের সৃষ্টি করবে। এমন একটা চাঞ্চল্যকর অবস্থার মধ্যে স্থির বুদ্ধিতে শঙ্কর ছেলেটি তার কর্তব্য স্থির করে ফেলল। হঠাৎ সে হো হো করে হেসে উঠল—সে-হাসি যেন থামতে চায় না।

মুখখানা কঠিন করে আগন্তুক জিজ্ঞাসা করল: হাসছ যে? ভেবেছো আমি চালাকী করছি?

তেমনি হাসির ফোয়ারা ছুটিয়ে ছদ্ম-পিয়ন উত্তর দিল: আপনি করেন নি, কিন্তু আমি করেছি। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন—চালাকীর দ্বারা কোন বড় কাজ করা যায় না। এখন আমি প্রমাণ করে দিলাম যে, চালাকী দ্বারা সরকারী অফিসারকেও বোকা বানিয়ে দেওয়া যায়। সেজন্যেই ত হাসছি স্যার!

আগন্তুক ভ্রূকুটি করে বললেন: হাতে-নাতে ধরা পড়েও একথা তুমি বলছ?

ছদ্ম-পিয়ন তেমনি সহাস্যে উত্তর করল: আপনি ভেবেছেন মস্ত এক ঘাগী চিঠি-চোরকে পাকড়াও করেছেন; কিন্তু কেসটা যে একেবারে মেকি—ধরতে এসে নিজেই বেকুব হয়েছেন, এখনো সেটা বুঝতে পারেন নি। তবে আপনি আমাকে ধরায় আমি নিজেকে সাকসেসফুল মনে করছি।

এবার ধমক দিয়ে আগন্তুক বললেন: থামো। ও-সব বাজে কথা রাখো—

ছদ্ম-পিয়নও সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল: তা'হলে তোমারও বাহাদুরী দেখ—বাতাসে দড়ির বাঁধন দিতে এগিয়ে এসেছো।

বলতে বলতেই সে মাথার পাগড়ী ও ছদ্ম গোঁফ-দাড়ি ক্ষিপ্রহস্তে খুলে ফেলে ব্যাগটির ভিতরে রেখে বলল: এই—ছাখ! পোষ্টাল-পিয়ন এক মিনিটের মধ্যে ভোল পালটে কলেজ বয় হয়ে গেল! আর ব্যাগের ভিতরে যে বস্তুগুলি আছে তদারক করে দেখতে পার!

আর যাই কিছু থাক—ডাকঘরের কাগজ-পত্রের নাম গন্ধও নেই। নকল চিঠির ওপর ইউজড্ ষ্ট্যাম্প লাগিয়ে, আর বাজে রবার ষ্ট্যাম্পের মোহর দেগে ধোঁকা দেওয়া হয়েছে।

কথার সঙ্গে সে ব্যাগ খুলে ডাকঘরের পিয়নদের অনুকরণে তাড়া বাঁধা চিঠিগুলো খুলে দেখিয়ে দিল—সে যা বলেছে, হুবহু তাই। তারপর, আগন্তুকের প্রশ্নের আগেই নিজে বলল: ছদ্ম রূপ-সজ্জার মহড়া দিচ্ছি স্যার—বুঝেছেন? আপনি ভেবেছিলেন—মস্ত শিকার পাকড়েছেন, কিন্তু দেখছেন ত সব ভূয়ো!

আগন্তুক অতঃপর সেই বেঞ্চিতেই ছদ্ম-পিয়নের পাশটিতে বসে গম্ভীরভাবে বলল: তুমি যে খুব চালাক ছেলে, সেটা বোঝা গেল। কিন্তু ঐ কথা ব'লে—আসল ব্যাপারটাকে উড়িয়ে দিয়ে তুমি আমাকে বেকুব-বানাতে পার নি। তোমার এই ফলস্ মেক-আপের পিছনেও উদ্দেশ্য আছে—

শঙ্কর এখানে ঝাঁ করে বলল:—উদ্দেশ্য হচ্ছে লোকের চোখে ধোঁকা দিয়ে সারপ্রাইজ করা।

আগন্তুক দৃঢ় স্বরে প্রতিবাদ করল: না—একটা রোমান্টিক মতলব নিয়ে চিঠি চালাচালি করা। কন্যাপীঠের তরফ থেকে কাজটি বাগিয়েছ ভালো—এই ফুরসুদে নিরলা মেয়েটিকে—

শঙ্কর এবার সক্রোধে চীৎকার করে উঠল: সাট-আপ্।

তৎক্ষণাৎ নিজের সুদৃঢ় লম্বা হাতখানা শঙ্করের পিঠে রেখে সম্প্রীতির সুরে আগন্তুক বললেন: উষ্ণ হয়ো না হে—আমি সব জানি। তোমাকে ফলো করেছিলাম পরীক্ষা করব ব'লে। তোমার মত আমিও কন্যাপীঠের একজন শুভানুধ্যায়ী ও সমর্থক।

দুই চক্ষু বিস্ফারিত করে শঙ্কর আগন্তুকের মুখের পানে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল: আপনি?

গম্ভীর মুখে আগন্তুক জবাব দিলেন: আমি ভীমরুল।

বিস্ময়ের সঙ্গে সঙ্গে অতি মাত্রায় পুলকিত হয়ে শঙ্কর বলল: আপনি? তা'হলে আমার সব সংশয় কেটে গেল, আমি নিশ্চিন্ত হলাম। আপনার নাম আর চিঠির কথা আমি শুনেছি। কন্যাপীঠের আপনি একজন মস্ত সহায়। বয়সে আপনি আমার চেয়ে অনেক বড়; আমার নমস্কার নিন স্যার!

বলেই দুই হাত যুক্ত করে শঙ্কর ললাটে ঠেকাল। ভীমরুলও তৎক্ষণাৎ তাকে তুলে সস্নেহে জড়িয়ে ধরে বললেন: আমি এক ব্রত পালন করছি অনেকদিন ধরে; তাতে আমার আসল চেহারাখানা কাউকে দেখাতে পারি না—নকল আবরণ দিয়ে লোকের চোখে ধোঁকা দিতে হয়। কিন্তু তোমাকে দেখে, তোমার কথা শুনে, সত্য বলছি ভারি ভালো লেগেছে। আমার মনে হচ্ছে, নিরলা মেয়েটিকে দেখে তুমিও ভালবেসে ফেলেছ। যদি সত্যি তাই হয়, তুমি আমার কাছে কিছুই লুকিয়ো না ভাই—আমি তোমাকে প্রাণ খুলে সাহায্য করব।

শঙ্করের সমস্ত অন্তরটি যেন দুলে উঠল। ক্ষণকাল নীরব থেকে সে আস্তে আস্তে বলল: দেখুন, একটু আগে আপনাকে এক বিপত্তিকারী দুষমন ভেবেছিলাম। কিন্তু এখন দেখছি, আপনি কেমন স্নেহময়! আপনাকে বলতে আপত্তি নেই, ইউনিভারসিটির সংশ্রবে অনেক শিক্ষিতা মেয়ের সঙ্গে আমার মেলামেশা আলাপ পরিচয় হয়েছে, কিন্তু তাদের মধ্যে কারুর প্রতি কোনদিন আকৃষ্ট হয়েছি বলে মনে পড়ে না। কন্যাপীঠেও কত মেয়েকে দেখেছি, কেউ আমার মনে দাগ টানতে পারে নি। কিন্তু এই মেয়েটির ঐ চিঠিখানা পড়েই, কি জানি কেন, আমার সমস্ত মন সহানুভূতিতে ভরে ওঠে। তারপর, পিয়ন সেজে প্রথম দিন তাঁকে দেখেই আমি সত্যই বিহ্বল হয়ে পড়ি, মনে হয় যে, ওঁর সঙ্গে যেন আমার কত দিনের জানা-শোনা-পরিচয়—কবির ভাষায় যাকে বলা হয়, মানস প্রতিমা—ঠিক তাই। এখন—

শঙ্করের মুখের কথা তৎক্ষণাৎ টেনে নিয়ে ভীমরুল বললেন : এখন—আমার কর্তব্য হচ্ছে, নিরলা মেয়েটিকে ঐ রাঘব বোয়ালটির গ্রাস থেকে সরিয়ে এনে তোমার সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া। আমি যা মুখে বলি—তা কাজেও করি, এর নড়চড় হয় না। এখন থেকে আমিও তোমার সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করব, আর এই জায়গাটি হবে আমাদের মিলন-পীঠ। আজ থেকেই আমাদের কাজ সুরু হলো, মনে কর। এখন নিরলার চিঠিখানা পড়ে আমরা আমাদের কর্তব্য স্থির করব। কন্যাপীঠের লীলাদেবী ও নিরলা-সংক্রান্ত ভারটী আমাকেই দিয়েছেন।

নিরলার চিঠি ভীমরুলের হাতেই ছিল। একটু আগে শঙ্কর পড়েছিল, এখন ভীমরুলও পড়লেন। তাঁর মুখখানা কালো হয়ে উঠল চিঠিখানা পড়ে।

চিঠিতে নিরলা লিখেছে—'আসছে শনিবার বিকেলে সেই বুড়ো বোয়াল তাকে পাকা দেখতে আসছে তার বন্ধুদের নিয়ে। কথাবার্তা ত আগে থেকে হয়ে আছে, ঐদিন হবে আদান-প্রদান অর্থাৎ আমার ওপর আষ্টে পৃষ্টে বন্ধন পড়বে। এখন আপনারা বলুন, আমি কি করব ?'

কিন্তু নিরলাকে দেখবার জন্য এ-ভাবে দিন স্থির করবার আগে ও-দিকে যেসব পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল—সেগুলির উল্লেখও অপরিহার্য।

এগারো

শশীর উদ্যোগে চাপলি ছেলেটির সঙ্গে হরিশের আলাপ হয়ে গেছে। ছেলেটির মুখে পাকা পাকা কথা শুনে এবং জজসাহেবের সে প্রতিবেশী জেনে হরিশ তাকে দলে বাহাল করে নিয়েছে। বলেছেঃ আমাদের পেশা জেনেছ তো, বুড়ো বর যোগাড় করে আনা, তবে তারা হবে শাঁসালো আর দেনেওলা, নৈলে আমাদের কাজে লাগবে না।

চাপলি কথাটার সমর্থন করে জানিয়েছে: কথা পড়তেই আমি বুঝিছি স্যার, আপনারা কি চান, আর আমাকে কি করতে হবে! আর শাঁসালো বুড়োর দল ছাড়া গরীবের ঘরের বাড়ন্ত মেয়েদের গতি মুক্তি করবে কে? আমাকে দেবেন টুইয়ে, ইনিয়ে বিনিয়ে কথা শুনিয়ে মেয়েদের মন এমনি রসিয়ে দেব যে, বুড়ো বলে হেলাই করবে না। তারপর বুড়োদেব সঙ্গে পিরিত জমাতে আমাকেই ছেড়ে দেবেন, হন্নে করে দেব।

হরিশ তখন কিঞ্চিৎ উৎসাহী হয়েই বলে। তা'হলে তোমাদের পাড়াতে যে জজসাহেবটি রয়েছে, ভালো মেয়ের সন্ধান করতে এখানে এসেছিলেন; তাঁর কেসটাই তুমি আগে নাও। খোঁজ খবর নিয়ে জানো দেখি ওর মতলবখানা কি?

চাপলি মুখখানা মচকে একটা শব্দ তুলে বলে ওঠে: মোটামুটি খবর তো সেদিন রেষ্টুরেন্টে বসে শশীদাকে শুনিয়ে দিয়েছি স্যার—এক নম্বরের বুড়ো শালিক, ঘাড়ে রোঁ উঠেছে, তাই ছাদনা-তলায়

দাঁড়াবার জন্যে পা ঘসে বেড়াচ্ছেন। গিন্নী অনেক আগে পটল তুলেছে। সোমত্ত ছেলে-মেয়ে; তারা বিয়ে করতে চায় না; জজসাহেবের হয়েছে এখন পো'র নামে পোয়াতির বর্তানোর মতন। চারদিকে মেয়ে দেখে বেড়াচ্ছে—চোখে লাগলেই চিচিং ফাঁক! তখুনি বলবে, আমি রাজি—আনো পাঁজি।

হরিশ বলেঃ কিন্তু এখানে এসে একটি সরেস মেয়ের ফটো দেখে গিয়েও এ-পর্যন্ত খবর কিছু দেয় নি, সাড়াশব্দও পাই নি। সেই জন্যে আমরা একটু উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছি। এখন তুমিই ওঁর মনের খবরটি সংগ্রহ করে এনে আমাদের নিশ্চিন্ত কর দেখি। আর এ-কাজেই তোমার কাজের হাতে খড়ি।

বলেই হরিশ মনিব্যাগ থেকে একটি টাকা বার করে চাপলির হাতে দিলেন। চাপলি টাকাটি পকেটে ফেলে সহাস্যে বলে ওঠেঃ আপনি পাকা লোক স্যার, এমনি করে যে-লোক শুরুতেই হাতে রেস্তর কড়ি তুলে দেয়, তার কাজ উদ্ধার করতে ভুত এসে কোমর বেঁধে দাঁড়ায়—বুঝলেন স্যার!

এইভাবে হরিশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা দৃঢ় করে চাপলি তার উপর ন্যস্ত কাজটি হাসিল করবার উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ে।

অপরাহ্ণের দিকে হেদুয়ার ধারে ধীরে ধীরে পায়চারী করছিলেন সদানন্দবাবু। সকালে বিকালে কোন না কোন পার্ক বা ফাঁকা জায়গায় তাঁর খানিকটা সময় বেড়ানো চাইই। কিন্তু এভাবে নিয়মিত ভ্রমণে কোনও সঙ্গী বা পরিচিত কোন ব্যক্তিকে তাঁর সংস্পর্শে দেখা যায় না। একাই গম্ভীর মুখে মনের সঙ্গে বোঝা-পড়া করেন—মনই অদৃশ্য সাথী রূপে তাঁকে প্রেরণা দেয়।

সেদিন সদানন্দবাবু হেদুয়ার চারপাশ এক চক্কর ঘুরে এসে একটু জনবিরল স্থান দেখে একখানা খালি বেঞ্চির উপর সবেমাত্র

বসেছেন, এমন সময় চাপলি সামনে এসে যুক্ত করযুগল কপালে ঠেকিয়ে বলল : এই যে স্যার, আপনাকে পার্কেই পেয়ে গেছি! আঃ—বাঁচা গেল।

অল্পবয়স্ক ও অপরিচিত একটি বালককে হঠাৎ সামনে এসে এভাবে প্রশ্ন করতে দেখে সদানন্দবাবুর গম্ভীর মুখখানি যেন কালো হয়ে উঠল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ছেলেটির দিকে চেয়ে রূক্ষস্বরে বললেন : তুমি এমনভাবে কথা বলছ যেন আমার সঙ্গে তোমার অনেক দিনের জানাশোনা। কিন্তু আমি তোমাকে এর আগে দেখেছি বলে মনে পড়ে না।

চাপলি সদানন্দবাবুর কথা শুনে দমল না, দিব্য সপ্রতিভভাবেই বলল : আপনাদের মন যে ওজনে অনেক বড় স্যার, ছোট-খাটো বাটকারায় আঁটে না ; কিন্তু আপনি আমাকে না চিনলেও দেখেছেন, আর যেদিন আপনি সিমলের বাড়িতে 'গৃহপ্রবেশ' করেন, সেদিন পাড়ার ভলন্‌টিয়ারদের সঙ্গে আমিও কোমর বেঁধে কাজে লেগেছিলুম স্যার! তারপর সিমলের ব্যায়াম-সমিতিতে স্যার যখন দরাজ হাতে মোটা চাঁদা দেন, তখনো এ-শর্ম্মা হাজির ছিল স্যার! আমিই 'জয়হিন্দ্' বলে স্যারকে প্রথম স্যালিউট দিয়েছিলাম।

সদানন্দবাবু বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিলেন ; ব্যাপারটায় দাঁড়ি টানবার উদ্দেশ্যে ঝাঁ করে বললেন : যাক্—এখন কি মতলবে আমাকে এখানে ধরেছ, শুনি ?

জবাবটা যেন মুখস্ত করে রেখেছিল, এমনি তৎপরতার সঙ্গে চাপলি বলে চলল : স্যারকে এক জায়গায় নিয়ে যাবার জন্যেই আমার আসা। প্রথমেই স্যারের বাড়ী যাই ; কিন্তু সেখানে খবর পেলুম—এ-সময় তো স্যার বাড়ী থাকেন না, হাওয়া খেতে বেরিয়ে পড়েন। আমিও যে এটা জানতুম না তা নয়। ভাবলুম,

বাড়ীর কাছে এইটিই বেড়াবার খাসা জায়গা দেখি। এসেই স্যারকে পেয়ে গেলুম—একেই বলে লাক্।

একটু ধমক দিবার ভঙ্গিতে সদানন্দবাবু বললেন: বাজে কথা বলছো কেন? কি মতলবে এসেছ বল, না-হয়—বাড়ীতে যখন থাকব, যেও। আমাকে অনর্থক বিরক্ত ক'র না।

হাত দুখানি যুক্ত করে এবং সেই সঙ্গে জিভ্‌টা একটু বাড়িয়ে দাঁতে কেটে নিতান্ত বিনয়ের সুরে চাপলি বলল: আপনি তা'হলে আমাকে ভুল বুঝছেন স্যার, নিজের মতলবে কোন কাজ বাগাতে আমি আসি নি স্যার! আপনারই খুব গোপন আর মোক্ষম—যাকে বলে 'প্রাইভেট' কাজ স্যার, সেই সুবাদেই এসেছি।

সোজা হয়ে বসে উভয় চক্ষুর প্রখর দৃষ্টি ছেলেটির মুখে নিবদ্ধ করে সদানন্দবাবু যেন আপন মনে বলে উঠলেন: বটে!

এভাবে একটি মাত্র শব্দ তাঁর মুখ থেকে নির্গত হতে চাপলির সাহস বেড়ে গেল। সেও করপল্লব দুটি কচলাতে কচলাতে ঠোঁটের কোনে হাসির একটু ঝিলিক ফুটিয়ে বলল: তা'হলে বলি স্যার! তবে · অনেকটা ঘোরাঘুরি করতে হয়েছে কি না···স্যার যদি বেঞ্চির পাশে বসবার হুকুম দেন—হেঁ হেঁ হেঁ···

বেঞ্চির হাতলের দিকে একটু সরে বসে অপ্রসন্ন মুখে সদানন্দবাবু বললেন: হুকুম নেবার তো প্রয়োজন নেই, এ বেঞ্চিতে সবাই বসতে পারে।

সঙ্কুচিতভাবে বেঞ্চিখানির অন্য দিকের হাতল ঘেঁসে বসতে বসতে চাপলি বলল: জানি স্যার, সরকারী বাগানে সবারই এক্তিয়ার সমান। তা'হলেও স্যারের খাতির সবাগ আগে। হ্যাঁ, এখন যে কথা বলছিলাম স্যার! কন্যা-দায়োদ্ধার-সমিতির হরিশবাবু তো স্যারের জন্যে ঘর-বার করছেন—ওদিকে নুটুবাবুও সেই নোলা বাড়িয়ে নিরলাদেবীর বাড়ীর আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়াচ্ছে;

ঐ ধেড়ে রাঘব বোয়াল এখন শিশুপালের পার্ট প্লে করছে স্যার! তাই তো হরিশদা এখন চাইছেন—স্যার কেষ্ট ঠাকুর হয়ে ঝাঁ করে সুদর্শন চক্রটা ঘুরিয়ে দিন, সব ঝামেলা মিটে যাক্।

সদানন্দ: তুমি এ-সব খবর পেলে কোথায় হে? আর, হরিশবাবুর কন্যা-দায়োদ্ধার-সমিতির সঙ্গে তোমার কি সম্বন্ধ?

চাপলি: দেহের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের যে সম্বন্ধ—ঠিক তাই স্যার! কেউ কাউকে ছেড়ে থাকতে পারে না। হাজারো লোকের মন নিয়ে যেখানে কারবার, সেখানে মন যোগাবার জন্যে নানান রকমের লোক বাহাল করতে হয়। ওঁদের কি বলুন না, আফিসে বসে মাথার সঙ্গে কলম চালাবেন; কিন্তু সরেজমিনে গিয়ে তদারক করবার সব ভার রয়েছে—এই শর্মার উপরে! কোন বাড়ীর অন্দরমহলে সেঁধুতে তো এ-বয়সী শর্মাদের বাধা নেই; তারপর নায়িকা দিদিমণিদের মনের খবর এ-শর্মারা ছাড়া কে জানবে বলুন? তা'হলে বলি স্যার, আপনি বাজী মাৎ করেছেন! ন্টুবাবু টাকার ভাঁড়ার খুলে দেখালে কি হবে, আপনি স্যার নাম আর খেতাবের জোরে ও-তরফকে দাবিয়ে দিয়ে নিরলাদেবীর দিলের কপাটজোড়াটা খুলে দিয়েছেন। সেই জন্যেই তো হরিশবাবুর এত সাধাসাধি—এখন সরাসরি গিয়ে কাজটা হাসিল করে ফেলুন।

বিরক্তিকর এরূপ সংলাপের মধ্যেও প্রসঙ্গটির মধ্যে একটা বৈচিত্র দেখে মনে মনে রীতিমত কৌতূহলী হয়েই সদানন্দবাবু বলে উঠলেন: এত খবর তুমি যখন রাখ ছোকরা, তোমাকে তো তা'হলে আর অবিশ্বাস করা যায় না! নিরলাদেবীর খবরও তুমি তা'হলে জানো?

চাপলি: জানি না স্যার! তাঁর মনের কথা আমাকে সব খুলে না বললে ভাতই হজম হবে না। ঐ ন্টুবাবুর নামেই সে জ্বলে যায়! জানেন স্যার, আমাকে স্পষ্ট বলেছে—ঐ ছোঁচাটা যদি

সত্যি সত্যি ছাঁদনাতলায় এসে দাঁড়ায়, আমি তখনি গলায় দড়ি দেব কিন্তু তারপর আপনার কথা বলতেই একবারে জল।

সদানন্দ : বল কি! কথা বলতেই জল হয়ে গেল? কিন্তু ভয় পেয়ে কিম্বা ঘেন্নায়—সেটাও বলো।

চাপলি : না—স্যার, আহ্লাদে!

সদানন্দ : কিন্তু আমিও তো বুড়ো হে! তরুণী মেয়েরা কি বুড়ো বর পছন্দ করে?

চাপলি : বুড়ো ছাড়া যখন তার গতি নেই স্যার, তখন বুড়োই সই; তবে সে বুড়ো ঐ নুটুবাবু নয়! আপনি জজিয়তি করেছেন, জজসাহেব ছিলেন, যেই একথা নিরলাদির কানে গেছে, অমনি মনের চাকাও ওঁর ঘুরে গেছে স্যার! এখন আপনার উচিত হচ্ছে—সেখানে হাজীর হয়ে চাক্ষুস দেখা দেওয়া। সত্যি বলছি স্যার, এখনো পর্যন্ত আপনার চেহারায় যে-রকম জলুস দেখছি, জোয়ান ছোকরাদের চেহারায় তেমনটি দেখা যায় না।

সদানন্দ : আমার সম্বন্ধে এ খবরটি তুমি কোথায় পেলে যে আমিই ঐ মেয়েটিকে বিয়ে করবার জন্যে নুটুবাবুদের মতন মেতে উঠেছি?

চাপলি : এ-সব খবর হাওয়ায় রটে যায় স্যার, কন্যা-দায়োদ্ধার-সমিতির দরোজায় একদিন মাথা গলালেই একবারে চিচিং ফাঁক; স্যারের নাম আমাদের খাতার ইজ্জত বাড়িয়ে দিয়েছে। তখন কি জানতে পেরেছিলুম—স্যার বর্ণচোরা আম! পরিচয়টা যেই জানাজানি হয়ে গেছে, অমনি স্যারের মন যোগাবার জন্যে সবাই তটস্থ হয়ে উঠেছে। আমরাই তো কনের বাড়ী গিয়ে খবর দিয়ে আসি—এক জজসাহেব নিরলাদিকে বিয়ে করতে চান!

সদানন্দ : এখন আমাকে কি করতে হবে?

চাপলি : করাকরি আর কি স্যার, কনের বাড়ী গিয়ে তাঁর

চেহারাখানা দেখে মনে মনে মিলিয়ে নেবেন—ফটোতে যা দেখেছেন ঠিক কি না! আজকাল স্যার, মেয়ে দেখানোর ব্যাপারেও ভেজাল চলেছে খুব, আদালতে মামলাও উঠেছে। স্যারও সবই জানেন!

সদানন্দবাবু মনে মনে একটু ভেবে, কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সহসা বললেন: আচ্ছা, আমি এরই মধ্যে একদিন মেয়েকে দেখে আসব।

দু'হাত কচলাতে কচলাতে চাপলি বলল: কিন্তু স্যার, এই দেখার ব্যাপারে সমিতি হয়ে, সমিতির কাউকে নিয়ে তবে যে কনের বাড়ী গিয়ে কনে দেখা দস্তুর! তা'ছাড়া কনের ঠিকানা তো স্যারের জানা নেই।

মৃদু হেসে সদানন্দবাবু বললেন: তুমি তো ঠিকানা জানো, তবে আর ভাবনা কি? তোমাকে সঙ্গে করেই ক'নে দেখতে বেরিয়ে পড়া যাবে। এখন তুমি যেতে পার, প্রয়োজন মনে কর তো তোমাদের সমিতির কর্তাকে খবরটা জানিয়ো।

চাপলি তার অভ্যাসমত হাত দু'খানি কচলাতে কচলাতে বলল: কিন্তু স্যার কবে যাবেন, সে খবর কি করে পাব? তারিখটা যদি বলে দেন, আর সময়টাও—তা'হলে ঠিক্ সেই সময়—

চাপলির কথায় বাধা দিয়ে সদানন্দবাবু বললেন: যেমন এখানে এসে এখন আমাকে পাকড়াও করেছ, তেমনি করে খুঁজে নিও—কাল বা পরশু এই সময়, তা'হলেই জানতে পারবে। এখন আর এই নিয়ে কথা কচলা-কচলি করে কাজ নেই, বুঝলে?

'তাই হবে স্যার!' বলেই চাপলি অনিচ্ছাসত্ত্বেও বেঞ্চিখানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। তারপর যুক্ত করপল্লব কপালে ঠেকিয়ে চলে গেল।

সদানন্দবাবু এই বয়সের এমন একটি ছেলের মুখে পাকা পাকা কথা শুনে হকচকিয়ে গেলেন। এখন ভাবেন, একটি দিন ঐ কুখ্যাত

সমিতির আফিসে গিয়ে টাকা জমা দিয়ে নাম লিখিয়ে সত্যিই তিনি ধরা পড়ে গেছেন ! ওরা বুঝে নিয়েছে যে, তিনি নিজেই বিয়ের নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে সমিতির দরজায় ধর্ণা দিয়েছিলেন, সেই সূত্রে তাঁর পরিচয় সংগ্রহ করে রটাতে চাইছে—বিপত্নীক এক বৃদ্ধ জজকেও তাদের ফাঁদে ফেলে ওরা কাবু করে ফেলেছে। এই প্রসঙ্গে দলের একটা ইচড়ে-পাকা ইতর ডেঁপো ছেলেকে তারা শিখিয়ে পড়িয়ে কাজ উদ্ধারের মতলব করেছে। ভাবতে ভাবতে সদানন্দ বাবুর সর্ব্বাঙ্গ কণ্টকিত হয়ে ওঠে, ভ্রূকুটি করে চাপা গলায় বলেন : নুইসেন্স ! দেশের পাপ, জাতির কলঙ্ক, দে মাষ্ট বি চেক্‌ড্‌ !

হেদুয়া থেকে বেরিয়ে চাপলি ট্রামে উঠে চোরবাগানের মোড়ে নামল। উদ্দেশ্য, জজসাহেবের সঙ্গে এতক্ষণ ধরে যে-সব কথা-বার্ত্তা হলো, সেগুলো টাটকা টাটকা হরিশদাকে শুনিয়ে দেওয়া। এই কথা থেকে স্পষ্টই বোঝা যাবে যে, জজসাহেব নিজের জন্যেই কনের প্রার্থী হয়ে সমিতির খাতায় নাম লিখিয়াছিলেন।

হরিশ আফিস থেকে উঠি উঠি করছিল ; যেহেতু, মুটবিহারীবাবু জরুরী তলব করেছেন—তাঁর আফিসে এখনি দেখা করতে হবে ! তাঁরা নাকি কালই কালীদাসবাবুর ভাইঝি নিরলা মেয়েটিকে দেখে সে সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা পাকা করতে চান। এমনি সময় চাপলি এসে বলল : জবর খবর এনেছি হরিশদা ! হেদোয় গিয়ে জজসাহেবকে ধরেছিলুম, আধ ঘণ্টার ওপর তাঁর সঙ্গে কথা। যেমন যেমন কথা হয়েছে, ঠিক বলে যাচ্ছি—শুনুন, আর ঠিক করুন, এরপর কি করবেন।

যেভাবে সদানন্দবাবুর সঙ্গে চাপলির সংলাপ হয়েছিল, সব কথাগুলিই সে ভনিতা করে হরিশ ও শশীকে শুনিয়ে দিয়ে উপসংহারে বলল : এখন বলুন, জজসাহেব নিজের জন্যেই কনে খুঁজতে এসেছিলেন কি না ?

হরিশ গম্ভীরমুখে বলল : জজসাহেবের সঙ্গে এ-ভাবে কথা ব'লে তুমি খুব বাহাদুরী দেখিয়েছ, তাতে ভুল নেই। জজসাহেবও বুঝেছেন, তুমি একখানি সাধারণ চীজ নও। কিন্তু এ-থেকে তাঁর মনের আসল খবরটি কিন্তু ধরা যাচ্ছে না; ওঁরা হচ্ছেন গভীর জলের মাছ, মনের হদিশ পাওয়াটাই মুস্কিল। এদিকে, নিরলার সঙ্গে তোমার আলাপ আছে, আর জজসাহেব তার প্রার্থী শুনে সে আহ্লাদে নেচে উঠেচে—এই ডাহা মিছে কথাগুলো ওঁকে ভনিতা করে শুনিয়ে দিয়ে নিতান্ত আহাম্মুখের মত কাজ করেছ।

চাপলি এ-কথার উত্তরে হাত-মুখ নেড়ে বলে উঠল : আজ্ঞে না স্যার, হিসেব করেই ও-কথাগুলো বলতে হয়েছে, নৈলে জজসাহেবের মতন লোকের কাছে আমল পেতাম নাকি? 'মিছে কথাটা' কি মিছিমিছি তৈরী হয়েছে বলতে চান স্যার! জানেন, হোমিওপ্যাথি ওষুধের মত রোগ বুঝে তাক করে একটি ফোঁটা ফেলতে পারলে বুলেটের মত কাজ করে? আরে মশাই, যে বয়সের পুরুষ হোক না কেন, কোনো আইবুড়ো ছুঁড়ি তাঁকে ভালবেসে বিয়ে করতে চায়—কানে যদি কেউ রসান দিয়ে ঢোকাতে পারে, শুনতে শুনতেই তাঁর মন একবারে লবেজান হয়ে যাবেই। তখন তো আলাপ জমিয়ে কাজ বাগিয়ে নেওয়া গেল; তারপর কোমর বেঁধে লাগলেই হলো, মিথ্যেকে যতটা পারা যায় সত্যি করে নিতে।

হরিশ বলল : তার মানে? মিছেকে সত্যি বানাবে কি করে শুনি?

চাপলি বলল : আজই হোক আর কালই হোক, ঐ নিরলাদেবীর আস্তানায় গিয়ে তার সঙ্গে আলাপ জমিয়ে ফেলা, জজসাহেবের কথা গুলজার করে তাকে শুনিয়ে দেওয়া।

হরিশ : কিন্তু যদি তার মন না ভেজে—পছন্দ না করে? পরে এ ব্যাপারে জজসাহেবকে কি বলবে?

চাপলি : অমনি হাতের পাঁচ নুটুবাবুকে খাড়া করে পাল্টা শুনিয়ে দেব—ঐ লোকটাই সব বিগড়ে দিয়েছে স্যার।

হরিশ উৎসাহের সুরে বলল : সত্যিই তুমি ভাই বাহাদুর ছেলে ? তাহলে শোন বলি, আমরা চলেছি ঐ নুটবিহারীবাবুর কাছে—তিনি ডেকেছেন, কালই নিরলাদেবীকে দেখতে চান। সেই কথাই হবে। তুমিও আমাদের সঙ্গে চল। তোমাকে ছেড়ে এখন থেকে সমিতির আর কোন কাজ-কর্ম হবে না।

আফিসের তখন ছুটি হয়ে গেছে। নুটু গাঙ্গুলী আফিসে তাঁর খাস কামরায় প্রিয়বাবু রামহরি ও সাতকড়ির সঙ্গে হরিশের প্রতীক্ষা করছিলেন। রামহরি বললেন : কথায় আছে—শুভস্য শীঘ্রম্। তোমার কেস্‌টা আর ঝুলিয়ে রেখো না নুটু—যা হোক হেস্ত-নেস্ত একটা করে ফেল।

মোটা বর্মা চুরুট টানতে টানতে নুটবিহারীবাবু জানালেন : সেই জন্যেই তো হরিশকে ডেকে-পাঠিয়েছি। আজই মেয়ের বাড়ীতে খবর দেবে,—কাল বিকেলে আমরা দেখতে যাচ্ছি।

সাতকড়িবাবু একটা হাই তুলে বলে উঠলেন : শুনে ভারি সোয়াস্তি পাচ্ছি হে! কিউ'র লাইনে আগে গিয়ে দাঁড়িয়েছ, তোমারটা হয়ে গেলেই আমাদের পালা আসবে। এদিকে যে মেঘে মেঘে বেলাও বেড়ে চলেছে।

রামহরি জিজ্ঞাসা করলেন : কি দিয়ে পাত্রী আশীর্বাদ করবে ভায়া ?

নুটবিহারী বললেন : তোমরাই ঠিক করে দেবে ; এখানকার কাজ সেরে চল না দু'চারটে নামকরা জুয়েলারী ফারমে গিয়ে হাল-ফ্যাসানের কিছু নতুন রকম চীজ পছন্দ করা যাক্

এমনি সময় হরিশ, শশী ও চাপলি কক্ষে প্রবেশ করল। তিন

বন্ধুর নজর পড়ল চাপলির দিকে ; গম্ভীর মুখে নুটবিহারী জিজ্ঞাসা করলেন ঃ এ বাল্লখিল্লটি কে হে ?

হরিশ বা শশীর বলবার আগেই খপ্ করে চাপলিই হাত দু'খানি কচলাতে কচলাতে জবাব দিল ঃ ঠিক ধরেছেন স্যার—বাল্যখিল্লই বটে ! য়্যাদ্দিন তপস্যা করছিলুম—স্যার-দের বিয়ের ফুল ফুটলেই নিতবর সেজে বরের সনে সভা আলো করে বসব—এই আশায়। ভবিতব্য ঠাকুর আমার কানে কানে বলে দিয়েছেন—ফুল ফুটব ফুটব হয়েছে, এই সময় গিয়ে আসর জমিয়ে ফেল। তাই এসেছি।

তিন বন্ধুর মুখমণ্ডল একসঙ্গে উৎফুল্ল হয়ে উঠল চাপলির কথায়। নুটবিহারী বললেন ঃ বা-রে ছেলে ! এ যে দেখছি সত্যিই এক আজগুবী চীজ !

হরিশ বলল ঃ এ-রকম চীজ আমাদের হাতে রাখতে হয় নুটুবাবু, তাতে অনেক সুবিধা হয়। মেয়ে নিয়ে কারবার, কিন্তু তারা থাকে আড়ালে ; তাদের মন ভাঙাতে হলে দরকার এই ধরণের ইচড়ে-পাকা ছেলে।

চাপলি বলল ঃ হরিশদা'র সঙ্গে গিয়ে একবার ও-তরফকে তো জেনে-শুনে আসি, তারপরে দেখবেন কি কাণ্ড করি ! জজসাহেব যত চেষ্টাই করুক—সব আমি ভেঙে দেব।

নুটবিহারী ঃ জজসাহেবকেও তুমি জান নাকি ?

চাপলি ঃ জানি নে আবার ! সহরের যেখানে যত বুড়ো শালিক আছে স্যার, আমার অচেনা বা অজানা বলতে কেউ নেই ! ওনার ঘাড়েও হালে রোঁ উঠেছে, তাই বিয়ের জন্যে ক্ষেপে উঠেছেন, এখন হা নিরলা—জো নিরলা।

নুটবিহারী ঃ কথাবার্তা কিছু এগিয়েছে কি জান ?

চাপলি ঃ কি করে এগুবে বলুন স্যার ? এককালে ছিলেন জজ, সেই গরবে বিশ্বম্ভর হয়ে বসে আছেন। ভেবেছেন ওঁর নাম

শুনেই কনে গলায় আঁচল দিয়ে এগিয়ে এসে ধরা দেবে! থাকুন উনি ওঁর গুমোর নিয়ে বসে, এদিকে স্যার তো কাজ বাগিয়ে—বাদশা বেগম ঝম্-ঝমা-ঝম্ করে তাক লাগিয়ে দিন। আমি কিন্তু নিতবর হয়ে চতুর্দোলায় স্যারের প্যাশে বসে যাব।

ঘুটবিহারী : আচ্ছা, তা'হলে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—নিরলা মেয়েটির সঙ্গে তোমার জানা-শোনা আছে নাকি?

সোৎসাহে অঙ্গভঙ্গি করে চাপলি বলে উঠল : না থাকলেও জানা-শোনা হতে কতক্ষণ লাগে স্যার! আগে তো হরিশদা, একবার চিনিয়ে দিন, তারপর চিনির বলদ হয়ে কাজ বাগিয়ে নেবই, বাড়ীশুদ্ধ সবাই পিত্যেশ করবে—কখন চাপলি আসে! স্যারের খবর সব জানি, শুনিছিও তো অনেক, শুনবোও এরপর কত। তারপর ভনিতা করে স্যারের এমন সব কীর্তির কথা শোনাব যে, চমকে উঠবে, কনে পর্যন্ত মশগুল হয়ে যাবে—বিয়ের আগেই স্যারের সঙ্গে বাজারে গিয়ে গয়না কাপড় পছন্দ করবে।

আনন্দে বিহ্বল হয়ে ঘুটবিহারী এই সময় সোজা হয়ে বসে বললেন : তা' যদি করতে পার তুমি, এমন দামী বখ্‌শিস আমি তোমাকে দেব, তার ওপর আরও সুযোগ সুবিধা পাবে যে, তোমার ভাগ্য ফিরে যাবে।

দু'হাত আনন্দে কচলাতে কচলাতে চাপলি বলল : সেই আশাতেই তো স্যারের মত দিলদার রইস্ লোকের খিদ্‌মত খাটতে এগিয়ে এসেছি স্যার! আগেই তো বলেছি, ভবিতব্য ঠাকুর পথটি দেখিয়ে দিয়েছেন।

এরপর আসল কথা পড়ল। ঘুটবিহারীবাবু জানালেন : আগামী কাল বিকেলে তাঁরা কনে দেখে কথাটা পাকাপাকি করবেন।

হরিশ বলল : খুব ভাল কথা, আর দেরী করা ঠিক নয়।

তবে এত তাড়াতাড়ি না করে মাঝে দু'টো দিন বাদ দিয়ে দিন স্থির করলে ভালো হয়।

চাপলিও কথাটা সমর্থন করে বলল: তা'হলে আসছে শনিবার বিকেলে দিন ঠিক করুন স্যার। মাঝে ক'টা দিন হাতে থাকলে আমিও খানিকটা কেরামতি দেখাতে পারব। হরিশদা বরং এখনই উঠে পড়ুন—খবরটা দেবার জন্যে। এই ফাঁকে আমিও ওঁর সাথী হয়ে পথটা দেখে আসি।

প্রস্তাবটি সকলেরই মনঃপুত হলো। নুটবিহারীবাবু বললেন: বেশ, তাই হোক; হরিশবাবু আজই গোয়াবাগানে গিয়ে কালিপদ বাবুকে খবর দিয়ে আসুন—আমরা আসছে শনিবার বিকেলে পাত্রী দেখতে যাচ্ছি। ঐ দিনই কথা-বার্তা সব পাকা হবে।

বারো

সন্ধ্যার একটু আগেই হরিশ চাপলিকে সঙ্গে করে কালিদাসবাবুর গোয়াবাগানের বাড়ীতে উপস্থিত হলেন। আফিস থেকে ফিরে কালিদাস বাবু বাইরের ঘরে বসে খবরের কাগজ পড়ছিলেন। হরিশকে সাদরে অভ্যর্থনা করে বসিয়ে চাপলির দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন : এটি ?

হরিশকে বলতে হলো না, চাপলিই ঝাঁ করে জবাব দিল : জেলের পিছের হাঁড়ী স্যার! অর্থাৎ উনি যেখানে শিকারে যাবেন, আমাকেও পিছনে পিছনে টানবেন—সেই জন্যে আসতে হয়েছে।

কালিদাস বাবু বললেন : তাহলে বসতে আজ্ঞা হোক—

দাঁতে জীভটা চেপে ধরে চাপলি হাত কচলাতে কচলাতে বলল : অমন কথা বলবেন না স্যার, আপনারা হচ্ছেন মাথার মণি, আপনাদের আজ্ঞা বহন করতেই আছি। ভিতরের ব্যাপারটা সবই জানি ত!

সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে কালিদাসবাবু হরিশের দিকে তাকাতেই সে বলল : ভারি তুখড় ছেলে, স্যার! য্যাদ্দিন দেখেন নি—বাইরের কাজে ঘুরত। যেখানেই কনের তরফ থেকে গোল ওঠে, একে দিই ছেড়ে; সম্পর্ক একটা পাতিয়ে, বরের ব্যাপারে ভাঁওতা দিয়ে নরম করতে এমন ওস্তাদ আর দুটি নেই।

উৎফুল্ল মুখে কালিদাসবাবু বললেন : বটে! তাহলে আমাদের কনেটিকে টিট করে দেবার জন্যে একবার চেষ্টা দেখলে হয় না! বুড়ো বরের কথায় নিরলা মেয়েটা নাকি এরি মধ্যে বিগড়ে গেছে, তাই বলছিলাম—

চাপলি অমনি বলে উঠল : আর বলতে হবে না স্যার—বুঝে নিয়েছি সব। কিন্তু এ বর নামেই বুড়ো, এখনো ওনার রব আর দপদপা দেখলে যুবোদের মুখ চূণ হয়ে যায়! সকাল সন্ধ্যায় কসরৎ করেন কত, তার ওপর কায়াকল্প চিকিৎসা চালিয়ে যৌবনটাকে জোর করে ফেরাবেন বলে কি কাণ্ডই না করছেন। ছোট ভাইটির মত কাছে থেকে সব খবর আমি রাখি কিনা! একবার ভাঁবি বৌদির সঙ্গে আমার আলাপটা করিয়ে দিন দেখি—দু দিনেই পোষ মানিয়ে দেব।

এই বয়সের ছোকরার মুখে এই ধরণের কথা শুনে কালিদাসবাবু অবাক হয়ে কিছুক্ষণ তার দিকে চেয়ে থাকেন ; তারপর আস্তে আস্তে বলেন : বা! দিব্যি রসানদার যোগাড় করে এনেছেন হরিশ বাবু! একে আর কিছুই শিখিয়ে পড়িয়ে দিতে হবে না—মনের মতন রসান দিয়ে যত বড় ত্যাঁড়্রা মেয়ে হোক না কেন, ঠিক পটিয়ে নেবে। তাহলে আপনি একটু বসুন, আমি নিরর সঙ্গে এর আলাপ করিয়ে দিয়ে আসি।

হরিশ বলল : বেশ। এই জন্যেই ত মাষ্টার চাপলিকে এনেছি স্যার?

কালিদাসবাবু আর একবার ছেলেটির আপাদ মস্তক দেখে নিয়ে বললেন :—মাষ্টার চাপলি! বা! নামটিও খাসা।

চাপলিও সহাস্যে বলল : কাজ নিয়েই কথা স্যার—নামে কি এসে যায় বলুন?

নিরলা সবে মাত্র গা ধুয়ে কাপড় ছেড়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে তার ছোট ঘরখানির মধ্যে এসেছে। নীচের দালানের একপাশে একটু নিরিবিলিতে এই ঘরখানি সে ব্যবহার করে। একপাশে একখানি ছোট তক্তপোষ ; বিছানাটি সেখানে গুটিয়ে রেখে তক্তপোষের উপর

একখানি সতরঞ্চি পেতে বসার ব্যবস্থা করেছে। এই ঘরে বসলে সে রেডিওর গানগুলি স্পষ্ট শুনতে পায়। যে গান মনে লাগে, খাতায় টুকে নেয়। পাশের ঘরে রেডিও এইমাত্র সুরু হয়েছে, নিরলাও খাতা পেনসিল নিয়ে তক্তপোষে জেঁকে বসে গানখানি টুকে চলেছে। এমনি সময় চাপলিকে নিয়ে কালিদাসবাবু ঘরে সেঁধুলেন।

কাকাকে দেখেই ভয়ে শিউরে ওঠে নিরলা। বাড়ীতে রেডিও দু-বেলা বাজলেও তাঁর ইচ্ছা নয় যে নিরলা রেডিও শোনে। আজ বাদে কাল বিয়ে হবে—ও জিনিষটা নাকি আই বুড়ো মেয়েদের মন বিগড়ে দেয়। তাই তাঁকে দেখেই নিরলা তাড়াতাড়ি খাতা পেনসিল লুকিয়ে ফেলল।

চাপলি কিন্তু ঘরে ঢুকেই বলে উঠল: রেডিওর গান বুঝি বৌদি খুব ভালবাসেন? দাদার বাড়ীতে তিন তালায় তিনটে রেডিও, এর ওপর আফিসেও গোটা দুই আছে। সে সব কথা হবে'খন—আগে ত প্রণামটা সেরে নিই।

বলতে বলতেই হেঁট হয়ে নিরলার দুই পায়ে হাত বুলিয়ে শেষে হাতখানা মাথায় ঠেকাল। নিরলা তখন বিব্রত হয়ে কাকার দিকে তাকায়। কালিদাস বাবু বলেন: তোর লক্ষ্মণ দেওররে—আব্দার ধরেছে বৌদির সঙ্গে আলাপ করবে। চমৎকার ছেলে, কথা শুনলে তাক লেগে যাবে।

তারপর চাপলির দিকে ফিরে বলেন: জান বাবাজী, পাড়াশুদ্ধ সবাই বলে—নিরলার সঙ্গে কথায় পারবার জো নেই! তারপর রবি ঠাকুরের কবিতা ওঁর সব কণ্ঠস্থ। তোমরা দুটিতে এখন বোঝা-পড়া কর, আমি বাইরের ঘরের কাজটা সেরে ফেলি।

কালিদাসবাবু তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। নিরলা ব্যাপারটি বুঝে আড়ষ্ট ভাবেই বসে রইল। চাপলিও এ পর্যন্ত বসেনি, তক্তপোশের গায়ে দেহের ভারটি দিয়ে বক্রভাবে দাঁড়িয়েছিল, এই

সময় মৃদু হেসে বলল : বৌদি ত বসতে বললেন না, অগত্যা নিজেই ব্যবস্থা করে নিই।

কথার সঙ্গে সঙ্গে চৌকিখানার এক পাশে উঠে বসল নিরলার ঠিক মুখোমুখী হয়ে। ছেলেটার হাল চাল নিরলার ভাল লাগেনি ; মুখখানা কঠিন করেই জিজ্ঞাসা করল : আমাকে তুমি বৌদি বললে কেন ? আমার কি বিয়ে হয়ে গেছে যে—

কথাগুলো শেষ করবার আগেই চাপলি বাধা দিয়ে বলল : আপনি যাঁর বৌ হবেন, তাঁর যে আমি ভাই ; তাহলে আপনি বৌদি হ'লেন না ? আর বিয়ে যখন হবেই—দুদিন আগে পিছে বই ত নয় ?

এবার নিরলা জিজ্ঞাসা করল : তোমার নাম কি ?

চাপলিও সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল—নাম আমার অনেক বৌদি, সব বললে কোনটিই মনে থাকবে না—যাকে বলে, বাঁশ বোনে ডোম কাণা ! তবে 'মাষ্টার চাপলি' এই নামটাই আমার খুব চালু, সবাই চেনে। আপনি আমাকে চাপলি বলেই ডাকবেন। এখন আসুন—আলাপটা জমিয়ে ফেলি, আপনার যদি কিছু জানবার থাকে জিজ্ঞেস করুন—জলের মত গড়িয়ে দেব।

নিরলা বলল : তোমাদের বাড়ীতেও এক বৌদি আছে শুনিছি। সেখানে আলাপ জমে না ?

প্রশ্নটা শুনেই চমকে উঠ্‌ল চাপলি—ভাগ্যিস্ খবরটা সে হরিশের কাছ থেকে জেনে নিয়েছিল পথে আসবার সময়। মুটু বাবুর রুগ্না স্ত্রীর খবর যখন এই মেয়েটি পর্য্যন্ত জানে, তার জানা না থাকলেই ত সব মাটি হয়ে যেত !

চাপলি অমনি মাথা খেলিয়ে জবাব দিল : তাঁর কথা আর বলবেন না বৌদি। দিন রাতই ত তিনি বিছানায় শুয়ে থাকেন ! তাঁর যত আলাপ নিজের দেহ আর মনের সংগে—'আর পারিনেরে···

উহু হুহু গেলুমরে বাবা···মাথাটা যে খসে গেল···হাতগুলো যেন কুকুরে চিবুচ্ছে!' এমনি করে সর্বক্ষণই কাতরাচ্ছেন, দুটো ঝি পালা করে রাত দিন কাছে থাকে, তবু ঠাকরুণের মন পায় না। আপনি বলুন বৌদি—এরকম বৌদির সঙ্গে আলাপ করে সুখ আছে?

নিরলা পুনরায় প্রশ্ন করল: বাড়ীর কর্তা বৌএর দেখা শোনা করেন না?

চাপলি জবাব দেয়: আগে করতেন, এখন অবস্থা দেখে হাল ছেড়ে দিয়েছেন। কাজের মানুষ তিনি, সারা দিন খেটে খুটে বাড়ী এসে প্রথমেই বৌএর ঘরে ছুটতেন খবর নিতে। কিন্তু বরকে দেখলেই বৌ উঠতেন ক্ষেপে—জিনিস পত্র ভেঙে, বিছনাপত্তর ছিঁড়ে তছনছ করতেন। কাজেই কর্তাও ইদানীং দেখা শোনা বন্ধ করে লোকের ওপর ভার দিয়েছেন। বিয়ের পর নতুন বৌকে নিয়ে দাদা আর ওবাড়ী মাড়াচ্ছেন না—রাজপুরীর মত আলাদা একখানা সাজানো বাড়ী—যেখানা বিলেতের এক লর্ড ভাড়া নিয়ে থাকত, সেখানা খাস করে নিয়েছেন। কী-সে বাড়ী বৌদি, দেখলে তাক লেগে যায়। কত জন্মের জোর ভাগ্য হলে, তবে ওরকম বাড়ীতে থাকা চলে।

নিরলাও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ছেলেটির মুখের ভঙ্গিমা লক্ষ্য করছিল কথাগুলি বলবার সময়। এর পর সে হঠাৎ মোক্ষম প্রশ্ন করে বসল: কিন্তু নতুন বৌ নিয়ে কদিন আর ও বাড়ীতে তাঁর থাকা চলবে শুনি? বয়স ত সোত্তরের কোঠা পেরিয়ে গেছে শুনছি—আগের দু পক্ষের পোষ্য সংখ্যাও কম নয়; তার পর বিধাতাপুরুষের কাছ থেকে মার্কণ্ডের পরমায়ু ত মঞ্জুর করে আনেন নি! দিন কতকের জন্যে এসব ঝামেলা কেন বলতে পার? তার চেয়ে উচিত নয় কি, যেগুলো আছে—তাদের নিয়ে শেষ জীবনটা আনন্দে কাটানো? রুগ্না বৌটিকে তোয়াজ করা, যাতে সেরে উঠেন—সেজন্যে ভাল ভাল ডাক্তার বদ্যি দেখানো?

এ ধরণের প্রশ্ন উঠবে মুটুবাবুর মত ধনপতি বরের ভাবী বৌএর মুখ থেকে—চাপলি সেটা কল্পনাই করতে পারে নি। এসব কথার জবাব দেওয়াও খুব সহজ নয়। তবে সেও সব দিক দিয়ে চৌখস বলে খ্যাতি পেয়েছে, চুপ করে থাকবার বা হার মেনে নেবার পাত্রই সে নয়। একটু থেমে বলবার কথাগুলি ভেবে নিয়েই বলতে আরম্ভ করল: আপনি দেখছি বৌদি, বাজার চলিত বিয়েপাগলা বুড়োদের ভাবগতিক দেখে আমার দাদাটিকেও ঐ দলে ফেলেছেন! এইখানেই আপনার মস্ত ভুল হয়েছে। দাদা কি বলেন শুনবেন? সেকালে গোটা দুই সংসার করেছি, তখনকার অবস্থামত। এখন—একালে এমন এক সংসার করব, যেটা হবে উঁচু ধরনের একটা এক্জাম্পল! হলেই বা বয়েস, দাদাকে কি আপনি যে সে মানুষ পেয়েছেন? জানেন—মস্ত এক পালোয়ান তাঁকে ডালাই মালাই করে দুটি ঘণ্টা ধরে? নিজেও রীতিমত কসরত করেন! স্নান করে উঠেই এক গ্লাস বেদানার সরবত ঢেলে পেটটা সাফ করে রাখেন, খাবার পাতে সকালে আড়াই সেরা পুকুরে রুই মাছের মুড়ো, আর রাতে পাঁঠার মাথা ওঁর নিত্যি বরাদ্দ। দেখলেই মনে হয়—যেন চ্যবন ঋষি কলিযুগে আবার কায়া ধরে এসেছেন! এমন যাঁর সখ আর সামর্থ্য, তিনি সব ছেড়েছুড়ে ব্রহ্মচারী হবেন কি দুঃখে বলুন ত? স্পষ্টই ত বলেন—ওবাড়ীতে যারা আছে, সুখেই থাকবে, কোন কষ্ট ত কারও রাখিনি, তবে আমি কেন শেষ জীবনটাকে সার্থক না করি?

সুন্দর মুখখানা আরক্ত করে নিরলা কথাগুলির উত্তর দিল: হ্যাঁ, নিজের শেষ জীবনটাকে সার্থক করবার জন্যে একটা মেয়ের সারা-জীবনকে ব্যর্থ করতে হবে বৈকি! এর ওপরে আর কি কথা থাকতে পারে?

নির্বাক দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ নিরলার দিকে চেয়ে থেকে চাপলি জোরে একটা নিশ্বাস ফেলে বলল: এ! আমি কি তাহলে এতক্ষণ

বেনা বনে মুক্তো ছড়ালুম ? আমার অত কথা, অত যুক্তি, অমন সব এক্‌জাম্পল মাঠে মারা গেল—য়্যাঁ !

বিদ্যুৎচমকের মত নিরলার মুখে হাসির একটা তীক্ষ্ণ রেখা ফুটে উঠল। সেই হাসির ঝিলিকের ভিতর দিয়ে জ্বালা ধরাবার মত স্বরে সে বলল : যেখানে সার থাকে না, আড়ম্বরই সেখানে বেশী দেখা যায়। এ সব বাজে ; যাদের সত্যিকার চোখ নেই, তারাই এতে মজে। আমি বরং একটা শ্লোক লিখে দিচ্ছি, তোমার ঐ দাদাটিকে সেটি পড়িয়ে শুনিও, উপকার হবে হয়ত।

চাপলি : শোলোকটি শুনতে পাই ?

নিরলা : নিশ্চয়ই। শোন, আর বলতে বলতে লিখেও দিই।

খাতা পেনসিল কাছেই ছিল, শ্লোকটি দ্রুত হস্তে তাতে লিখতে লিখতে নিজেই আবৃত্তি করল :

নির্ব্বাণ দীপে কিমু তৈল দানং
চৌরে গতে বা কিমু সাবধানম্।
বয়োগতে কিং বনিতা বিলাসঃ
পয়োগতে কিং খলু সেতুবন্ধঃ ॥

মানেটা বুঝেছ ?

চাপলি বলল : খুব ভাল না বুঝলেও একটু একটু বুঝেছি।

নিরলা বলল : ভাল করেই আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি—শোন। কবি এই শ্লোকে বলেছেন—প্রদীপ নিভিয়া গেলে তাতে তেল ঢেলে কোন লাভ নেই। চোর পালালে তারপর সাবধান হয়ে ফল কি ? যৌবন চলে গেলে বনিতা-বিলাসে কোন আনন্দ নেই। জল সরে গেলে সেতু বাঁধবারও প্রয়োজন হয় না।

শ্লোকটির অর্থ বুঝিয়ে দিয়ে খাতা থেকে শ্লোক-লেখা কাগজখানি ছিঁড়ে নিরলা চাপলির হাতে দিয়ে বলল : তোমার দাদাকে দিও এই শ্লোকটি—কাজে লাগতে পারে।

ঘরের বাইরে এতক্ষণে বাড়ীর মেয়ে মহলের প্রায় সকলেই এসে জমায়েৎ হয়েছিল। দরজার আড়ালে তু'পাশে দাঁড়িয়ে কন্যা শিবানী, ছেলে পটল, বিনি, হিমি, সুবি নামে আরও তিনটি মেয়ে ভিতরের কথাবার্তা সব শুনছিল। গৃহিণী সারদাদেবী অবশ্য রান্নাঘরে ছিলেন, কিন্তু এখান থেকে তাঁর কাছে এদের সংলাপের মর্ম পরিবেষিত হচ্ছিল। নিরলার কথাগুলি তাঁর কানে যেন টিকের আগুনের মত ছেঁকা দিতে লাগল। সেখান থেকেই তর্জন করে শাসাচ্ছিলেন: ঝ্যাঁটা মারো মুখে—ঝ্যাঁটা মারো! হতচ্ছাড়ী মস্ত পণ্ডিত হয়েছেন। দাঁড়াওনা—দেখাচ্ছি মজা।

কালিদাস বাবু জানিয়ে গেছেন, ভিতরের ছেলেটিকে এবং বাইরের ঘরে ঘটককে যেন চা ও জলখাবার দেওয়া হয়। শ্লোকের পর্ব শেষ হতেই চাপলির সামনে চা ও জলখাবার এল। চাপলিও বাইরের দিকে তাকিয়ে বাচ্চাগুলিকে ডাকতে লাগল তার খাবারের কিছু কিছু অংশ নেবার জন্যে। কিন্তু নিরলা বাধা দিয়ে বলল: এই ত খাবার, ওদের আবার ডাকাডাকি কেন? ওরা কি না খেয়ে আছে?

চাপলিও এ কথার উত্তরে ঝাঁ করে তার পকেট থেকে একটি মোড়ক বার করে বাইরে চালান করে দিল। বলল: এতে লজেন্স আছে—তোমাদের জন্যেই এনেছি, খাও।

চাপলি জানে, নতুন জায়গায় গিয়ে ছেলে পুলেদের আগে হাত করতে হয়। তাই সে আসবার সময় শশীর কাছ থেকে একটা সিকি চেয়ে নিয়ে আনা তিনেকের লজেনস্ কিনে পকেটে রেখেছিল, এখন সেগুলি কাজে লাগল।

জলযোগ ও চা পানে পরিতৃপ্ত হয়ে চাপলি বলল: এ শ্লোকের জবাব দাদা নিজে এসেই দেবেন আসছে শনিবার বিকেলে।

নিরলা একবার সচকিত হয়ে বলল: তার মানে?

চাপলি মানেটা বুঝিয়ে দিল: আসছে শনিবার দাদা তার বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে আপনাকে পাকা দেখতে আসছেন যে! এ থেকেই বুঝুন, শোলোকে সানবে কিনা! 'বাঘের দেখা' কথাটা শুনেছেন ত? কনের চেহারা চোখে একবার লাগলে, আর পাত্র পক্ষের হাতে দেদার পয়সা থাকলে, সে দেখার ফল কি বাজে হয়—বলতে চান? তারপর—একবার ছুঁলে আর রক্ষে নেই। আর একটি কথা চুপি চুপি বলে যাচ্ছি—প্রথম দর্শনে দাদার কাছ থেকে কি উপহার নেবেন, সেটি ভেবে ঠিক করে রাখবেন। কাল এক সময় এসে জেনে যাব। আচ্ছা বৌদি, আজ তাহলে আসি।

বাইরে থেকেও ডাক আসছিল। আর একবার হেঁট হয়ে নিরলার পায়ে মাথা ঠুকে চাপলি বেরিয়ে গেল।

বাইরের ঘরে হরিশের সংগেও কালিদাস বাবুর কথাবার্তা সব পাকা হয়ে গেল। আসছে শনিবার বিকেলে মুটবিহারীবাবু তাঁর বন্ধুদের নিয়ে কনে দেখতে আসবেন এবং আদান প্রদানও ওদিন কিছু কিছু সেরে রাখবেন—এ সব কথা তাঁর পক্ষ থেকে হরিশও জানিয়ে দিল।

পথে যেতে যেতে চাপলি হরিশকে নিরলার সংগে আলাপের কথাগুলো বলেই, নিরলার লিখে দেওয়া শ্লোকটি পড়ে এবং তার মানেটিও হরিশকে শুনিয়ে দিয়ে মন্তব্য করল: একবারে গেছো মেয়ে স্যার, গাছ থেকে নামিয়ে পোষ মানাতে রীতিমত বেগ পেতে হবে, খালি হাতে এখানে ঘী উঠবে না স্যার—দস্তুর মতন ঘুষ চাই।

হরিশও শুনেছিল, বুড়ো বরের নামে মেয়েটি বিগড়ে আছে; কালিদাসবাবু ত রাজী হয়েছেন, শেষে মেয়েটা না সব বিগড়ে দেয়। তাই, চাপলিকে আবার বলেন: মাছ ত আমরা গেঁথে দিয়েছি, এখন টেনে তুলতে হবে—এইবার তোমার কৃতিত্ব বোঝা যাবে।

চাপলি বলল: সব দিক দিয়েই চেষ্টা করতে হবে। চলুন, মুটুবাবুর সংগে পরামর্শ করে একটা উপায় স্থির করা যাক।

অফিসের খাস কামরায় বন্ধু বান্ধবদের নিয়ে মুটুবাবু তখন মজলিস জাঁকিয়ে বসেছেন। 'আকাশ-কুসুমে'র সুবাসে সবাই মশগুল। মুখরোচক হাল্কা আহার্য্যের সংগে পানীয় চলেছে।

হরিশ ও চাপলি এসেছে—এ খবর পেয়েই মুটুবাবুর 'নিষিদ্ধ' ঘরেই তাদের ডাক পড়ল, সেই সংগে দুখানা কেদারা এবং খাবারের ডিসও এলো। চপ, কাটলেট, ডিমের মামলেট—দামী দামী মুখরোচক খাদ্য সম্ভার। একগাল হেসে চাপলি বলল: আপনার এখানে স্যার এলাহি ব্যাপার! বাজারের নিমকী কচুরী দিয়ে যেমন তেমন খাতির নয়—এমন না হ'লে মেজাজ!

মুটবিহারীবাবু খুশি হয়ে বললেন: কাজটা যদি ভালয় ভালয় হয়ে যায়, এখানে তোমার বারমেসে টিফিন বাঁধা, বুঝলে হে চাপলিচাঁদ? এখন কদ্দূর কি করে এলে বল—শুনি?

চপে কামড় দিয়ে চাপলি বলল: ওদিককার ব্যাপার ত হরিশদা পাকা করে এসেছেন—শনিবার সেটা ফাইন্যাল করবেন আপনারা গিয়ে। আমিও বাড়ীতে সেঁধিয়ে স্যার বৌদির ঘরেই আড্ডা জমাই। ভিতরে তিনি একা, বাইরে একপাল ছোকরা ছুকরি—যেন রাবণের গোষ্ঠী, আড়ি পাততে এসেছে বুঝেই এক কাজ করে ফেলি স্যার! হরিশদা'র কাছ থেকে ভাগ্যিস্ কিছু নিয়েছিলুম—এক ঠোঙা লজেন্স কিনে নিয়ে যাই—সেগুলো ভারি কাজে লেগে গেল। বাইরে ওরা কাড়াকাড়ি করে খেতে থাকে, আর ভিতরে আমাদের কথা চলে।

মুটবিহারী বাবু জিজ্ঞাসা করলেন: কি কথা চালালে—সব বল আমাকে, কিছুই লুকিও না।

খাদ্যগুলি চর্বন করতে করতে চাপলি বলে চলল: লুকোব কেন

স্যার, তাহলে আপনি তাঁর টেমপারেচার জানতে পারবেন কি করে? প্রথমে গিয়েই পদ্মফুলের মত নরম নরম পা দুখানির উপর মাথাটি রেখে ঠুকলুম পেরনাম—সম্বন্ধটাও পাতিয়ে নিলুম 'বৌদি' বলে। অমনি তিনি ফোঁস্ করে উঠলেন—বৌদি তিনি কিসে হলেন! আমিও স্যার তখনি শুনিয়ে দিলুম—দাদার গিন্নী যিনি হবেন, তাঁকে বৌদি ছাড়া আর কি বলা চলে? তার পরেই স্যার, পুরোনো কাসুন্দী ঘাঁটতে সুরু করে দিলেন, বেশ ঝাঁঝিয়ে বললেন—কেন গো, ওঁর বাড়ীতে যে ২নং বৌদি রয়েছেন, তাঁর সঙ্গে আলাপ জমাতে পার না? ভাগ্যিস্ স্যার ২নং বৌদির খবরটা আগে থেকেই কথায় কথায় শুনেছিলুম হরিশদা'র কাছে। তখন মনে মনে একটু ভেবেই এক গল্প ফেঁদে বললুম স্যার—ঐ বৌদিটি'র রোগের ব্যাপার, আর নতুন বৌদির সংগে আপনি যে-সব রাজসিক ব্যাপার করবেন, সেই সব কল্পনা করে—

নুটবিহারীবাবু চমকে উঠে বললেন: কি সর্বনাশ! তুমি ভিতরকার কিছু জাননা, অথচ নিজেই কল্পনা করে—

চাপলির মুখে হাসি ধরে না, বলল: এইখানেই ত বলবার বাহাদুরী স্যার! কথার মালমসলা দিয়ে মিথ্যের পাহাড় সাজিয়ে ফেলা। শুনুন না, কি বলে এসেছি! যদি বোঝেন, ভুল বা অন্যায় করেছি, বলে দেবেন—ঠিক সামলে নেব।...এর পর নুটুবাবু ও বাড়ীতে রুগ্না বড় বৌ ও তার ছেলে পুলেদের সুখে সচ্ছন্দে রেখে, রাজবাড়ীর মতন এক নতুন বাড়ীতে নতুন বৌকে এনে কিভাবে সুখভোগের কল্পনা করেছেন,—অর্থাৎ নিরলাকে যেভাবে সে বুঝিয়ে এসেছে, নুটবিহারীবাবুকেও সেই কথাগুলি শুনিয়ে দিল। তিনিও দুই বন্ধুর সংগে আনন্দে বাহবা দিয়ে উঠলেন। বললেন: সত্যিই তুমি বাহাদুর ছেলে হে! আর সত্যিই, এমনি আশ্চর্য যে, মনে মনে ঐ রুগ্না স্ত্রীটির সম্বন্ধে যা স্থির করে রেখেছি—এ পর্যন্ত কাউকে বলিনি,

তুমি কিন্তু গণৎকারের মত সে সব কথা বলে, ঐ বিশ্রী দিকটায় দিব্যি পলেস্তারা দিয়েছ হে! যাক্, তার পর?

মুখখানা কিঞ্চিৎ বিকৃত করে চাপলি জবাব দিল: কিন্তু স্যার যতই বলি—ভবি ভোলবার নয়! এক কথাতেই তিনি আমার সব যুক্তিই নস্যাৎ করে দিয়ে বললেন—তোমার দাদা নিজের শেষ জীবনটুকু সার্থক করবার জন্যে একটা মেয়ের সারা জীবনটি নষ্ট করতে চান! এর পর যা করলেন, সেও একটা নাটুকে ব্যাপার স্যার!

কি রকম?

আমি যখন যাই, রেডিওর গান লিখছিলেন শুনে শুনে—খাতা পেনসিল তাঁর কাছেই পড়েছিল, তখনি খচ্ খচ্ করে এই শোলকটি লিখে দিয়ে আমাকে বললেন—তোমার দাদাকে দিও।

পকেট থেকে সেই শ্লোকলেখা চিরকুটখানি বার করে চাপলি নুটবিহারীর হাতে দিল। কিন্তু মুক্ত কণ্ঠে শ্লোকটি পড়তে পড়তে তাঁর গলা ধরে এল। ভারি গলায় বললেন: অত কথাবর্তার পর, সব কথা শুনে নিয়ে মোক্ষম অস্ত্র হেনেছে ত?

চাপলি বলল: আমিও মোক্ষম জবাব দিয়ে এসেছি স্যার! আসবার সময় বলে এসেছি—'আসছে শনিবার দাদা ত তাঁর বন্ধু বান্ধবদের নিয়ে আসছেন আপনাকে দেখতে, সেই সময় এ শোলকের জবাব তিনি নিজেই দেবেন।' আরো বলেছি স্যার—'বাঘের দেখা বলে কথা আছে শুনেছেন ত! তাহলেই বুঝুন—দাদার চোখে যখন পড়েছেন, রেহাই নেই; সেই বুঝে মনকে তৈরী করুন বৌদি, তার ফল ভালই হবে।'

উল্লাসে উৎফুল্ল মুখে নুটবিহারীবাবু বললেন: বা! ফিনিসিং টাচ্টা ত ভালোই দিয়েছ হে! এখন শ্লোকের একটা জবাব চাই—কি বল?

চাপলি বলল: হ্যাঁ স্যার, দিব্যি জোরালো জবাব, শুনেই যেন

ইয়ে হয়ে যান বৌদি! রামহরি বাবু বললেন: ওর জন্যে ভাবনা কি? বাজারে কবির ত ছড়াছড়ি। একজন ছোকরা কবিকে আনিয়ে একটা কবিতা লিখিয়ে নিলেই হবে, গোটা কুড়ি টাকা দিলেই—

চাপলি এখানে বাধা দিয়ে বলল: কবি দিয়ে হবে না স্যার, কাব্যির চেয়ে এখানে প্র্যাকটিক্যাল এলেম চাই স্যার! দশটা টাকা আমাকে দেবেন, এমন জবাব এনে দেব, শুনলে তর হয়ে যাবেন। আর বৌদি যেই শুনবেন—দাদা নিজেই কবিতাটি বেঁধেছেন, চমকে উঠবেন।

মুটবিহারীবাবু বললেন: সেই ভালো, তোমার ওপরেই ঐ ভারটি দেওয়া গেল। এর দরুণ দশটা টাকা, আর—ঐ যে বললে, বাড়ীর ছেলে মেয়েদের মিষ্টিমুখ করিয়েছ, ঐ বাবদে গোটা দশেক টাকা তোমার পকেটে রাখবে, যা যা কেনবার কিনবে। ভাল কথা, জজসাহেবের সম্বন্ধে কোন কথা—

চাপলি ঝাঁ করে জবাব দিল: না স্যার, গৌরচন্দ্রিকা করতেই ত আজকের দিনটা গেছে, ওর মধ্যে জজসাহেবের কথা তোলবার আর ফুরশদ পাইনি। তবে এখনো ত যেতে হবে—কালও যাচ্ছি, এরই মধ্যে সব ঠিক করে নেব।

মুটবিহারী বললেন: সেই ভাল।

হরিশ এতক্ষণ নিবিষ্টমনে খাদ্যগুলির সদ্ব্যবহার করছিল। এই সময় বলল: জজসাহেব এখন তামাদি হয়ে পড়েছেন—আপনার সংগে কথা যখন সব পাকা হয়ে গেল,। শনিবারের মধ্যে আপনি কেবল কনের কাকীর জন্যে এক ছড়া হার, আর কাকার জন্যে একটি হাজার নগদের ব্যবস্থা করে রাখবেন। এর পর জজসাহেব আর কি করবেন?

চাপলি জিজ্ঞাসা কলল: আর বৌদির জন্যে কি করবেন? তাঁর হাতেওত কিছু—

নুটবিহারী বললেন : আরে, তাকে ত গহনা দিয়ে মুড়ে আনতে চাই, কিন্তু সেটা বিয়ের রাতে হলেই ভাল হয়না ?

চাপলি বলল : আমি কিন্তু বৌদিকে বলে এসেছি স্যার—আমার দাদার মতন দেনেওলা লোক এ সহরে আর দুটি নেই। এখন শনিবার দিন যখন আপনাকে দেখতে আসছেন, আপনিই বলে দিতে পারেন—কি উপহার পেলে খুশি হবেন। ভেবে চিন্তে ঠিক করে রাখবেন, আমি কাল আবার আসছি জেনে যাব।

হরিশ বলল : কথাটা শুনে আমি প্রথমে চটে গিয়েছিলুম ; কিন্তু পরে ভেবে দেখলুম—এটাও মোক্ষম চাল ! মেয়েটি যদি একবার হাত বাড়িয়ে কিছু নেয়, তাহলে ত বনেদ পাকা হয়ে গেল, আর ভাবনা কি ?

সাতকড়িবাবু এই সময় প্রশ্ন তুললেন : যদি মোটা রকম কিছু চায় ? এই ধর, যদি আবদার ধরে—হীরের বালা, মুক্তোর হার, এমনি—জুয়েলারী গহনা একসেট চাই ? সে'ত ৫০ হাজারের ধাক্কা !

নুটবিহারীবাবু সহাস্যে বললেন : চায় যদি, আমি তাতে পেছুব নাকি ? আমি যখন এই মেয়েকে পছন্দ করেছি, টাকার জন্যে আটকাবে না। আর মেয়েকে গহনাপত্র দেওয়া মানেইত সে সব তার নিজের সংগে আসবে। এখানে খরচ করতে আটকাবে কেন ? বেশ, তুমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে পার—আসছে শনিবার প্রথম দর্শনে কি উপহার আমার কাছ থেকে তিনি চান—আমি তাই দেব।

এরপর নুটবিহারীবাবু চাপলিকে কুড়িটি টাকা দিয়ে বললেন : ঐ শ্লোকটির জবাব, আর তোমার হাত খরচার জন্য আপাততঃ রাখ। এর পর দরকার হলেই জানাবে, দেওয়া-থোয়ার ব্যাপারে আমার হাত খুব দরাজ—বুঝলে ?

আহ্লাদে আটখানা হবার মত ফুলে উঠে চাপলি বলল :

আপনাকে দেখেই বুঝেছিলুম স্যার, কি রকম মেজাজী মানুষ আপনি। এখন আপনার কাজটা উদ্ধার করতে পারলে তবেই আমার নিষ্কৃতি স্যার! আর কোন দিকে মাথা দিইনি স্যার—এই নিয়েই পড়ে আছি।

বন্ধু রামহরি এই সময় সহাস্যে বললেন: তোমার কাজের শেষ এখানেই নয় হে! মুটুবাবুর কাজটা উদ্ধার হলেই, আমাদের তরফ থেকেও একজোড়া কাজ পাবে।

চাপলি বলল: হরিশদার মুখে শুনেছি স্যার—আপনাদেরও ঘাড়ে নতুন রোঁ উঠেছে, আমি স্যার ও-সব চিনি। আচ্ছা, রাত হয়েছে, এখন তাহলে চলি!

মুটবিহারীবাবু বললেন: আরও একটা আশার কথা মনে রেখো মাষ্টার চাপলি! বিয়ের পর হরিশ বাবুরা যেমন মোটা-রকমের একটা বিদেয় পাবেন, সেই অনুপাতে তোমার জন্যে আলাদা বিদেয়ের ব্যবস্থা হবে। আর, এখন খুচরো-খাচরা যা দিচ্ছি—সেগুলো নগদা বিদেয়ের সামিল মনে করবে, ও সবের হিসেব পত্তর নেই।

হাত কচলাতে কচলাতে চাপলি বলল: আপনার মেজাজের মতই কথা বলেছেন স্যার, এর ওপর আর কথা নেই। তাহলে এখন চলি স্যার, কালকের খবর এই সময় এসে দেব। ওঠ হরিশ দা!

মুটবিহারী আড়চোখে হরিশকে লক্ষ্য করে বললেন: হরিশদা তোমার পা ঘঁষছেন দেখতে পাচ্ছনা হে! তুমি যখন কিঞ্চিৎ নগদ বিদায় পেলে, আর—এক যাত্রায় ওঁর ফল পৃথক হবে? সে হতে পারে না। এই নাও—

পকেট থেকে দশ টাকার এক খানি নোট বার করে মুটবিহারী বাবু হরিশকে ইশারায় কাছে এনে তার হাতে গুঁজে দিলেন।

এতক্ষণে সব দিক দিয়ে মধুরেণ সমাপয়েৎ হলো।

তেরো

শঙ্করের সঙ্গে আলাপ করে—তার নিজের অন্তরের কথা, তার অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি-পিতার পরিচয়, সব জানতে পেরে এক দিক দিয়ে ভীমরুল যেমন খুশি হয়েছে, আর এক দিকে তেমনি বিস্মিত এবং চিন্তিত হয়েছে। খুশির কারণ বোঝা যায়, নিরলা মেয়েটিকে বুদ্ধি খেলিয়ে শঙ্করের হাতে তুলে দিতে পারলে, বুড়ো বরের গ্রাস থেকে তাকে বাঁচানো হয় এবং তাতে কন্যাপীঠের পণ রক্ষার সঙ্গে ভীমরুলেরও হুলের মান থাকে। কিন্তু শঙ্কর যে মাননীয় মানুষটির পুত্র, তাঁর নাম ও পূর্বের পেশার কথা শুনে ভীমরুলকে চঞ্চল হতে হয়েছে, তার মুখে পড়েছে চিন্তার ছায়া ; সে ভাবে—জজসাহেব কি এ বিবাহে রাজী হবেন ?

শঙ্করও শঙ্কিত হয়ে ওঠে—সত্যিই ত, এ প্রশ্ন যে তার মনে ওঠেনি একটিবারও। বাবা কি এ বিয়েতে রাজী হবেন ? সে তখন এই নিরলার প্রসঙ্গে তার বোন রেখার সঙ্গে বাবার যে সব কথা হয়েছিল, সবই শুনিয়ে দিল ভীমরুলকে। কিন্তু সে সব কথা শুনে ভীমরুল বলল : এ থেকে ত বোঝা যাচ্ছে না,—নিরলা মেয়েটিকে তিনি তোমার জন্যেই সংগ্রহ করতে চান ! তার দুঃখের কথা শুনে হয়ত দুঃখমোচনের সংকল্প করেছেন—কোন সৎপাত্রের সন্ধান করে তার হাতে তুলে দিবেন—এর জন্য কিছু খয়রাত করাও সম্ভব হতে পারে।

শঙ্কর বলল: দেখুন, বাবার সঙ্গে আমার বোন রেখার সব কথাই হয়, সে ব্যাপারটা আরো ভালোভাবে জেনেছে। তা ছাড়া রেখা কন্যাপীঠের সেক্রেটারী ; আপনি যদি একবার রেখার সঙ্গে—

শঙ্করের উদ্দেশ্যটি উপলব্ধি করেই ভীমরুল বললেন: বেশ, আমার কোন আপত্তি নেই। তাঁর সঙ্গে দেখা হলে সত্যই এ-ব্যাপারটির ওপর কিছুটা আলো পড়তে পারে।

উৎফুল্ল মুখে শঙ্কর বলল: তাহলে আর দেরী করে কাজ নেই, আজই চলুন। এখন সে বাড়ীতেই আছে।

ভীমরুল জিজ্ঞাসা করল: এই বেশেই বাড়ীতে যাবে?

শঙ্কর উত্তর করল: হ্যাঁ। রেখা ত সব জানে, আর বাড়ীতে আমারই প্রতীক্ষা করছে সে—আপনি চলুন।

আজ আর ফটক খোলবার জন্য সেদিনের মত কৌশল প্রয়োগের প্রয়োজন হলো না। কড়া নাড়তেই রেখা ফটক খুলে দিল। কিন্তু ছদ্ম পিয়নের পিছনে অপরিচিত মানুষটিকে দেখে চমকে উঠল। শঙ্কর এগিয়ে গিয়ে চাপা গলায় বলল: কন্যাপীঠ সম্পর্কে বিশেষ প্রয়োজনে ইনি তোমার সঙ্গে পরামর্শ করতে এসেছেন। অল্পক্ষণের আলাপে ইনি আমাকে মুগ্ধ করে দাদার স্থানটি অধিকার করেছেন। এঁর চেহারা এখানে নকল হলেও, আসল পরিচয় পেলে তুমিও খুশি হবে। ইনিই—ভীমরুল।

এক সঙ্গে উভয়েই যুক্ত কর ললাটে ঠেকিয়ে পরস্পরকে অভিবাদন করল। রেখা সহাস্যে বলল: আপনার সঙ্গে আমাদের 'চোর-কামার' সম্বন্ধ হলেও আপনার নাম আমাদের কন্যাপীঠের টপে! চলুন—ভিতরে বসে আলাপ করি।

তিনজনে ড্রয়িংরুমে এসে বসবার পর কন্যাপীঠের উদ্দেশে ভীমরুলের প্রেরিত চিঠি নিয়ে প্রথমেই আলোচনা আরম্ভ হলো। কথা-প্রসঙ্গে রেখা বলল: আপনার চিঠিখানা ঠিক সময়ে এসে

পড়ায় কন্যাপীঠের বৈঠকে রীতিমত একটা আলোড়ন তোলে। নামটা নিয়ে নানারকম মন্তব্য উঠলেও, আপনার জোরালো কথাগুলো প্রত্যেকের মনের ওপর প্রভাব সৃষ্টি করে। সেই জন্যেই ত আমাদের প্রেসিডেন্ট নিজে আপনার সম্বন্ধে তদন্তের ভার নেন।

ভীমরুল জিজ্ঞাসা করলেনঃ তদন্ত করে তিনি কি জেনেছেন, সেটাও বৈঠকে বলেন নি?

মৃদু হেসে রেখা বললঃ আপনার আস্তানা, ছোকরা বেয়ারা, আসবাবপত্র, মায় নিজের পছন্দমত রঙটির কথা থেকে আপনাদের সংলাপের সব কথাই লীলাদি অন্তত আমাকে বলেছেন; যেহেতু, আমি সেখানে সেক্রেটারী। তবে বৈঠকে সব কথা বলবার ত কোন সার্থকতা নেই, তাই সবার সামনে আপনার চিঠির আর প্রকৃতির সমর্থন করে বলেছেন—আপনি নাকি তাঁর অনুরোধে বিয়েপাগলা বুড়োদের সমর্থক কন্যাদায়োদ্ধার সমিতির মুখোস খুলে দিতে সম্মত হয়েছেন।

ভীমরুল বললেনঃ তাহলে ত দেখছি—আমার সম্বন্ধে আপনার কিছুই অবিদিত নেই!

রেখা কিছু কুণ্ঠার সঙ্গে অনুরোধ করলঃ আমার দাদা যখন আপনাকে দাদা বলেছেন, আমাকেও ছোট বোনটি ভেবে সেই ভাবেই কথা বলবেন। আর একটি কথা, লীলাদির সঙ্গে যখন আপনার দেখা হয়, চেহারা আর এক রকম ছিল শুনিছি, তা ছাড়া পূর্ব বঙ্গের ভাষায় তাঁর সঙ্গে কথা বলেছিলেন। কিন্তু এখন আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে—কে বলবে আপনি পশ্চিম বঙ্গের লোক নন? তাই বলছি, যদি এখানে আপনার আসল চেহারাটি—

কথাটায় বাধা দিয়ে ভীমরুল তাড়াতাড়ি বললেনঃ ঐ অনুরোধটি এখন রাখতে পারবনা বোন, তাতে আমাদের ক্ষতিই হবে। তবে একদিন দাদার আসল চেহারা অবশ্যই দেখতে পাবে আমাদের কার্য্যোদ্ধারের শুভ দিনটিতে—তার আগে নয়।

একটু থেমে, ভীমরুলের মুখখানার উপর আর একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সঞ্চার করে রেখা বলল : বেশ, তাই হবে।

ভীমরুলও সঙ্গে সঙ্গে একটু হেসে বলল : তবে একথাও বলে রাখছি বোন, জায়গা বুঝে আমার চেহারা আর গলার স্বর নকল করলেও, আমার সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হতে পার। এর সঙ্গে কোন কিছু জাল জোচ্চুরী বা কোন রকম রাষ্ট্র-বিপ্লবী ভাবের সম্বন্ধ নেই। বরং বলতে পারা যায়—রাষ্ট্রদ্রোহী বা সমাজধর্মের অনিষ্টকারীদের বিরুদ্ধেই আমার বিপ্লব।

রেখা সহাস্যে বলল : লীলাদির কাছে এ কথা আগেই শুনেছি। যাক্, এখন আপনি কি জানতে চান বলুন ?

অপাঙ্গে ছদ্মবেশী শঙ্করের দিকে তাকিয়ে ভীমরুল বললেন : এখানে আর এ যন্ত্রনাভোগ কেন ? এখন ধড়াচুড়ো খুলে হাত মুখ ধুয়ে কাপড় ছেড়ে এসে বস। জজসাহেবের দিবা নিদ্রা ভাঙবার আগেই আমাকে সরে পড়তে হবে।

সহাস্যে রেখা বলল : দুই নকলনবিসের মুখ শোঁখাশোঁখি কি করে হলো, জানতে কিন্তু আগ্রহ হচ্ছে।

ভীমরুল বললেন : শঙ্কর ভোল বদলে আসুক, ততক্ষণে আমি সে গল্পটা তোমাকে শোনাচ্ছি, সত্যিই উপভোগ করবার মত কাহিনী।

এরপর ভীমরুল হেদোর বাগানের কাহিনীটা আগাগোড়া রেখাকে শুনিয়ে দিল। শুনতে শুনতে সে ত হেসেই অস্থির! প্রসঙ্গটা শেষ হ'লে একটু গম্ভীর হয়ে বলল : দেখুন, দাদাকে বরাবরই আমি মুখচোরা বলে জানতুম। এক কবিতা পড়বার সময় ওর চোখে মুখে যা কিছু সপ্রতিভ ভাব ধরা পড়ত, নৈলে কোন দিকেই দাদার মধ্যে কোন ব্যাপার নিয়ে কিউরিওসিটীর ভাব লক্ষ্য করিনি। কিন্তু ঐ নিরলার ব্যাপারে দাদা যেন একেবারে বদলে গেছেন! অবিশ্যি, কন্যাপীঠ থেকে ওঁকেও আপনার মত 'কো-আপ্ট্' করে নেওয়া হয়,

আর নিরলা দেবীর চিঠিখানা ঐ ঠিকানায় নিয়ে গিয়ে 'ভেরিফাই' করিয়ে আনবার ভারটিও উনি পান। আমার ত ভয় ছিল, 'ভেরিফাই' করতে গিয়ে দাদা নিজেই না 'ভিক্‌টিম' হয়ে যান! কিন্তু সেই দাদা পিয়নের বেশে এখানে ফিরে এসে আমাকে পর্য্যন্ত অবাক করে দেন। তখন কি জানতুম, উনি ডুবে ডুবে জল খান—মেকআপ্ কমপিটিসনে প্রাইজ পেয়েছেন। তার ওপর, আপনাকে তাহলে বলি—নিরালার ব্যাপারে মনে মনে তাকে ভালোও বেসেছেন—

উল্লাসের সুরে ভীমরুল বললেন: গুড্! তুমিও তাহলে তোমার দাদার মনের খবরটি জেনেছ! ভাল, ভাল, তাহলে আমাকে আর বেশী কিছু কাঠখড় পোড়াতে হবে না; একবারে ভাইট্যাল পয়েণ্টস্ নিয়ে আমাদের আলোচনা আরম্ভ হবে।

এই সময় শঙ্করও ছদ্ম বেশ পরিবর্তন করে ধুতি জামা পরে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে যথাস্থানে এসে বসল।

ভীমরুল বললেন: ব্যাপার যা বুঝলাম, গৌরচন্দ্রিকার প্রয়োজন নেই, এখন কাজের কথা হোক। শঙ্কর নিরলাকে ভালবেসেছে, বিয়ে করতে চায়। নিরলারও তাতে আপত্তি নেই। এখন কথা হচ্ছে, জজসাহেব এতে রাজী আছেন কিনা? শঙ্কর বলেছে, তোমার বাবার মনের খবর তুমি নাকি অনেকটা রাখ, এখন এই নিরলা মেয়েটির সম্বন্ধে তোমার বাবার মনোভাবটি কি রকম, জানতে পারি?

রেখা বলল: তাহলে বলি শুনুন—খবরের কাগজে পোষ্টবক্স-নম্বর দিয়ে আপনি একটি ছোট বিজ্ঞাপন দেন মনে আছে? তাতে লেখা থাকে—'বিয়ে বা ব্যবসার নামে যে সব অনাচার হচ্ছে, ভীমরুল তাদের প্রতিকারের ভার নিতে প্রস্তুত।' আমি ঐ বিজ্ঞাপনটির গায়ে লাল পেনসিলের দাগ দিই প্রথমে। বাবা তাই দেখে আমাকে জিজ্ঞাসা করেন—বিজ্ঞাপনটিতে আমি দাগ

দিয়েছি কেন? আমি জবাব দিই—এই ভীমরুল আমাদের কন্যা-পীঠেও চিঠি দিয়েছেন বলে, বিজ্ঞাপনে দাগ দিয়ে রেখেছি। এরপর বাবা হাতের কাগজখানি আমাকে দেখতে দিলেন, আমি তাতে কন্যাদায়োদ্ধার সমিতির বিজ্ঞাপনটি দেখলুম। বাবা তখন বললেন—'এই দেখ, এরা অরক্ষণীয়া মেয়েদের বিয়ে দিয়ে অভিভাকদের দায়োদ্ধার করতে চায়, আর তোমরা চাইছ—বিয়ে বন্ধ করতে।' তখন আমাকে বাধ্য হয়েই নিরলা দেবীর প্রসঙ্গটা তুলতে হলো। বললুম—এই সমিতির বিরুদ্ধে সাংঘাতিক অভিযোগ করে একটি মেয়ে আমাদের সমিতিতে একখানা চিঠি পাঠিয়েছে। সে আমাদের সাহায্য চেয়েছে। সবকথা শুনে বাবা হেসে বললেন—'অমনি ভীমরুলও পাখা মেলেছে—তবে আর ভাবনা কি?' এর পর তিনি নিরলা দেবীর নামটি শুধু নোট বুকে টুকে নেন।

ভীমরুল জিজ্ঞাসা করলেন: আর, বাড়ীর ঠিকানাটি?

রেখা বলল: না, সে কথা তিনি সেদিন জিজ্ঞাসা করেন নি। এটা হলো প্রথম দিনের কথা। এর দিন কতক পরে একদিন আমাকে তাঁর ঘরে ডেকে বাবা হঠাৎ নিরলার সম্বন্ধে এমন কতকগুলি কথা জিজ্ঞাসা করলেন, সেক্রেটারী হিসেবে আমি সেখানে জবাব দিতে পারিনা। আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে বাবা নিজে থেকেই বললেন যে, তিনি জানেন এ সব কথার জবাব দেওয়া ঠিক নয়। কিন্তু ঐ কন্যাদায়োদ্ধার সমিতিটার রহস্য তাঁকে ভেদ করতে হবে। সেই জন্যেই নিরলাদের বাড়ীর ঠিকানা, আর চিঠিতে যে সব কথা সে লিখেছিল, সেগুলো তাঁর জানা দরকার। তখন বাধ্য হয়েই আমাকে সব কথাই বলতে হলো। বাবা নোটবুকে সব টুকে নিয়ে বললেন—'এখন আমার পক্ষে এ ব্যাপারটার রহস্যভেদ করা সম্ভব হবে।' এরপর এই ব্যাপার নিয়ে আর কোন কথা বাবার সঙ্গে হয় নি, নিরলার খবরও জিজ্ঞাসা করেন নি।'

ভীমরুল জিজ্ঞাসা করলেন: আচ্ছা, তোমার দাদার বিয়ের সম্বন্ধে কোন কথা তোমার বাবার সঙ্গে কোনদিন হয়েছে?

রেখা বলল: না। দাদা বিয়ে করবেন না—এই ধরণের একটা কথা উঠেছিল, বাবাও শুনেছিলেন, কিন্তু নিজে কিছুই বলেন নি।

ভীমরুল পুনরায় প্রশ্ন করল: কথাটা অশোভন হলেও তুলছি—প্রয়োজনের খাতিরে। তোমার বাবা এই বয়সে আর একবার বিয়ে করতে ইচ্ছুক,—এই ধরণের কোন কথা কোন দিক থেকে তোমাদের কানে এসেছে?

এখানে ভ্রাতাভগিনী দুজনেই এক সঙ্গে প্রতিবাদের ভংগিতে জানাল: না, না—

কিন্তু কন্যাদায়োদ্ধার সমিতিতে ওঁর যাতায়াত আছে, সেখানে নিরলাদেবীর ফটো দেখে পছন্দ করেছেন, এমন খবরও আমি পেয়েছি। এখন যদি বলি, মুটবিহারী বাবুর মত উনিও একজন প্রার্থী এবং নিরলাকে নিয়ে ওঁদের মধ্যে রেশারেশি চলেছে—এ কথাও······

ভীমরুলের কথায় বাধা দিয়ে শঙ্কর একটু বিরক্ত হয়েই বলল: আপনি যে খবরগুলোর কথা বলছেন—কন্যাদায়োদ্ধার সমিতির রহস্যভেদ সম্পর্কেই উঠে থাকবে। ওর ওপর আপনি গুরুত্ব দেবেন না।

ক্ষণকাল চুপ করে থেকে ভীমরুল বললেন: তাহলে আমরা কি করব? নিরলাকে উনি যে পছন্দ করেছেন, অনিন্দ্য সুন্দরী বলে ওঁর চোখে ধরেছে—তাতে সন্দেহ নেই। এ অবস্থায় শঙ্করের সঙ্গে তার বিয়ের প্রস্তাবটি যদি তোলা যায়—

মৃদু হেসে রেখা বলল: তাহলে হয় ত কার্যোদ্ধার হতে পারে—কিন্তু বেড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধতে এগুবে কে—সেইটে হচ্ছে সমস্যা।

ভীমরুল বললেন: আরও এক সমস্যা থাকতে পারে—সেটি হচ্ছে

পণের ব্যাপার। এদিক দিয়ে জজসাহেবের মতিগতি কি রকম, সে খবর জানো ?

রেখা বলল : এ সম্বন্ধে বাবার সঙ্গে আলোচনার কোন রকম সুযোগ পাইনি। তবে আমাদের কন্যাপীঠ যে পণপ্রথার উচ্ছেদ করতে চায়, যারা ছেলের বিবাহে পণ নেবার জন্যে ধনুর্ভঙ্গ পণ করে বসেছে, তাদের সে সঙ্কল্প ভেঙে দেওয়াই আমাদের পণ ; এ খবরও বাবার অজানা নয়। উনি যদি পণপ্রথার সমর্থক হতেন, তাহলে নিশ্চয়ই আমাকে কন্যাপীঠের সংস্পর্শে যেতে দিতেন না, নিষেধ করতেন—বাধা দিতেন।

তিন জনেই কিছুক্ষণ চুপ করে ভাবতে লাগলেন। সহসা ভীমরুল সোজা হয়ে বসে বললেন : ভাল কথা, একটা দিকে কিন্তু ফাঁক থেকে গেছে। নিরালা দেবী অবিশ্যি শঙ্করের নাম এবং তাঁর প্রতি সহানুভূতির কথা শুনেছেন। কিন্তু শঙ্কর তাঁর সামনে গেলেও, এ পর্যান্ত শঙ্করের আসল মূর্তিখানি দেখবার ফুরসদ তিনি পান নি। এখন শঙ্করের ওপর তাঁর কি রকম ধারণা, কিংবা তিনি তলে তলে আর কাউকে ভালোবাসেন কিনা—সেটাও ত আমাদের জানা দরকার ?

শঙ্কর কথাটা শুনে নীরবে মুখখানা নীচু করল। রেখা মুখখানা তুলে সপ্রতিভ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল : আপনি তাহলে কি করতে বলেন ?

ভীমরুল বললেন : এরপর শঙ্করের প্রথম কাজ হচ্ছে—দিব্যি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন পরিচ্ছদ পরে একদিন নিরলা দেবীর সামনে হাজির হওয়া, ছদ্মবেশী পিয়নটি যে শঙ্কর—এই সূত্রে তার ত্যাগ স্বীকারটি দেখে তখন তাঁকে ভেঙে পড়তেই হবে।

শঙ্কর এখানে বিপন্নের মত মুখভঙ্গি করে বলল : তবেই হয়েছে !

রেখা বলল : কেন, মুখোমুখী হয়ে সহজ ভাবে আলাপ করতে ভয় পাচ্ছ নাকি ?

ভীমরুল বলল : আরো আগে এটা উচিত ছিল, যাই হোক—খুব শীগ্‌গীর এ কাজটি করা চাইই,—এর ওপর তোমার ভাগ্য নির্ভর করছে। এর পর, জজসাহেবের সঙ্গে বোঝাপড়া করা যাবে। তবে আমি বলছি ভায়া, নিরলার মন যদি জয় করতে পার, আমি তাহলে ঐ নিরলাকে দিয়েই বিরোধীপক্ষকে ছাতার নাচিয়ে ছাড়ব।

ভীমরুলের যুক্তি ভাই-বোন উভয়েরই মনে ধরল। রেখা বলল : আপনি যখন বড় ভায়ের মতই দাদাকে দেখছেন, তখন ওঁর আশা সার্থক হবেই। আপনার সব দিকেই দৃষ্টি, সত্যই আপনি আশ্চর্য্য মানুষ।

'আমাকে বাড়িয়োনা, নিজের খ্যাতি শুনে লাভ নেই আমার—কাজ সিদ্ধির দিকেই যত লোভ। আচ্ছা—আজ উঠি।' বলেই ভীমরুল উঠে পড়লেন, কিন্তু রেখা তখনি বাধা দিয়ে পুনরায় জোর করে আসনে বসিয়ে দিয়ে বলল : না, না, সেটি হচ্ছে না—দাদাকে যখন নিজেদের গরীবখানায় পেয়েছি, কিছু খাতির না করে ছাড়ছি নে। চা-জল খাবারের সময় হয়েছে, ভাই-বোনের সঙ্গে বসে খাওয়া চাই।

রেখার এই আন্তরিকতাপূর্ণ অনুরোধ উপেক্ষা করা ভীমরুলের মত শক্ত মানুষের পক্ষেও সম্ভব হলো না।

এ বাড়ীতে বৈকালী জলযোগের আহার্যগুলিও রুচিকর এবং উপাদেয়—বিশুদ্ধ ঘৃতে ভাজা লুচি, আলু-কুমড়ার ভাজি, আলুর দম, ডিম সিদ্ধ ও কড়াপাক সন্দেশ। ভীমরুল আহার্য্য মুখে দিয়েই বললেন : জজ সাহেবদের জলখাবারের মেনু আমার জানা আছে।

শঙ্কর বলল : আমাদের বাড়ীর এই আলু-কুমড়োর ভাজি যিনিই খেয়েছেন, তারিফ না করে পারেননি। তা বলে ভাববেন না যেন আমাদের পাচক ঠাকুরের কীর্তি এটি—বাবা নিজে কাছে দাঁড়িয়ে থেকে শিখিয়ে দিয়েছেন—কি কি মসলা দিয়ে কেমন করে এই 'ভাজি' রাঁধতে হয়। এটি হচ্ছে পশ্চিমী রান্না, আলুর দমটাও তাই।

ভীমরুল বললেন : আমার বক্তব্যও তাই। জজসাহেবদের বাড়ীর এগুলো একচেটে রান্না, আমার মুখে এর তার লেগে আছে কিনা!

রেখা বলল : তাহলে দাদার বুঝি জজসাহেবদের সঙ্গে খুব মেলামেশা আছে?

ভীমরুল বললেন : তা নৈলে ও কথা বলতে পারি?

খাওয়ার পরেই কি মনে করে শঙ্কর ঝাঁ করে উঠে গেল এবং একটু পরেই খামেমোড়া একখানা চিঠি এনে রেখার হাতে দিয়ে বলল : নিরলা দেবীর চিঠি। আগেই এখানা দাখিল করা উচিত ছিল। দাদা কিন্তু চিঠির কথা তুলতেই ভুলে গেছেন!

ভীমরুল বললেন : ও কাজ ত তোমার ভায়া, আমার বলতে যাওয়া বেয়াদপি। তারপর, ওচিঠি ত আর আমাদের মধ্যে নতুন বস্তু নয়!

ইতিমধ্যে রেখা খাম খানা খুলে এক নিশ্বাসে চিঠিখানা পড়ে ভাঙা গলায় বলল : ওমা, একি! আসছে শনিবার সেই বুড়ো নিরলাকে পাকা দেখতে আসছে তার বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে? তাহলে উপায়? নিরলা আমাদের কাছে জানতে চেয়েছে—সে ওদিন কি করবে? তাহলে ত এখনি লীলাদির বাসায় ছুটতে হয়। দাদা কি বলেন?

ভীমরুল বললেন : তাঁকে আর ব্যস্ত করে কাজ নেই, বিশেষ করে তিনি যখন নিরলাদেবীর ব্যাপারটা তোমাদের ওপরে ছেড়ে দিয়েছেন, তখন তোমরাই এর নিষ্পত্তি করে ফেল—নিরলা ও-দিন কি ভাবে নিজেকে সামলে রেখে ওদের সঙ্গে কথাবার্তা বলবে। আর সময়ও নেই—কালই তাকে জানাতে হবে। উনি আগে নিজের মনেই নিজেকে চালিয়ে এসেছেন, এখন মুরুব্বী বা সহায় হয়েছেন কন্যাপীঠ, সে ত এ-দিকে তাকিয়ে থাকবেই।

রেখা বলল: তাহলে আর ছুটোছুটির কি দরকার, দাদা যখন উপস্থিত আছেন, উপদেষ্টারূপে আপনিই আজকের পরামর্শ সভা পরিচালনা করুন।

ভীমরুল বললেন: তাই হোক। কালই তাহলে নিরলাকে যুক্তি দেওয়া আর শঙ্করের মুখোস খোলা—দুটো ব্যাপারের নিষ্পত্তি এক সঙ্গেই করা চাই।

শঙ্কর বলল: দাদার জন্যে আর এক প্রস্থ চা আন, নৈলে মাথা খুলবে না দাদার!

ভীমরুল বললেন: ঠিক ধরেছ, তবে চা নয়—ওর বদলে কাফি এক কাপ চাই। আর, জজসাহেবের বাড়ীতে কাফির পাট নিশ্চয়ই আছে!

'দাদা সে-খবরও রাখেন দেখছি। আচ্ছা, এখনি কফির ব্যবস্থা করছি।' কথাগুলি বলতে বলতে ক্ষিপ্রপদে রেখা বেরিয়ে গেল।

শঙ্করের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চেয়ে ভীমরুল বললেন: একখানা কাগজ আনো, আমি আসছে কালকের ব্যাপার থেকে সুরু করে একটা পরিকল্পনা কালি-কলমে ছকতে চাই। তোমাকে কিন্তু খুব শক্ত হতে হবে। উপস্থিত আমাদের হাতে যে সব মাল-মশলা আছে, সেইগুলো নিয়েই ছকটা দাগতে হবে, এরপর নতুন কিছু আসে ত—ছকের ঘর বাড়াতে হবে। নতুবা শুভ দিনটা পর্য্যন্ত আমি লাল কালিতে উজ্জ্বল অক্ষরে লিখে রাখতে চাই—যাতে এ ব্যাপারটাকে আর লম্বা করতে না হয়।

সুশ্রী কফির পাত্র ও সুন্দর পিয়ালাগুলি এসে গেল, রেখা পাত্রে পাত্রে পরিবেষণ করতে লাগল; সঙ্গে সঙ্গে তিনটি মস্তিষ্ক সক্রিয় ও চঞ্চল হয়ে উঠল।

চৌদ্দ

কালিদাস বাবু অফিসে বেরিয়েছেন—ট্রাম ধরবার জন্য হেদোর মোড়ে এসেছেন, এমন সময় চাপলির সঙ্গে দেখা, তার হাতে এক চ্যাংড়া খাবার। কালিদাসবাবুকে দেখেই চাপলি এগিয়ে এসে চ্যাংড়া সমেত হাতটি কপালের দিকে তুলে বলল: এরই মধ্যে আফিসে যাবার জন্যে বেরিয়ে পড়েছেন স্যার?

কালিদাসবাবু বললেন: এরই মধ্যে নয়—সাড়ে ন'টা বাজে। কিন্তু তোমার কি খবর?

একগাল হেসে চাপলি বলল: আপনাদেরই খবর নিতে চলেছি স্যার! কালকে নেহাৎ শুধু হাতে এসেছিলুম, মনটা খুস খুস করছিল; সকালে একটু কাজে বাগবাজার গিয়েছিলুম, ওখানকার গোপালের দোকানের নামকরা খাবার স্যার, বাড়ীর মেয়েদের জন্যে নিয়ে চলেছি। দুঃখ এই—আপনি বেরিয়ে পড়েছেন।

কালিদাসবাবু প্রসন্নভাবেই বললেন: আমার কথা বাদ দাও—অম্বুলে রোগী, ও-সব চলেনা। আবার খরচ করে এসব আনতে গেলে কেন? আচ্ছা, এনেছ যখন—বাড়ী যাও, ওরা আদর করে খাবে।

কালিদাসবাবুকে ছেড়ে হন হন করে চাপলি এগিয়ে চলল গোয়াবাগানের রাস্তা ধরে। বাইরের দরজা এ সময় খোলাই ছিল; ভিতরে গিয়ে চাপলি গলা ছেড়ে হাঁক দিল: কাকীমা

কোথায় গো, এগিয়ে আসুন—আমি ছেলের মতন, লজ্জা করবেন না।

ডাক শুনেই বাড়ীর গৃহিণী মাথার ঘোমটা একটু টেনে এগিয়ে এসে নীরবে দাঁড়ালেন। ঢিপ করে তাঁর পায়ের কাছে একটিবার মাথা ঠুকে চাপলি বলল: এই আফশোসটাই ছিল কাকীমা, কাল আপনার বাড়ীতে কতক্ষণ রইলুম, কিন্তু আপনার শ্রীচরণে মাথা ঠেকাবার আর সময় পাইনি। তাই আজ সকালেই ছুটে এসেছি। আর দেখুন, বাগবাজারের গোপালের দোকানের নোনতা খাবারের নাম শুনেছেন ত, একবার মুখে দিলে আর ভোলা যায় না। গরম গরম ভাজিয়ে এনেছি কাকীমা, এই নিন—খোকা-খুকীদের আগে দিন।

কাকীমা খাবারের চ্যাংড়াটি সানন্দে তুলে নিয়ে বললেন: তারা সব খেয়ে দেয়ে ইস্কুলে যাচ্ছে বাবা, বিকেলে এসে খাবে'খন। তুমি বাবা ও-ঘরে ব'স গে। আমি চা করছি—

চাপলি আহ্লাদের ভাব প্রকাশ করে বলল: হাঁ কাকীমা, চা একটু চাই—

কাকীমা গলা ছেড়ে হাঁক দিলেন: ওরে নির, তোর দেওর এসেছে—ডেকে বসা। বাবা আমার কত খাবার এনেছেন দেখনা—

এদিককার কাজকর্ম সারা হতে নিরলা তার ঘরে গিয়েই বসেছিল, এখনো পর্য্যন্ত তার খবরের কাগজ পড়া হয় নি। কাগজ পড়তে পড়তে কাকীমার ডাক শুনে উঠতে হয় তাকে। জানে, মেজাজ নিয়ে বসে থাকলে অশেষ লাঞ্ছনা সইতে হবে। উঠে গিয়ে চাপলিকে তার ঘরে এনে বসাতে হলো।

চাপলি এক নজরে ঘরখানা দেখে নিয়ে জিজ্ঞাসা করল: খবরের কাগজ পড়ছিলেন বুঝি?

ঘাড় নেড়ে কথাটায় সায় দিয়ে নিরলাও প্রশ্ন করল: এমন অসময়ে যে?

চাপলি সহাস্যে বলল: বা-রে! এ বুঝি অসময় হলো? কাল ত বলেই গিয়েছিলুম—আবার কাল আসব, তাই এসেছি। দু-চারটে কাজের কথা বলেই চলে যাব বৌদি, বেশীক্ষণ আপনাকে ভোগাব না!

ইতিমধ্যে এককাপ চা, এবং এক রেকাবী খাবার এনে কাকীমা বললেন: খাও বাবা! নিরলাকেও জিজ্ঞাসা করলেন: তোর খাবার এখানে আনব, দেওর ভাজে এক সঙ্গে বসে—

কাকীমার কথায় বাধা দিয়ে নিরলা বলল: আমি এখন খাবনা, রেখে দাও।

চাপলি অনুরোধের ভংগিতে বলল: কেন খাবেন না বৌদি? এত যত্ন করে আমি গরম গরম আনলুম আপনাদের জন্যে—

বিরক্তভাবে নিরলা বলল: এ সময় আমার খাবার খাওয়ার অভ্যাস নেই, তাই খাবনা।

'মেয়ের ঢং দেখে বাঁচিনে'—বলে বেজার হয়েই কাকীমা গজগজ করতে করতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

চা ও খাবারের সদ্ব্যবহার করতে করতে চাপলি বলল: কালকে বৌদি একটা খুব দরকারী কথা আপনাকে বলা হয় নি। সেই কথাটা আগে সেরে নিই—কি জানি, যদি ভুলে যাই!

মৃদুস্বরে নিরলা বলল: অত কথা বলে গেলে, ওর পরে আরও কথা আছে নাকি?

চাপলি গলায় জোর দিয়ে বলল: নিশ্চয় আছে। এ-সবকথা কি চট্ করে ফুরোয় বৌদি? এ ত আর ছেলে বেলায় গল্পে শোনা সেই ছড়া নয় যে ফুরিয়ে যাবে! সেই যে—

আমার কথাটি ফুরালো
নটে গাছটি মুড়ালো—

নিজের মনেই হিঃ হিঃ করে হেসে চাপলি নিরলার দিকে তাকাল। নিরলা তার কোমল মুখখানা একটু শক্ত করে বলল: কি কথা তাই বলে ফেল—এত ভনিতার কি দরকার?

চাপলি এখন একটু গম্ভীর হয়ে বলল: দেখুন বৌদি, আমার দাদা আপনার ওপর ঝুঁকেছেন জানতে পেরে, এক বাহাত্তুরে ধড়িবাজও ঝুঁকেছে—তার সাবেক নাম আর পদবীর জোরে আপনাকে যদি বাগাতে পারে! তাই বলতে এসেছি বৌদি—খুব হুসিয়ার! সে লোকটির খপ্পরে যেন খপ করে পা দেবেন না।

নিরলা বলল: পা দেবার মালিক কি আমি—যে হুঁসিয়ার করতে এসেছ? তারপর—'রাইভ্যাল' জুটলেই তাকে ভাগাবার জন্য অমন অনেক কথা বলতে হয়। সে যাই হোক্, তোমার দাদার সেই রাইভ্যালটি কে?

চাপলি বলল: লোকটা আগে পশ্চিমে থাকত, জজিয়তী করত, কলকাতায় আসতে না আসতেই বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ উঠেছে, অমনি সখ হয়েছে কনে চাই—ডাগর ডোগর সুন্দরী কনে। কন্যাদায়োদ্ধার সমিতির মেম্বার হয়েছে, আপনার ফটো দেখে একেবারে মাত হয়ে গেছে। আজ কালের মধ্যেই দেখতে আসছে আপনাকে; তাই বলছি বৌদি—হুঁসিয়ার!

মুখ টিপে হেসে নিরলা বলল: হুঁসিয়ার হতে বলছ কেন? বরং এ লোকটা তোমার দাদার মত ব্যবসাদার নন, জজ ছিলেন। আমার মনে হয় দাঁড়িপাল্লার দুদিকে দুজনকে বসিয়ে ওজন করলে জজসাহেবের দিকটাই ভারী হবে।

চাপলি দেখল কথাটা পেড়ে মুস্কিলে পড়েছে; এখন তাকে প্রতিপন্ন করতে হবে দুজনের তুলনায় মুটবিহারীবাবুই ওজনে

ভারি—সেরা পাত্র। কাজেই জজ সাহেবের দোষ ত্রুটি সব ভেবে ভেবে বলতে আরম্ভ করল। যেমন—লোকটা ভারী কঞ্জুস, হাত দিয়ে জল গলে না; পেনসনের যে টাকা মাসে মাসে পায়, সেইটেই ভরসা, আমার দাদার আফিসের দারোয়ান, চাকর, বেয়ারা, সোফারদের মাইনে দিতে তার দেড়গুণ টাকা খরচ হয়ে যায়। সম্বলের মধ্যে একখানা বাড়ী—তারপর, জোয়ান ছেলে, সোমত্ত মেয়ে, তাদের বিয়ের কথা না ভেবে নিজের জন্যে মেয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছেন!

নিরলা বলল: কিন্তু জজ সাহেবের কাছ থেকে কোন কথাই আসেনি, কিম্বা তোমার মত কোন ভাইকেও তিনি চুকলি কাটবার জন্যে সুপারিশ ধরে পাঠাননি। তোমার দাদাই এখন একা একশো হয়ে পুকুর গুলিয়ে বেড়াচ্ছেন! যাক্, এখন আর কি কথা আছে বল?

এতক্ষণে চাপলির খাওয়া শেষ হলো। চায়ের পিয়ালা ও খাবারের রেকাবী নীচে নামিয়ে রেখে, গেলাসের জলে হাত ধুয়ে বলল: সেই যে কাল বলে গিয়েছিলুম—শনিবার দাদা আপনাকে দেখতে আসছেন, আর ঐ দিনই যাতে পাকা দেখা হয় সে ব্যবস্থাও করবেন। দাদা আপনাকে নিজে থেকে কিছুই না দিয়ে জিজ্ঞেস করবেন—আপনি কি চান? এখন আগে থেকেই সেটা যদি বলেন—কি কি জিনিস আপনার পছন্দ, এই ধরুন—গয়না, কাপড়-চোপড়, জিনিস পত্তর—যা যা চাইবেন—দাদা তাই দেবেন। এখন সেই ফর্দটা যদি দেন, তাহলে ঐ দিনই দাদা আপনার চাহিদা মত জিনিসগুলি সঙ্গে করেই আনেন। এমন দেনেওলা বর সারা দেশ খুঁজলেও আর মিলবে না বৌদি!

নিরলা নীরবে কিছুক্ষণ আপন মনে ভাবতে লাগল। এ প্রশ্নের কি উত্তর সে দেবে? কন্যাপীঠে এই পাকা দেখা সম্পর্কে চিঠি

পাঠিয়ে সে জানতে চেয়েছে—এ অবস্থায় কি তার কর্তব্য? কিন্তু সেখান থেকে যে নির্দেশ আসবে, সেই মত তাকে চলতে হবে ত! সুতরাং চাপলির প্রশ্নের জবাব দেওয়া তার পক্ষে এখন সমীচীন নয়, আর সে কি বা বলবে, আর ফরমাস করবে? কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল: তাহলে কাল বা পরশু এক সময় এসো, আমি ভেবে ঠিক করে রাখব—কি কি জিনিস আমার চাই।

চাপলি বলল: আজকে বললেই কিন্তু ভাল হোত, দাদাকে ত আবার সেগুলো কিনতে-কাটতে হবে! আচ্ছা—আপনি ভেবে ঠিক করে রাখুন, আমি কালই আসছি।

নিরলা এইসময় জিজ্ঞাসা করল: আমার সেই শ্লোকটা তোমার দাদাকে দেখিয়েছিলে?

চাপলি কথাটা শুনেই চমকে উঠে বলল: ঐ যাঃ! আপনাকে বলতেই ভুলে গেছি—অথচ, এটা আগেই বলা উচিত ছিল।

পকেট থেকে এক খণ্ড কাগজ বার করে চাপলি বলল: দাদা শ্লোকটা পড়েই তখনি এর একটা জবাব লিখে দিয়েছেন—পড়ছি, শুনুন।

চাপলি সুর করে পড়তে লাগল:

বয়েসে কি এসে যায়,
বড় হয় তার গুণে।
তাই, গুণের গুণ সবাই গায়,
দোস্তী থাকলে টাকার সনে।
ছেলে ছোকরা বরটি শুধু
বিয়ের রাতে ভাল দেখায়,
তার পরেতেই তেতো লাগে
অভাব দুঃখ যখন জ্বালায়।

কবিতাটি পড়ার পর মুখখানা হাসিতে ভরিয়ে চাপলি জিজ্ঞাসা করল : কেমন লাগল বৌদি ? মনের মতন জবাব হয়েছে ?

নিরলা গম্ভীর হয়ে বলল : ছাই ! তোমার দাদা খালি টাকাই চিনেছেন, তাই ভাবেন—ছুনিয়া শুদ্ধু লোকের টাকা ছাড়া আর কথা নেই। টাকার চেয়েও বড় জিনিস আছে, সেটি পেলে মানুষ টাকাকে তুচ্ছ মনে করে।

চাপলি জিজ্ঞাসা করল : তার ওপরেও শোলক লিখেছেন নাকি, দিন না—নিয়ে যাই।

নিরলা বলল : লিখে রাখব, এর পর যেদিন আসবে—নিয়ে যেও। দেখতে পাচ্ছ ত বেলা কত হয়েছে—আমার এখন অনেক কাজ বাকি।

এ কথার পর চাপলি জানালা দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে অপ্রস্তুতের মত ভংগিতে বলল : সত্যিই ত ! মেঘে মেঘে বেলা যে বেড়ে গেছে ধরতে পারিনি। তাহলে এখন উঠি বৌদি—পায়ের ধূলো দিন।

তাড়াতাড়ি উঠে হেঁট হয়ে গড় করে চাপলি বেরিয়ে গেল, তারপর রান্নাঘরের রকের নীচে দাঁড়িয়ে বাড়ীর গৃহিণীকে উদ্দেশ করে বলল : আজ চলেছি কাকীমা, আবার কিন্তু আসছি।

কলতলায় স্নানের ঘর থেকে কাকীমা উচ্চকণ্ঠে বললেন : আসবে বৈকি বাবা, এ ত তোমারই ঘরবাড়ী—যখনই মন চাইবে আসবে।

'তা'হলে এখান থেকেই প্রণাম করে যাচ্ছি কাকীমা !' বলেই চাপলি বাইরের পথ ধরে সদর দরজা খুলে বেরিয়ে গেল। নিরলাও পিছু পিছু এসে দরজা সজোরে বন্ধ করে খিল্ এঁটে দিল।

ঘণ্টা কয়েক পরে এই দিনই ঠিক দেড়টার সময় ছদ্মবেশী পিয়নের আবির্ভাব হলো। নিরলা প্রস্তুত হয়েই ছিল ; বাইরের

ঘরে তাকে বসিয়ে মৃদু হেসে নিরলা বলল : অনেক খবর আছে—কালকের ও আজকের।

শঙ্কর বলল : খবরগুলো পর পর সাজিয়ে শুনিয়ে দিন আগে। তারপর ওখানকার খবর আমিও শোনাব।

নিরলা তখন তক্তপোষটার অন্য দিকে বসে মাঝে খানিকটা দূরত্ব রেখে চাপলি সংক্রান্ত খবরগুলি একটি একটি করে সবই বলে গেল। এমন কি, সে যে শ্লোকটি বলেছিল, তারপর সেই শ্লোক নিয়ে গিয়ে বুড়ো ঘুঘু জবাব বলে যে ছড়া পাঠিয়েছে তা পর্য্যন্ত। সেই ছড়া শুনে নিরলা যা বলেছে, আর চাপলি ছেলেটি তারও জবাবের জন্যে যেভাবে পীড়াপীড়ি করেছে—সে সব কথাও শুনিয়ে দিয়ে শেষে জানাল—কালও ঐ ডেঁপো ছোঁড়াটা আসবে, এই ছড়ার উত্তর নিতে ; আর, শনিবার আমাকে পাকা দেখতে এলে, বুড়োর কাছে আমি কি চাইব—সেটাও কাল ওকে বলতে হবে। বুড়ো সেই চাহিদা মত জিনিস নিয়ে শনিবার আমাকে দেখতে আসবে। এই এক কাঁড়ি খবর নিয়ে আমি বসে আছি। এগুলি ঠিকমত ওখানে পেস করতে হবে পিয়নজীকে।

বৃদ্ধ পিয়নের রূপসজ্জাটি এমনি নিখুঁত, স্বাভাবিক ও পরিপাটি হয়েছিল যে, নিরলা তাকে কন্যাপীঠের নিরীহ বৃদ্ধ কোন কর্মী ভেবে ইদানীং বেশ সচ্ছন্দ ও সহজভাবেই কথাবার্তা বলতে অভ্যস্ত হয়েছে। শঙ্কর বরং এক এক সময় কথা বলতে গিয়ে মনে মনে সংকোচ বোধ করে সংকুচিত হয়ে পড়ে ; কিন্তু নিরলার মনে এসব কোন বালাই নেই—সে জানে কন্যাপীঠের এক বৃদ্ধ কর্মীর সংগে সে কথা বলছে।

কিন্তু নিরলার মুখ থেকে জজ সাহেবের প্রসংগ এবং তাঁর সম্বন্ধে মুটবিহারীর লোকের হুঁসিয়ারীর খবরটা শুনে অবধি শঙ্করকে কিছুটা উদ্বিগ্ন হতে হয়েছে বৈকি। কথা প্রসংগে জজ সাহেবের কৃতী পুত্র ও 'সোমত্ত' মেয়ের কথা পর্য্যন্ত উঠেছে।

তবে কি এরা এ ব্যাপারে তার বাবাকেও জড়িয়েছে? তাহলে ত আর এভাবে খেলা চলেনা, এখন তার উচিত শক্ত হয়ে এর একটা প্রতীকার করা। ওদিকে নিরলাও শক্ত হয়ে বসেছে কন্যা-পীঠের নির্দেশটি শোনবার জন্য। তার সেই দৃঢ়তাব্যঞ্জক মূর্তির দিকে শঙ্কর কিছুক্ষণ নিষ্পলক নয়নে চেয়ে রইল। এর পর কি ভেবে সহসা সচকিত ভাবেই সে নিরলাকে বলল: ভারি পিপাসা পেয়েছে—এক গেলাস জল দিতে পারেন?

ঝাঁ করে তক্তপোষ ছেড়ে উঠতে উঠতে নিরলা বলল: পিপাসা পেয়েছে, গৃহস্থের বাড়ী, জল দিতে পারব না? এখুনি আসছি।

নিরলা ঘর থেকে বেরিয়ে ভিতরে চলে যেতেই, এক নজরে সেটা লক্ষ্য করে শঙ্কর নিরলার নাম লেখা রেখার চিঠিখানি প্রথমেই তক্তপোষের উপর এমনভাবে রাখল যে, ঘরে প্রবেশ করলেই চিঠির ওপর তার নজর পড়ে। এর পর সে ব্যাগটি টেনে মাথায় দিয়ে সটান শুয়ে পড়ল এবং তার মাথার পাগড়ী ও ছদ্ম গোঁফ দাড়ি এমন ভাবে খুলে মুখ ও মাথার কাছে রাখল, নিরলা সেগুলি দেখেই যেন বুঝতে পারে—বেচারী ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়তেই ওগুলো খুলে পড়েছে।

এক হাতে একটা ডিসে দুটি রসগোল্লা, অন্য হাতে এক গ্লাস জল নিয়ে নিরলা বাইরের ঘরে ক্ষিপ্র পদে ফিরে এলো। কিন্তু অভ্যাগত অতিথির অবস্থা দেখেই চমকে উঠল সে—এরই মধ্যে ঘুমিয়ে একেবারে কাঠ! ক্রমে মুখের দিকে দৃষ্টি পড়তেই দারুণ বিস্ময়ে একেবারে সে স্তম্ভিত হয়ে পড়ল। একটু পরে আত্ম-সচেতন হয়ে হাতের জলপূর্ণ গ্লাস ও খাবারের ডিস দেওয়ালের দিকে সংস্থাপিত ছোট টেবিলটির উপর রেখে নিদ্রিত ছদ্মবেশীর মাথার কাছে দাঁড়িয়ে তার নকল গোঁফ-দাড়ি-ভ্রষ্ট পরম সুন্দর তরুণ মুখখানি মুগ্ধ দৃষ্টিতে সে দেখতে লাগল। সেই সঙ্গে কেবলই তার মনে

হতে লাগল, ছি, ছি, বুড়ো মানুষ ভেবে নির্লজ্জের মত কত কথা বলেছি, তখন কি ভেবেছেন আমাকে ভদ্রলোক! তবে যে বলেছিলেন কন্যাপীঠের লোক, কিন্তু এখন মুখখানা দেখে মনে হচ্ছে—বাইশ তেইশ বছরের সুন্দর সুশ্রী সুদর্শন ছেলে। এ রকম চেহারার লোক ত কখন চাকর হতে পারে না! অথচ, কন্যাপীঠের সেক্রেটারী রেখা দেবী এঁকে সুপারিশ করেছেন। ভদ্রলোক বুঝতে পারেননি যে, শুয়ে পড়লেই ঘুম আসবে, আর সেই সঙ্গে দাড়ি-গোঁফ-পাগড়ী—তিনটিই খুলে পড়বে। কিন্তু এখন সে কি করবে? হঠাৎ দৃষ্টি তার পাশের দিকে পড়তেই দেখতে পেল—খামে ভরা একখানা চিঠি সেখানে পড়ে রয়েছে—উপরে সুস্পষ্ট অক্ষরে তার নাম লেখা। তখনি খামখানা তুলে নিয়ে তার ভিতর থেকে চিঠিখানা বার করে সাগ্রহে পড়তে লাগল নিরলা। বুঝল যে, কন্যাপীঠের চিঠি—রেখাদি লিখেছেন। নিরলা পড়তে আরম্ভ করল:

স্নেহের নিরলা,

যদিও তোমাকে চোখে এখনো দেখিনি, কিন্তু চিঠির আদান-প্রদানের মধ্যে এমন একটি প্রীতিভাব ফুটে উঠেছে মনে, যার জন্যে তোমাকে খুব আপনার জন ভেবে আনন্দ পাই। তাই চিঠিবাজীর ব্যাপারটি যার তার হাতে না দিয়ে এমন এক জনের উপর বিশ্বাস করে দিয়েছি—যেখানে ফাঁস হবার ভয় নেই। কন্যাপীঠের সদস্যরা সবাই কন্যা হলেও, দু'একজন এমন উৎসাহী ছেলেও এর সংশ্রবে আছেন—পণপ্রথার তাঁরা বিরোধী ত বটেই, উপরন্তু নানা ভাবে সাহায্য করে থাকেন। এঁদের মধ্যে ভীমরুল এবং আর একটি ছেলে—তাঁর নাম শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়—এঁরা দুজনেই তোমার সংকটমোচনে ধনুর্ভঙ্গ পণ করে বসেছেন। ভীমরুল অবিশ্যি তাঁর পরিচয় চেপে রেখেছেন, কিন্তু শঙ্করের পরিচয় অনেকেই জানেন।

ইনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র, এম-এ পাস করে বাংলা সাহিত্যে রিসার্চ করছেন। তার ওপর কবি। আমাদের কন্যাপীঠের গান-গুলি ইনিই লিখে দিয়েছেন। আজ তোমাকে জানাচ্ছি—পোষ্ট আফিসের পিয়ন সেজে চিঠি নেওয়া-দেওয়ার ভারটি এই শঙ্কর বাবুই নিয়েছেন। এখানে আর একটি কথা আছে ভাই নিরলা, তোমার কেসটা যে রকম দাঁড়িয়েছে, তাতে মুটবিহারী বাবুর মত টাকাওয়ালা বিয়েপাগলা বৃদ্ধটির হাত থেকে তোমাকে রক্ষা করতে হলে, সেই সঙ্গে বিয়ের আর একটা পরিকল্পনা করতেই হবে, অর্থাৎ কোন সোনারচাঁদ ছেলে—তোমাদের পাল্টি ঘর হবে, ঘরবাড়ী থাকবে, অবস্থাও ভাল—দেখে শুনে আড়ালে রেখে, তারপর কায়দা করে অদলবদলের পর বুড়োকে বেকুব বানিয়ে দেখিয়ে দিতে হবে—কন্যা-পীঠ বিনাপণে বাজীমাৎ করেছে। আমরা ত ভাই, তোমার জন্যে ঐ শঙ্কর ছেলেটিকে পছন্দ করে রেখেছি। আমাদের মতে তোমাদের মিলনটি পয়লা নম্বরের রাজযোটক হবে। ছদ্মবেশী পিয়ন আজ ওখানে গেলেই তুমি তার ছদ্মবেশটি খোলবার জন্যে অনুরোধ করবে। তাকে দেখে, আলাপ করে, পছন্দ যদি তোমার হয়, পত্রে জানাবে। অপছন্দ হলে অপর কোন ছেলের সন্ধান করতে হবে। আর—শনিবার ওপক্ষ পাকা দেখতে এলে, তুমি কি করবে—ওরই কাছ থেকে তার নির্দেশ পাবে। শঙ্কর বাবুকে তোমার পছন্দ হোক বা না হোক, পরিচয়টা যখন জানাজানি হয়ে গেল, তুমি ওঁর সঙ্গে কথাবার্তা বা আলোচনা করতে কুণ্ঠিত হয়ো না, তাহলে তাতে তোমারই ক্ষতি হবে জেনো। যে অবস্থার মধ্যে তুমি পড়েছ, সেখানে রীতিমত সাহস ও বুদ্ধি প্রকাশ করা এখন বিশেষ প্রয়োজন।

শুভার্থিনী—শ্রীরেখা দেবী

সম্পাদিকা, কন্যাপীঠ।

চিঠিখানা পড়তে পড়তে নিরলা নূতন এক ভাবে অভিভূত হয়ে পড়ল। পত্রে লিখিত শঙ্কর নামে ছেলেটি ত তারই সামনে তক্তপোষের উপর নিশ্চিন্ত আরামে ঘুমাচ্ছেন! ছদ্মবেশটি খোলবার জন্যে তাঁকে অনুরোধ করতে হয়নি—ঘুমের ঘোরে নিজেই খুলে ফেলেছেন! চিঠির উপর থেকে চোখ দুটি তুলে তাঁর উন্মুক্ত মুখে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে অভূতপূর্ব এক পুলকে সে শিউরে উঠল। চিঠির কাহিনী পড়বার আগেই নিদ্রিত মানুষটিকে সে দেখেছিল, ভাল করেই দেখেছিল—শুধু দুটো চোখ দিয়েই নয়, অন্তর দিয়েও। এখন চিঠির বৃত্তান্ত পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বার বার সেই মুখখানি দেখতে লাগল। চিঠি পড়া শেষ হলে, সেখানি নিজের কপালে ঠেকিয়ে নিরাপদ স্থানে রাখল। এরপর, এখন সে কি করবে—এইটি হলো মস্ত চিন্তা। বাইরের ঘরে ছদ্মবেশী ঘুমের ঘোরে অসতর্ক মুহূর্তে আত্মগোপনের প্রধান তিনটি বস্তুকে এমনভাবে খুলে ফেলেছেন যে, কেউ যদি হঠাৎ এসে পড়েন—কোন কৈফিয়ৎ দেবার আর কথা খুঁজে পাবেন না। তার উপর তৃষ্ণার জল চেয়ে বেচারী—

বেদনায় নিরলার কোমল অন্তরটি আর্ত হয়ে উঠল। তখন সে আর স্থির থাকতে না পেরে এক কাণ্ড করে বসল। প্রথমেই মুখ থেকে স্খলিত গোঁফ, দাড়ি এবং মাথার পাগড়ীটি আস্তে আস্তে তুলে নিয়ে টেবিলের উপর রেখে দিল। তারপর নিজের মাথার এলো খোঁপা থেকে একটা কাঁটা খুলে নিয়ে নিদ্রিত অতিথির দু'খানি আবরণমুক্ত পায়ের তলায় বার বার সুড়সুড়ি দেবার কায়দায় চালনা করতে লাগল। তক্তপোষে দেহখানা প্রসারিত করবার সময় পিয়নজী পায়ের নাগরা জুতা জোড়াটি ঘরের মেঝের উপর খুলে রেখেছিল। এদিকে পায়ের গোড়ালী থেকে জানু পর্য্যন্ত ধূসর বর্ণের পট্টি বাঁধা থাকলেও, মোজার অভাবে পুরন্ত সুডৌল রক্তাভ সুন্দর দুটি উন্মুক্ত পদতলের শোভা, তার মুখের শোভার সঙ্গে সাদৃশ্য

বজায় রেখেছিল। এমন দু'খানি পদতল কেতূহলী নিরলাকে বিশেষ-ভাবে আকৃষ্ট না করলে, সে কখনই এভাবে মাথার কাঁটা পায়ের তলায় চালিয়ে তাকে জাগাতে সচেষ্ট হোত না।

মিনিটখানেকের মধ্যেই পায়ে সুড়সুড়ির আমেজ পেয়ে শঙ্কর ধড়মড় করে উঠে বসে দুহাতে চোখ রগড়াতে লাগল। সে বুঝতে পারল, অঙ্গ থেকে বস্ত্র কিছু অদৃশ্য হয়েছে। দেখল, সামনেই দাঁড়িয়ে রয়েছেন নিরলা—তাঁর মুখখানি যেন চাপা হাসিতে সমাচ্ছন্ন মনে হলো।

নিরলা জিজ্ঞাসা করল: কিছু হারিয়েছে বুঝি আপনার?

শঙ্কর কি বলবে—নীরবেই শুধু তাকাল; মুখে কথা নেই।

পরক্ষণে টেবিলের দিকে চাঁপার কলির মত আঙ্গুলটি তুলে নিরলা জিজ্ঞাসা করল: ঐ গুলো কি?

ধীরে ধীরে উঠে সেগুলি দুহাতে নিয়ে অসহায়ের মত নিরলার দিকেই শঙ্কর আবার তাকাল। দেওয়ালে টাঙানো আরসিখানার উপর আঙ্গুল তুলে নিরলা বলল: ঐ যে আরসি, ওর সামনে গিয়ে সাজগোজগুলি পরে ফেলুন; নৈলে কেউ এসে পড়লে ভারি মুস্কিলে পড়তে হবে।

ছদ্মবেশের উপকরণগুলি খুবই সাদা-সিধা, আরসি একখানা সামনে থাকলে খুলে ফেলতে বা পুনরায় যোজনা করতে বিলম্ব হয় না। নিরলা বরাবর চেয়েই ছিল; শঙ্কর সজ্জাটা শেষ করে ফিরতেই নিরলা বলল: ঠিক হয়েছে। এখন বসুন—কথাগুলো তাড়াতাড়ি সেরে নিতে হবে। তবে—আগে মিষ্টি মুখ করে জলটুকু খেয়ে ফেলুন।

মিষ্টান্নের ডিস ও জলপাত্রটি এনে শঙ্করের দিকে এগিয়ে দিল। নীরবে তক্তপোষখানার কিনারা ঘেঁসে বসে শঙ্কর একটি মিষ্টি মুখে দিয়ে জলটুকু পান করল। নিরলা তার গাম্ভীর্য্য বজায়

রেখে বলতে লাগল: দেখুন, চিঠিখানা এর আগে পেয়ে খুব ভাল হয়েছে—ব্যাপারটা সবই জানতে পেরেছি। ভগিনী—কন্যাপীঠের সেক্রেটারী—রেখা দেবী সব কথাই খুলে লিখেছেন আপনার সম্বন্ধে। আপনি যে কবি, কবিতা লেখেন, আমি তা জানি। আপনার কবিতা আমি পড়েছি।

উৎফুল্ল হলেও শঙ্কর একটু লজ্জিতভাবেই জিজ্ঞাসা করল: পড়েছেন নাকি?

নিরলা উত্তর দিল: হ্যাঁ। আমার আবার এমনি অভ্যাস, মাসিক কাগজ এলে আগেই কবিতাগুলো বেছে বেছে পড়ি। কলেজ ম্যাগাজিনে, আরও দু-তিনখানা মাসিকে আপনার কবিতা ছাপা হয়। এরপর—এই ঘটনাটি নিয়ে ভাল করে একটি সনেট লিখবেন, লোকে পড়ে খুশি হবে। কবিগুরুর সেই বিখ্যাত কবিতাটির ছন্দকে আদর্শ করে যদি স্বুরু করেন, বেশ জমবে। সেই যে—'পঞ্চনদ তীরে বেণী পাকাইয়া শিরে—'আপনি এখানে স্বরু করবেন—'গোয়াবাগানের গলির পথে, পিয়ন চলেছে আশা লয়ে সাথে—' বেশ হবে না?

নিরলা মেয়েটির মুখ থেকে সপ্রতিভ ভঙ্গির কথা ছদ্মবেশী পিয়ন রূপে শঙ্কর কিছু কিছু শুনেছিল এবং সেই থেকে মেয়েটির বলিষ্ঠ মনের কতকটা আভাষও পেয়েছিল। কিন্তু এখন সেই ছদ্মবেশী এক তরুণ, বিশ্ববিত্তালয়ের উচ্চশিক্ষিত যুবা, তার ওপর সে কবিভাবাপন্ন জেনেও, এ অবস্থায় তার মুখ থেকে এমন সহজ সুস্পষ্ট ও সপ্রতিভ ভংগিতে সরল কথাগুলি শুনে শঙ্কর সবিস্ময়ে প্রশ্ন করল: আমার পরিচয় পেয়েও আপনি যে ভাবে কথা বলছেন, কোন কলেজের মেয়েও এ অবস্থায়—

শঙ্করের কথায় বাধা দিয়ে নিরলা বলল: 'খোলাখুলি ভাবে কথা বলতে পারত না, লজ্জায় ভেঙে পড়ত'—এই কথা আপনি

বলতে চান ত? কিন্তু আমার অবস্থার কথা আপনি ত সবই শুনেছেন, শুধু তাই নয়—আমার প্রতি সদয় হয়ে সাহায্য করবার জন্যেও যে-অবস্থায় এগিয়ে এসেছেন, সে ত চোখের ওপর দেখছি। একটা মেয়ের ভাবী সর্বনাশ কল্পনা করে আপনি বীরের মত এগিয়ে এসেছেন তাকে উদ্ধার করবেন, এই আশায়। তাহলে বলুন ত, এর পরেই সে মেয়ের পক্ষে কি লজ্জাশীলার মত মুখ বুজিয়ে ঘরের কোনে বসে থাকা উচিত? আপনাকে জানতে পেরে, চোখের সামনে দেখেও যদি আলাপ না করি, মন খুলে কথা না বলি, কিংবা সামনে থেকে উঠে গিয়ে আড়াল থেকে পাকে-প্রকারে আমার কথা জানাতে চেষ্টা করি—আপনি কি তাতে খুশি হতেন? তবে যদি আমার পক্ষে এতখানি বে-পরোয়া হওয়া আপনার চোখে ভাল না লাগে—

নিরলার কথায় বাধা দিয়ে এখানে শঙ্কর উৎসাহের সুরেই বলল: আমার প্রতি যদি আপনার বিশ্বাস দৃঢ় হয়ে থাকে, তাহলে আমার প্রবৃত্তিকেও ভুল বুঝবেন না। আপনার মতনই আমারও মনের কথা এই যে, পণপ্রথার সুযোগ নিয়ে একশ্রেণীর বিবাহ-পাগল-বৃদ্ধ টাকার জোরে যেভাবে দরিদ্র ঘরের বয়স্থা রূপসী মেয়েদের সর্বনাশ করছে, এর প্রতীকার করা উচিত, আর—আমাদের মত তরুণদেরই কর্তব্য এই বিশ্রী ব্যাপারে এগিয়ে আসা। কাজেই, এখানে শঠে শাঠ্যং নীতি গ্রহণ করতেও আমার কিছু মাত্র সঙ্কোচ বা আপত্তি নেই। আমার লক্ষ্য হচ্ছে—যেন তেন প্রকারেন বর্বরস্য ধনক্ষয়ম্! অর্থাৎ ঐ বর্বরগুলোকে প্রলুব্ধ করে ওদের ধনক্ষয় করতেও আমার দ্বিধা নেই। আর, আপনাকে অসংকোচে বে-পরোয়াভাবে আমার সঙ্গে আলাপ করতে দেখে আমি এত খুশি হয়েছি যে, মুখে সে আনন্দ প্রকাশ করতে পারছি না। সত্য কথাই আপনি বলেছেন—কুমারী জীবনে যে দারুণ সমস্যার মধ্যে পড়ে আপনাকে বিব্রত হতে হচ্ছে,

এখানে লজ্জা সরমে জড়িয়ে থাকা চলে না—কবির ভাষাতে বলতে হয়—জ্বালাময়ী রূপে অগ্নিকাণ্ড করাই উচিত। তবে কি জানেন, আমাদের এখন কর্তব্য হচ্ছে চারদিকে চেয়ে 'শঠে শাঠ্যং নীতি'তেই কৌশলে কাজ করা।

নিরলা খুব মনোযোগ দিয়েই কথাগুলি শুনল, তার ভালও লাগল। চাপলি ছেলেটির দু'দিন আসা যাওয়া এবং তার দৌত্যের কথা পিয়ন-বেশী শঙ্করকে আগাগোড়া নিরলা আগেই শুনিয়ে দিয়েছিল, সেই শ্লোক ও তার উত্তরে নুটুবাবুর কবিতাটিও শঙ্করের হাতে দিয়ে জিজ্ঞাসা করল: এখন যুক্তি দিন আমি কি করব? আপনি ত কবি, বুড়ো বাঁদরের এই কবিতার জবাবটিও আপনিই লিখে দেবেন।

শঙ্কর বলল: এ সম্বন্ধে ওখানেও কিছু কিছু আলোচনা হয়েছে। আপনাকে এখন খুব শক্ত হয়ে কাজ করতে হবে। বুড়ো যদি শনিবার আপনাকে দেখতে আসে, আপনাকে তার সঙ্গে অভিনয় করতে হবে। এমন কি—আপনার পছন্দমত জিনিসপত্র কেনবার জন্যে আপনাকে যদি সঙ্গে নিয়ে বাজারে বেরুতে চান, আপনি রাজী হয়ে যাবেন।

একথা শুনেই নিরলা চমকে উঠে জিজ্ঞাসা করল: আপনি বলছেন একথা? কন্যাপীঠও কি এ কথার সমর্থন করেন?

শঙ্কর বলল: কন্যাপীঠের মত না পেলে নিজের মন থেকে কোন কথা আমি আপনাকে বলতে পারিনা। কথাটা শুনলে অবিশ্যি চমকে উঠতে হয়। কিন্তু কন্যাপীঠও আপনার ব্যাপারে 'শঠে শাঠ্যং' নীতি চালাবেন স্থির করেছেন। যদি আপনাকে নুটুবাবুর সঙ্গে বাজার করতে বেরুতে হয়, তাহলেও কন্যাপীঠের পক্ষ থেকে আপনার উপর রীতিমত নজর রাখবার মত শক্ত লোকের অভাব হবে না।

নিরলা সাগ্রহে কথাগুলি শুনল, কিছু বলল না; মুক্ত দরজার দিকে একইভাবে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। এই অবসরে শঙ্কর সহসা প্রশ্ন করলঃ আচ্ছা, আর একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করব—ঐ যে চাপলি ছোকরা আপনাকে জজসাহেবের সম্বন্ধে কতকগুলো কথা শুনিয়ে যায়, আপনি সেটা কি ভাবে নিয়েছেন? জজসাহেবকেও আপনি কি ঐ ফাজিল ছোকরার কথায় মুটবিহারী-বাবুর দলে ফেলেছেন?

মুখখানির এক বিচিত্র ভংগি করে নিরলা তাড়াতাড়ি বলে উঠলঃ মহাভারত! এত অবুঝ আর কানপাতলা মেয়ে আমি নই। অবিশ্যি, ঐ মুটোবাবু বা জজসাহেব—কাউকে আমি চাক্ষুস দেখিনি, কিন্তু জজসাহেবের মত শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত বয়স্ক মানুষের সম্বন্ধে অমন ধারণাও আমি করতে পারিনে। শুনেছি, জজসাহেব কন্যাদায়োদ্ধার সমিতিতে গিয়ে আমার ফটো দেখেছেন। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন প্রস্তাবই তাঁর কাছ থেকে এখানে আসেনি—এলে আমি শুনতে পেতাম। এমনও হোতে পারে, ঐ চাপলির মুখে—অবশ্য শোনা খবর—জজসাহেবের নাকি উপযুক্ত ছেলেও আছে, তাঁর জন্যে মেয়ে দেখতে ঐ সমিতিতে যাওয়াও অসম্ভব নয়।

শঙ্কর এই সময় কিছুটা প্রফুল্ল মুখেই বললঃ তাহলে আমার মুখেই আসল খবরটা শুনুন—কন্যাপীঠে লেখা আপনার সেই চিঠিখানাই তাঁকে ঐ সমিতিতে সন্ধান নেবার জন্যে যেতে বাধ্য করেছিল।

ঃ কি রকম? তিনি আমার চিঠির কথা কি করে জানলেন?

ঃ তাঁর কন্যার জন্যেই জেনেছিলেন—কন্যাপীঠের সঙ্গে তিনিও সংশ্লিষ্টা কিনা! ঐ চিঠির সূত্রে ভীমরুলের চিঠির কথা ওঠে, কন্যাদায়োদ্ধার সমিতির দুর্নীতির কথাও প্রকাশ পায়, তখন জজ-সাহেবের মনে আগ্রহ জাগে—ঐ সমিতিতে গিয়ে তিনি সন্ধান

নেবেন, প্রয়োজন বুঝলে আপনার সঙ্গেও দেখা করবেন। কেননা, মেয়ের কাছ থেকেই তিনি এ বাড়ীর ঠিকানা জেনে নেন। তবে দেখতে আসাটা অভিনয়ের মতও হতে পারে।

চোখ দুটো বিস্ফারিত করে শঙ্করের মুখের উপর ফেলে নিরলা জিজ্ঞাসা করল: ভারি আশ্চর্য্য ত! কিন্তু এত কথা আপনি জানলেন কি করে?

ক্ষণকাল নতমুখে ঘরের মেঝের দিকে তাকিয়ে থেকে পরক্ষণে মুখখানা তুলে সোজা হয়ে বসে শঙ্কর বলল: যেহেতু, ঐ জজ সাহেব আমাদেরই পূজনীয় পিতা। সঙ্গে সঙ্গে দুই হাত যুক্ত করে শঙ্কর কপালে ঠেকিয়ে প্রণতি জানাল।

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে নিরলাও বলে উঠল: তাই নাকি? তাহলে আমাকে এতক্ষণ অন্ধকারে রেখেছিলেন কেন বলুনত? কিছুই আমাকে জানতে দেননি—রেখাদিও কোন চিঠিতেই এ কথা জানান নি!

একটু গম্ভীর হয়ে শঙ্কর বলল: তার সুযোগ ত ঘটে নি। আজই আপনি তাঁর কথা তুলেছেন, আর এমন একটা বিশ্রী পরিস্থিতির ভিতর দিয়ে কথাটা উঠেছে যে, নিজের প্রখর বুদ্ধি ও অনুমানের জোরে আপনি যদি ব্যাপারটি না বুঝতেন, এই নিয়ে আমাদের মধ্যেও একটা বিশ্রী আবহাওয়ার সৃষ্টি হোত। যাক্, ভগবান আমাদের রক্ষা করেছেন। এই প্রসঙ্গে, আর একটা কথা আপনাকে বলে রাখছি—বাবা যখন আপনার ঠিকানা জেনে নিয়েছেন বেশ একটু আগ্রহ করেই, হয়ত এরই মধ্যে একদিন তিনি আপনাকে দেখতে আসতে পারেন; কিন্তু সেটা হবে ঠিক পরীক্ষা করবার মতনই।

আয়ত দুটি চোখের দৃষ্টি শঙ্করের দিকে নিবদ্ধ করে নিরলা জিজ্ঞাসা করল: পরীক্ষায় যদি পাস করি—পুরস্কারের প্রত্যাশাও নিশ্চিত করতে পারি?

শঙ্করও বেশ গম্ভীর হয়েই জবাব দিল: সেটা পরীক্ষকের মর্জীর ওপর নির্ভর করে।

শঙ্করের এই সংক্ষিপ্ত ও সুস্পষ্ট উত্তর থেকে কি অর্থ যে নিরলা নিজের মনে অনুমান করে নিল, সেই শুধু জানল। এদিকে অনেকটা সময় এখানে কেটে গেছে বুঝতে পেরে তাড়াতাড়ি ব্যাগটি গলায় ঝুলাতে ঝুলাতে শঙ্কর বলল: শেষ পর্য্যন্ত যখন কন্যাপীঠ আছেন, ভাববার কিছু নেই। তবে আজকের চিঠির জবাবটা—

ওমা, সে কথা ভুলেই গেছি। আচ্ছা, আপনি আর একটু বসুন, আমি অন্ততঃ রেখাদির চিঠির মোটামুঠি একটা জবাব খুব সংক্ষেপেই লিখে আনছি।

ব্যগ্রকণ্ঠে কথাগুলি বলেই নিরলা ঘর থেকে বেরিয়ে বাড়ীর ভিতরে চলে গেল। দালানের কোণে ছোট ঘরখানি তার নিজস্ব হলেও, কাকীমার দুটি বালিকা কন্যা তারই কাছে শয়ন করে। সেই ঘরেই তার লেখা পড়ার সাজ সরঞ্জামগুলি সাজান থাকে। নিরলা এক রকম ছুটতে ছুটতে সেই ঘরে প্রবেশ করল।

শঙ্করও ওঠবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে এই অবসরে নিরলার মনোভাবটি নিজস্ব পরিকল্পনায় নির্ণয় করতে লাগল। বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র সে, সেক্সপিয়ার-মিল্‌টন ভাল করেই পড়েছে। সংস্কৃত সাহিত্যে কালিদাসের শকুন্তলার উপর সে একটা দীর্ঘ আলোচনাও করেছে—শকুন্তলার প্রেমের দিকটা ফুটিয়ে তোলবার উদ্দেশ্যে। সুতরাং এ দিন প্রত্যক্ষভাবে পরস্পরের পরিচিতির পর যথেষ্ট সপ্রতিভ ও সংকোচমুক্ত এই মেয়েটির কুণ্ঠাহীন সুস্পষ্ট সংলাপ থেকে সে যদি কুমারী তরুণীর অন্তর-রহস্যের সারাংশটুকুর আভাস নির্ণয়ে সত্যই অসমর্থ হয়, তাহলে শকুন্তলার প্রেম সম্বন্ধে তার গবেষণা ব্যর্থ হয়েছে বলেই ধরে নিতে হবে। কিন্তু

এ সম্পর্কে শঙ্করের অন্তর্দৃষ্টি ও অনুমানশক্তিই তাকে সত্যের সন্ধান দেয়।

নাম ঠিকানা লেখা খামখানি হাতে করে নিরলা কক্ষে প্রবেশ করতেই শঙ্করের চমক ভাঙল। চিঠিখানা নিরলার হাত থেকে নিয়ে ব্যাগের মধ্যে রেখে শঙ্কর যাবার উদ্দেশে উঠে দাঁড়াল। নিরলা যুক্ত করে নমস্কার করে বলল : তাহলে জবাবটা—

প্রতি-নমস্কার করে শঙ্করও জানিয়ে দিল : আসছে শনিবারের আগেই সব জানতে পারবেন ; ভাবনার কিছু নেই—ওঁদের নির্দেশ-মত চলবেন। আপনার সম্বন্ধে আমরা সবাই সচেতন জানবেন। আচ্ছা, তাহলে চলি।

দরজার দিকে শঙ্করকে এগিয়ে যেতে দেখে নিরলাও ক্ষিপ্রপদে তার অনুসরণ করল। সদর দরজার বাইরে যাবা মাত্রই, নিরলা পুনরায় দরজা বন্ধ করে তার নিজের ঘরটির দিকে ফিরল। আজ সেখানে বিরলে বসে চিন্তা করবার অনেক কিছুই আছে।

পনেরো

দুনীভাই নামে উদাসী সম্প্রদায়ের এক পাঞ্জাবী সাধুর সঙ্গে সদানন্দবাবুর সদালাপটি খুব জমে উঠেছে। পার্কের মুখে একদা বিকালের দিকে উভয়ের চোখাচোখী হয়। সাধুর দৃষ্টি সদানন্দবাবুকে অভিভূত করে। সাধু তৎক্ষণাৎ মুখের একটা বেদনাব্যঞ্জক শব্দ করে সদানন্দবাবুকে ভাঙা গুরুমুখী ও হিন্দী ভাষায় বলে ওঠেন: এমন চেহারা, কপালে সৌভাগ্যের স্পষ্ট রেখা, তবুও আপনি সুখী নন। ভারি তাজ্জবের কথা।

সদানন্দবাবু সাধুর দিকে চেয়ে থেকে জিজ্ঞাসা করেন: আপনি কি জ্যোতিষী—গণৎকার?

সাধু বলেন—না। তবে গুরু নানকজীর কৃপায় মানুষের মুখ দেখে আমি তার জীবনের অতীত ও ভবিষ্যৎ—সেই সঙ্গে বড় বড় ঘটনাগুলো আয়নার মত দেখতে পাই। সাধারণ মানুষের মুখগুলোতে একই ধাঁচের দুঃখ-ধান্দা কিম্বা একটু সুখের ঝিলিক দেখি; কিন্তু এমন এক একখানা মুখ নজরে পড়ে—সবদিক দিয়েই অসাধারণ। তখন তার দিকে চেয়ে কিছু বাতলাতে দিল চায়, যদি কিছু শোধরাতে পারি। আপনার মুখখানাও এই ধরণের কিনা, তাই দেখেই ও কথা বলেছি।

এরপর উভয়েই পার্কের মধ্যে ঢুকে একখানা বেঞ্চিতে বসে আলাপ করতে থাকেন।

সদানন্দবাবু জিজ্ঞাসা করলেন: আমাকে অসুখী বললেন কেন, জানতে পারি?

সাধু উত্তর দিলেন: মনের অসুখ আপনার ছেলের জন্যে। অনেক আশা ভরসা করতেন তার ওপর, কিন্তু সে ছেলে অভিমান করে বিবাগী হয়ে গেছে। বাপের কাছে এর চেয়ে বড় দুঃখ আর কি হতে পারে?

সদানন্দবাবু বিস্মিত হয়ে সাধুর দিকে চেয়ে থাকেন। সাধুর প্রতি শ্রদ্ধায় তাঁর অন্তর ভরে ওঠে। তিনি তৎক্ষণাৎ মনিব্যাগ খুলে একটি টাকা নিয়ে সাধুকে দিতে গেলেন। কিন্তু সাধু সেটি নেবার জন্যে হাত না বাড়িয়ে ঈষৎ হেসে বললেন: আপনি ভুল করছেন—ভিখ্‌মাংগা সাধু আমি নই। ও টাকা তুলে রাখুন। এগুলো হচ্ছে শিক্ষার দোষ বাবুজী! কারও কিছু এলেম দেখলেই মুখে তারিফ করেও খুশি হন না—টাকা দিয়ে তাকে বাঁধতে চান।

সাধুর কথায় সদানন্দবাবু আরো প্রসন্ন হন, টাকার দিকে লোকটির লোভ নেই। এর পর বললেন: একটা কথা জানতে চাই—আমার সেই বিবাগী ছেলেটিকে ফিরে পাব কি?

সাধু বললেন: এখনই, আর এখানেই ও কথার জবাব দেওয়া যায় না। হয় আমার ডেরায়, নয়ত আপনার আস্তানায় বসে বিচার করে বলা যেতে পারে।

সদানন্দবাবু তখন প্রসন্নভাবে বাড়ীর ঠিকানা দিয়ে সাধুকে সেই দিনই নিমন্ত্রণ করে রাখেন এবং সাধুও সানন্দে সে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। সাধুর নামটিও জেনে নেন—চুনীভাই।

সেই সাধু এদিন অপরাহ্ণের কিছুটা আগে সদানন্দবাবুর বাড়ীতে এসেছেন। সদানন্দবাবু তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে সম্বর্দ্ধনা করে উপরের বৈঠকখানায় এনে বসিয়েছেন। সাধুর চেহারার কথা আগে বলা হয় নাই, কিন্তু সেটির বৈচিত্র্য জানা উচিত। তাঁর মাথার কাঁচা-

পাকা চুলগুলি বাবরীর আকারে কার্লিং করা—ঘাড় পর্য্যন্ত প্রলম্বিত। নাভি পর্য্যন্ত লম্বিত দাড়ী, গুম্ফ জোড়াটিও সেই অনুপাতে পূরন্ত। গলায় রক্ত প্রবালের কয়েক ছড়া মালা। গায়ে হরিদ্রাবর্ণের আচকান, পরণে পীতবর্ণের রেশমী ধুতি। ঐ বর্ণের একটি থলির মধ্যে দক্ষিণ হাতের প্রকোষ্ঠটি অদৃশ্য থাকলেও বোঝা যাচ্ছে, সাধুজী তার মধ্যে কোন বিশুদ্ধ বস্তুর মালা রেখে ইষ্ট মন্ত্র জপ করছেন। আয়তন দেখে চোখ তুটিও আয়ত মনে হয়, কিন্তু মোটা সোটা ডাঁটি দেওয়া চশমার পুরু কাচের মধ্যে আবৃত থাকায় দৃষ্টিটি ধরা যায় না। পায়ের পাঞ্জাবী নাগরা বাইরে খুলে রেখে সাধুজী গৃহস্বামীর সামনে এসে বসেছেন।

নিরুদ্দিষ্ট জ্যেষ্ঠ পুত্র সম্বন্ধে বাঞ্ছিত খবরটি জানবার জন্য জজ-সাহেব উদ্‌গ্রীব হয়ে ছিলেন। সাধু তুনীভাই এসেই বলেছেন: জজসাহেবের সে ছেলেটি বেঁচে আছেন এবং পিতাপুত্রে মোলাকাতের শীগ্‌গীরই সম্ভাবনাও আছে। তবে জজসাহেবকে তার জন্যে প্রায়শ্‌চিৎ করতে হবে।

পুত্রের খবরে জজসাহেব উৎফুল্ল হলেন বটে, কিন্তু প্রায়শ্চিত্যের কথা শুনে মুসড়ে পড়ে জিজ্ঞাসা করলেন: প্রায়শ্চিত্য করতে হবে কেন?

তুনীভাই বললেন: আপনার সারা মুখে যে-সব রেখা দেখছি, ওরাই বলছে বাবুজী! ছেলের ব্যাপারে গলদ কিছু করেছিলেন। তারপর হালেও এক ভুল করে বসেছেন; যার জন্যে একটা বদনাম আর অপবাদের ছায়া দেখছি।

ছেলের ব্যাপারে···বলেই জজসাহেব নিজেকে সামলে নিলেন। তারপর একটু থেমে বললেন: আমার মুখের রেখা দেখে বলছেন—আমি ভুল করে···

তুনীভাই বললেন: হ্যাঁ, এক ছুকরীকে সাদি করবার জন্যে

আপনার মনে লালস জাগে। কিন্তু সেই ছুকরীর উমর আপনার লেড়কীর মতন, তারপর দুই লেড়কীর মধ্যে দোস্তী আছে—

জজসাহেব কিঞ্চিৎ অপ্রতিভের মত মুখভংগি করে বললেন: কথাটা একবারে মিছে নয়, ঐ মেয়েটির তসবির দেখে আমি উন্মনা হয়েছিলাম বটে! কিন্তু ঐ মেয়েটির সাদি নিয়ে একটা গোলমাল চলছে, তারপর আমার কন্যা তাকে সমর্থন করছে জেনে, আমি মনের লালসা ত্যাগ করি। সেই জন্যেই মেয়েটিকে দেখতে যাওয়াও স্থগিত রাখি। তবুও এর জন্য আমাকে প্রায়শ্চিত্য করতে হবে?

দুনীভাই সহাস্যে বললেন: জী! মালুম হচ্ছে, আপনার কোন ছেলিয়ার সাথে ঐ মেয়েটির আসনাই চলেছে।

জজসাহেব বিরক্ত হয়ে তিক্ত কণ্ঠে প্রতিবাদ করলেন: না। আমার মেয়ের সঙ্গে ঐ কন্যাটির সংশ্রব আছে, এ কথা আগেই বলেছি; কিন্তু আমার ছেলের সঙ্গে তার সংযোগ হতে পারে না।

মৃদু হেসে দুনীভাই বললেন: আমি যা বলি বাবুজী, সে কথা মিথ্যা হতে পারে না। আপনি যে এখানে গলতি করেছেন—পরে মালুম হবে। আপনার এখন উচিত হচ্ছে—ঐ লেড়কীর সাথে আপনার ছেলের সাদি দিয়ে নিজের ভুলটির প্রায়শ্চিত্য করা।

অপ্রসন্ন মুখে জজসাহেব বললেন: আপনি ত আর আমাদের সমাজ-ব্যবস্থা জানেন না,—তাই এ কথা বলছেন। প্রথমতঃ আমার একটা আভিজাত্য আছে, সে দিক দিয়ে বাপ-মা-হারা কাকার গলগ্রহ একটা মেয়েকে পুত্রবধূর মর্য্যাদা দিয়ে এ সংসারে আনতে পারি না।

একটু গম্ভীর হয়ে সাধু দুনীভাই বললেন: দেখুন বাবুজী, বাগিচায় আপনার সাথে আলাপ হবার পর, ঐ লেড়কীকে নিয়ে তার নসীব বিচার করবার কেমন একটা খেয়াল আমার হয়—এটা হচ্ছে নেহাৎ সখ। কিন্তু বাবুজী, বিচার করে আমি যেন আসমান থেকে

পড়ি! আপনি বিদ্বান লোক, তার ওপর অনেক দিন জজীয়তী করেছেন, দুনিয়ার অনেক খবর রাখেন; তাতে আপনি জানেন, এমন এক একটা মেয়ে দেখা গেছে, যাকে নিয়ে চারদিক থেকে নানা রকম ঝামেলা চলেছে, আগেকার যুগের মত 'হামলা' পর্য্যন্ত হয়েছে। কিন্তু সেই মেয়ের হাতের মালা যারই গলায় পড়েছে, তার অদৃষ্ট ফিরে গেছে। সেই মেয়ে যেন সুখ সৌভাগ্য আর আনন্দ নিয়ে তার জীবনকে ধন্য করে। এই মেয়েটিও ঠিক ঐ ধাঁজের। আপনি নিজে এর তসবির দেখে মোহিত হয়েছিলেন, আপনার মনের জোর আছে—নিজেকে সামলে রাখেন, চাক্ষুস পরিচয়ের পথ বন্ধ করেছেন। এখন ত আর সে লালসা নেই, এবার একদিন হঠাৎ গিয়ে মেয়েটিকে দেখুন—তাকেই জিজ্ঞাসা করুন, কাকে সে সাদি করতে চায়, তার মনের আশাটা কি—তাহলেই সব বুঝতে পারবেন।

কথাগুলি জজসাহেবের মনে লাগল, কিন্তু একটা চিন্তাও যেন বিঘ্নস্বরূপ হয়ে দাঁড়াল। তিনি এসময় কন্যা-দায়োদ্ধার সমিতির ব্যাপারটি এবং সেখানে যে সব কথাবার্ত্তা হয়েছিল, সেগুলি দুনীভাইকে শুনিয়ে দিয়ে বললেন: শুনছি, ঐ সূত্রে নাকি জানাজানি হয়ে গেছে—আমিও ঐ কন্যার একজন প্রার্থী! তাই ভাবছি—

উৎসাহের সুরে দুনীভাই বললেন: এর জন্যে আর ভাবনা কি? আপনি এখন একদিন ঐ লেড়কীর বাড়ীতে গিয়ে জানিয়ে দিয়ে আসুন, ঐ সমিতির লোকরা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে কথাটা এ ভাবে প্রচার করেছে—আসলে, নিজের ছেলের জন্যই আপনি মেয়েটির সন্ধানে যান। এখনও তাকে আপনি পুত্রবধূ করতে রাজী আছেন, আর এই নেওয়ার ব্যাপারে পণের কোন কথা নেই।

চমকে উঠে জজসাহেব মন্তব্য করলেন: বলেন কি! আমার

সোনার চাঁদ ছেলে—তার ওপর এম-এ পাস, পণের কোন কথা থাকবে না? একবারে বিনাপণে—

ছুনীভাই বললেন: আপনি বুঝতে পারছেন না বাবুজী, কি দারুণ অপবাদ আপনার চার পাশে ঘুরছে, সমিতিতে গিয়ে সুরুতেই আপনি যে কাজ করেছেন, সেটা খণ্ডন করবার এখন একমাত্র উপায় হচ্ছে—নিজের ছেলেকে এগিয়ে দেওয়া। তাহলেই আপনার দুষমনদের চক্রান্ত সব বাজে ও মিছে হয়ে যাবে, আর আপনার আসল উদ্দেশ্যটি বুঝতে পেরে সবাই বাহবা দেবে।

জজসাহেব গম্ভীর হয়ে বললেন: বেশ, তাই হবে।

সাধু ছুনীভাইকে বিদায় দিয়ে জজসাহেব কিছুক্ষণ ধরে চিন্তা করলেন। পাঞ্জাবী সাধুর কথাগুলি নানাভাবে বিশ্লেষণ করে বুঝলেন, সন্দেহ করবার কিছু নেই। আরও বুঝলেন, এ অবস্থায় কালিদাস-বাবুর গোয়াবাগানের বাড়ীতে গিয়ে নিরলা মেয়েটিকে দেখা এবং তার সঙ্গে আলাপ করা খুবই উচিত। সত্যই, এই মেয়েটির সম্পর্কে প্রথমে তিনি নিজেই যে ভাবে বিপথে পা বাড়িয়েছিলেন, এখন সে কথা মনে হতেই দারুণ একটা অপবাদের আশঙ্কা যেন ভ্রূকুটি করতে থাকে। আবার, এই খবরটা এমনি সাংঘাতিক যে, একবার রটলে আর নিষ্কৃতি নেই। তারপর, যদি কোন রকমে শঙ্করের কাণে ওঠে—আজকালের ছেলে, ও মেয়েকে ত বিয়ে করবেই না—হয় ত বিবাগী হয়ে বেরিয়ে যেতে পারে। আগের ছেলেটির মত এটিকেও তিনি কি এই ভাবে হারাতে চান? এখন একমাত্র উপায় হচ্ছে—নিরলা মেয়েটিকে দেখে, পরীক্ষা করে, তার সম্পর্কে নিজেকে উঁচুতে রেখে ছেলের কথাটি উত্থাপন করা। কিন্তু কন্যার কাকা কালিদাসবাবু যেভাবে মুটবিহারী বাবুর প্রলোভনে পড়ে কন্যাটিকে বলি দেওয়াই সাব্যস্ত করেছেন, তাতে তাঁর বাড়ীতে গেলে তিনি কি সহজে তাঁকে

আমল দেবেন ? নিরলার সঙ্গে একান্তে তাঁর কথাবার্তার প্রয়োজন, কিন্তু কালিদাসবাবু যদি তাতে আপত্তি করেন ?

হঠাৎ তাঁর মনে পড়ে গেল, ঐ গোয়াবাগানেই পশ্চিমবঙ্গ পুলিসের বিভাগীয় পুলিস কমিসনার সাহেবের আফিস এবং সেই আফিসের কর্তা নলিনীবাবু তাঁর বিশিষ্ট বন্ধু। এখন এই ব্যাপারটিকে যদি তদন্তের সামীল করে পুলিসের সহায়তাগ্রহণকে যুক্তি সিদ্ধ করা যায়, তাহলে আর কালিদাসবাবুর পক্ষ থেকে আপত্তি ওঠবার অবকাশ হবে না।

মনে মনে এ সম্বন্ধে কর্তব্য ও বক্তব্য স্থির করে জজসাহেব গোয়াবাগানের পুলিস সার্কেলের সঙ্গে ফোনে সংযোগ করে প্রিয়বন্ধু নলিনীবাবুকে আহ্বান করলেন। বড়কর্তা বাসাতেই ছিলেন, ফোনে জজসাহেবকে পেয়ে উৎফুল্ল হয়ে আলাপ করতে লাগলেন। জজসাহেব তাঁরই নিকট এলাকায় কালিদাসবাবুর ভাইঝির প্রসংগ তুলতেই নলিনীবাবু বললেন—আমাদের আফিসেও ব্যাপারটা নোট করা আছে। কন্যাপীঠের প্রেসিডেণ্ট এক পত্রে ঘটনাটা মোটামুটি জানিয়ে অনুরোধ করেন—মেয়েটির ওপর যাতে কোন রকম অত্যাচার না হয়, আমরা যেন সেদিকে লক্ষ্য রাখি।

জজ সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন : তা হলে লক্ষ্য রাখা হোচ্ছে নাকি ?

নলিনীবাবু দৃঢ়তার সহিত বললেন : নিশ্চয়ই। এখানকার আফিসের এক ছোকরার উপর ভার দেওয়া আছে—ঐ বাড়ীটার ওপর সে লক্ষ্য রাখবে, হঠাৎ কোন রকম গোলমাল হলে তখনি আফিসে এসে খবর দেবে। এখন এ ব্যাপারে তোমার এত আগ্রহ কেন শুনি ?

জজসাহেব বললেন : ঘটনাচক্রে রীতিমত জড়িয়ে পড়তে হয়েছে, এখন নিরলা মেয়েটিকে দেখতে এবং তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে চাই। কিন্তু ওর কাকা ভারি ধড়িবাজ—সে ত জান, যাতে তার কাছ থেকে বাধা না পাই—

নলিনীবাবু বললেন : তার জন্যে কোন চিন্তা নেই, যতক্ষণ ইচ্ছা তুমি জিজ্ঞাসাবাদ করবে—কেউ বাধা দেবে না। তাহলে এক কাজ কর না কেন—এই ত বেশ সময়, চট করে আমার বাসায় চলে এস। আমিও না হয় তোমার সঙ্গেই যাব—এখন আমারও ফুরসদ আছে দেখছি। এক সঙ্গেই যাওয়া যাবে—আসছ ত ?

জজসাহেব বললেন : নিশ্চয়ই, আধঘণ্টার মধ্যেই গিয়ে হাজীর হচ্ছি।

টেলিফোন ছেড়ে জজসাহেব তাড়াতাড়ি বেশ পরিবর্তনে মনোযোগ দিলেন।

ষোল

এদিকে হুনীভাই জজসাহেবের বাড়ীর সামনের বাঁধানো গলি পার হয়ে রাস্তায় এসে পড়তেই, ও পাশের রেষ্টুরেণ্ট থেকে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে এসে তাঁকে পাকড়াও করল সেই চাপলি ছেলেটি। এভাবে তার আবির্ভাব দেখেই বুঝতে পারা গেল, হুনীভাইকে সে জজসাহেবের বাড়ীতে সেঁধুতে দেখেছিল, এবং সেই থেকেই সে রেষ্টুরেণ্টে বসে আড্ডা দেবার সঙ্গে তাঁর প্রতীক্ষা করছিল। ঝাঁ করে একবারে সামনে এসে মুখে বিচিত্র হাসি ফুটিয়ে চাপলি জিজ্ঞাসা করলঃ বাবাজী বুঝি জজসাহেবের পাল্লায় পড়েছিলে? সুবিধে কিছু করতে পারলে, না—বুজরুকিই সার হলো ?

অজানা অচেনা একটা ছোকরাকে গায়ে পড়ে এভাবে কথা বলতে দেখে হুনীভাই ত অবাক! স্থির দৃষ্টিতে ক্ষণকাল ছোকরার মুখের পানে চেয়ে থেকে তারপর হাসিমুখে এবার বাঙলাতেই বললেন: জজসাহেবের সঙ্গে তোমারও বুঝি জানা শোনা আছে ? কিন্তু কি ব্যাপার বল ত ভাই ?

মুখখানার এক বিচিত্র ভঙ্গি করে চাপলি বললঃ ব্যাপার আবার কি—বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ উঠলে যা হয়—বিয়ে, বাবাজী, বিয়ে! ডাগর-ডোগর, আর দেখতে খুব সুরত এক মেয়ে দেখে জজ বুড়ো হন্যে হয়ে উঠেছে; ওদিকে আর এক রীতিমত পয়সাওয়ালা মার্চেণ্ট-বুড়োকেও সে মেয়ে মাত করে দিয়েছে।

এখন চলেছে টগ্ অফ ওয়ার। কিন্তু নামের জোর থাকলে কি হবে, জজ বুড়ো নেহাৎ কঞ্জুস্—সস্তায় কাজ বাগাতে চায়! ওদিকে সেই সওদাগর বুড়ো দিলদরিয়া লোক, টাকার পরোয়া করে না, তার কাছে কার সাধ্যি এগোয়? জজ এখন ফাঁকতালে কাজ বাগাবে বলে পায়তারা কষ্‌ছে। তা কি হয় বাবাজী? যাক্, তোমার সঙ্গে কি কথা হলো? তোমার ব্যাপারখানা কি, এবার শুনি ত!

ভুনীভাই বললেন: ব্যাপার হচ্ছে—সাদি। তুমি যে মেয়েটির কথা বললে—তাকে নিয়েই কথা হলো। জজসাহেব ভাল ঘর বর দেখে তার সাদি দিতে চান। কিন্তু তুমি ছোকরা ওসব খবর পেলে কোথা থেকে? উনিই যে ঐ মেয়েকে সাদি করতে চান—এ খবর তুমি কোথায় পেলে?

চাপলি রহস্যময় দৃষ্টিতে সাধুজীর দিকে চেয়ে বিকৃত মুখে বলল: বাবাজী যে দেখছি উলটো গাওনা সুরু করলে? জজসাহেব তাহলে নিজে ছাঁদনাতলা থেকে সরে এসে আর কাউকে সেখানে দাঁড় করাতে চান নাকি? সে ভাগ্যবানটি কে বাবাজী?

ভুনীভাই বললেন: তারই খোঁজ খবর নেওয়া হচ্ছে—এর জন্যে উনি রীতিমত টাকা ঢালতেও রাজি। সওদাগর বুড়োর কথাও শুনিছি, তার কপালে তেঁতুল গোলা ঢালবার ব্যবস্থা হচ্ছে—সেই জন্যই ত আমাকে আনিয়েছেন।

চাপলি জিজ্ঞাসা করল: আপনার পেশাটি কি? হাত গোণা—কি হবে তাই গুণে বলে দেওয়া?

ভুনীভাই বললেন: না—আমি গণৎকার নই। তবে জন্ম-পত্রিকা, কোষ্ঠী, ঠিকুজী—এই সব দেখে পাত্র-পাত্রীর বিবাহের মিল-অমিল বিচার করি।

চাপলি চমকে উঠে জিজ্ঞাসা করল: তাহলে জজসাহেব কি

ঐ নিরলা মেয়েটির কোষ্ঠী যোগাড় করেছেন—সেটা বিচার করতেই কি ওখানে বাবাজীর যাওয়া হয়েছিল ?

তিক্তকণ্ঠে তুনীভাই বললেন : নৈলে আমি কি ওখানে ঘাস কাটতে গিয়েছিলুম ?

চাপলি : আহা, চ'ট না বাবাজী !—ব'লেই পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেটটি বার করে একটি সিগারেট বাড়িয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করল : চলবে ত ?

তুনীভাই প্রত্যাখ্যান করে বললেন : না, আমার চলে না।

চাপলি পূর্বকথায় ফিরে এসে জিজ্ঞাসা করল : মেয়েটার কোষ্ঠী তাহলে দেখেছ। কি রকম দেখলে বাবাজী ?

তুনীভাই : ভালই দেখলাম। আর যাই হোক, ও মেয়ের অদৃষ্টে বুড়ো বর নেই। তোমাদের সওদাগর বুড়োর কাদা ঘাঁটাই সার হবে।

চাপলি : এখন বাবাজীর কি মতলব শুনি ?

তুনীভাই : ঐ বুড়ো ঘুঘুকে হুঁসিয়ার করে দেওয়া।

রীতিমত চঞ্চল হয়ে চাপলি বলে উঠল : অমন কাজও ক'র না বাবাজী ! তাহলে আমরা অনেকেই মারা যাব।

তুনীভাই মুখে একটু বিস্ময়ের রেখা ফুটিয়ে জিজ্ঞাসা করল : তার মানে ?

চাপলি জিভ ও ঠোঁটের সংযোগে একটা শব্দ করে বলল : মানে ত জলের মতন সোজা ! ওঁরই দৌলতে করে খাচ্ছি ; ওঁদের মত ঘাড়ে রোঁ-ওঠা বে-পাগলাদের মর্জিমত খবর যোগাতে একটা আফিস চলছে, সে খবর রাখ ? সেখানে ওঁরা দরাজ হাতে যখন তখন টাকা ঢালেন। এখন বাবাজী বুড়োর বাড়ী চড়াও হয়ে ভাংচি দিতে গেলে বুড়ো ত কথা কানে নেবে না, লম্বা দাড়ী দেখেও সমিহ করবে না, বরং উপড়ে নিতে পারেন।

কৃত্রিম একটা আতঙ্কের ভাব মুখে ফুটিয়ে তুনীভাই বললেন: বল কিহে ?

মনে মনে মজা অনুভব করে চাপলি বলল: আজ্ঞে! ডাক-সাইটে জাঁহাবাজ লোক—হাজারো গুণ্ডা নিয়ে কারবার। এর পর, আমরাই কি চুপ করে থাকব প্রভু ?

তুনীভাই শ্লেষের সুরে বললেন: বটে! কিন্তু কি করবে ?

চাপলি বলল: আমরাই তাকে উল্টে হুঁসিয়ার করে দেব। তোমার আগেই বুড়োকে বলব—জজসাহেবের টাকা খেয়ে এক ছাতুখোর দেড়ে আপনার মন ভাঙ্গাতে আসছে—হুঁসিয়ার!

তুনীভাই বললেন: তুমিত দেখছি ভারি সাংঘাতিক ছেলে হে! ডাহা মিথ্যে কথা বলবে ?

চাপলি বলল: মিথ্যা নিয়েই ত দুনিয়ার বেশাতি চলেছে; বাবাজীর কথাগুলি কি নির্জলা সত্যি ? ভেজাল নেই বলতে চাও বাবাজী ? এখন এক কাজ করা যাক এসো—যদি কিছু টাকা পয়সা করতে চাও ত দলে ভিড়ে যাও। নৈলে একুল ওকুল দুকুলই যাবে।

তুনীভাই কিঞ্চিৎ কৃত্রিম আড়ষ্টভাবে বললেন: কি করতে বল ?

চাপলি বলল: তাহলে ত বাবাজীকে আমাদের হেড আফিসে যেতে হয়!

তুনীভাই বললেন: বেশত, সেটা কত দূরে ?

চাপলি সহাস্যে বলল: কাছেই—পাঁওদলে গেলে পনের মিনিটের পথ, আর রিক্সায় গেলে ওর অর্দ্ধেক, তবে বাবাজীকে পকেট থেকে চার আনা খসাতে হবে। আফিসের নাম—কন্যাদায়োদ্ধার সমিতি।

তুনীভাই বললেন: তাতে কি হয়েছে—একটা রিক্সা ডাক, যাওয়া যাক। ওখানে গিয়েই বোঝাপড়া করা যাবে।

চাপলির আহ্বানে রিক্সা এসে গেল, তুনীভাইকে আগে রিক্সায় বসিয়ে, চাপলি তাঁর পাশে বসল। তুনীভাইয়ের প্রশ্নের উত্তরে চাপলি কন্যাদায়োদ্ধার সমিতির প্রসঙ্গে তার দুই মালিক হরিশ ও শশীর কথা দিব্যি ভনিতা করে শুনিয়ে দিতে লাগল।

চোরবাগানের গলির মধ্যে রিক্সা ঢুকতে চাপলি বলল: এই গলিতেই আমাদের আফিস। যথাস্থানে রিক্সা আসতেই চাপলির চীৎকারে রিক্সা থেমে গেল। তুনীভাই তাড়াতাড়ি ভাড়া চুকিয়ে দিলেন।

হরিশ তখন কি একটা কাজে পাশের ঘরে সেঁধিয়েছে—বাইরের আফিস ঘর খালি, কেউ সেখানে নেই। তুনীভাইকে একখানা কেদারায় বসিয়ে চাপলি বলল: ব'স বাবাজী, হরিশদা'কে ডেকে আনি—তিনিই হচ্ছেন বড় কর্তা, আলাপ করে খুশি হবে।

তুনীভাই কেদারায় বসে মনে মনে হাসলেন। ভাবলেন, এখনি হয় ত আর এক রহস্যের আবরণ খুলে যাবে। কন্যাদায়োদ্ধার সমিতির নামটি শুনলেও, আসি আসি করেও এ পর্য্যন্ত এই আফিসে তিনি আসতে পারেন নি। আজ ঐ ডেঁপো ছোকরাটির জন্যই এখানে তাঁর আসা হলো; আর, এর বড়কর্তার নামটিও শোনা গেল। কিন্তু এ নামের—

ওদিকে চাপলি পাশের ঘরে ঝড়ের মত বেগে প্রবেশ করে হরিশকে তার আনীত বাবাজীর কথা সব শুনিয়ে দিয়ে বলল: আর, আমার সঙ্গে যে-সব কথা হয়েছে, সবই আপনাকে বললাম দাদা; এখন আপনি দেখুন—জেরা করে আরো কিছু নতুন কথা যদি বার করতে পারেন!

মুখে একটু বেজারের ভাব প্রকাশ করে হরিশ বলল: ভ্যালা ঐ নিরলা মেয়েটাকে নিয়ে পড়া গেছে—নিত্যই একটা না একটা ফেচাঙ্ এসে জুটছে। চল দেখি—এঁর আবার মতলবখানা কি?

তোমাকে ত আবার এখান থেকে খবর নিয়ে নুটুবাবুর আফিসে যেতে হবে ?

চাপলি যেন প্রস্তুত হয়েই ছিল, তখনই বলল : হ্যাঁ—তো ! এখনি ছুটতে হবে। ফেচাঙ্ শুধু আপনাকে জ্বালায় না হরিশ দা, আমার কাছেও আসে। এখন তাহলে আপনি বাবাজীর সঙ্গে আলাপ করুন, সেই ফুরসদে আমিও পাশ কেটে সরে পড়ি।

এ-ঘরে আগন্তুকের মনের সংশয়টি নিষ্পত্তি হবার আগেই দরজা খুলে হরিশ ও চাপলি বেরিয়ে এল। হরিশ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আগন্তুকের চেহারা—বিশেষ করে লম্বা দাড়িটির বাহার দেখে থমকে দাঁড়াল। চাপলির এখন বিশেষ তাড়া—নুটুবাবুর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে। তারপর নিরলাদের বাড়ী গিয়ে সেখানেও খবরটা দিতে হবে—শনিবার নুটবিহারীবাবু কখন পাকা দেখতে যাবেন। কাজেই সে ডুনীভাইকে লক্ষ্য করে বলল : ইনিই এই আফিসের মালিক হরিশবাবু। আর এঁরই কথা আপনাকে বলছিলুম হরিশদা—আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চান। এখন আপনারা আলাপ করুন, আমি ঝাঁ করে একটু ঘুরে আসি।

কারও কাছ থেকে কোন উত্তরের প্রত্যাশা না করেই চাপলি সবেগে বেরিয়ে গেল। হরিশ আগন্তুকের বেশভূষার দিকে একই ভাবে বদ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন—মুখে কোন কথা নেই। সে দৃষ্টির অর্থ বুঝতে আগন্তুকের মত দক্ষ লোকের বিলম্ব হলো না, মৃদু হেসে পশ্চিম বঙ্গীয় বাংলা ভাষায় জিজ্ঞাসা করলেন : অমন করে চেয়ে চেয়ে কি দেখছ ? খুঁৎটুং কিছু চোখে ধরা পড়েছে নাকি ?

একটু গম্ভীর ভাবেই হরিশ বলল : ঠিক এই রকমের দাড়ী আগে দেখেছিলুম কিনা ! তার পর গলার স্বরও—

সহাস্যে আগন্তুক বললেন : চেনা-চেনা—এই ত ! আমাকে যে হিসেব করে কথা ভাবা ঠিক করে নিতে হয়। তোমার সঙ্গে বরাবর

বাংলা ভাষাতেই—সেও পশ্চিম বঙ্গের ভাষা—কথা বলেছিলুম মনে হচ্ছে। তবে তোমার কাছে আত্মগোপনের ইচ্ছা ত নেই—থাকলে, এ ভুল হোত না। ঐ ছোকরার কাছে যেই জানলুম—তুমিই কন্যাদায়োদ্ধার সমিতির পাণ্ডা, তখনই দেখা করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠি।

হরিশ জিজ্ঞাসা করল: আপনি কি এ খবর জানতেন না ?

আগন্তুক বললেন: নিশ্চয়ই না। অবিশ্যি, কন্যাদায়োদ্ধার সমিতির নাম শুনিছি, তাদের সঙ্গে বোঝাপাড়া করবার ইচ্ছাও ছিল—কিন্তু আজ যাই, কাল যাই করে হয়ে ওঠেনি। আজ যেই শুনলুম—তুমিই এর পাণ্ডা, তখনি চমকে উঠি; বুঝি যে, তুমি ডুবে ডুবে জল খেতে সুরু করেছ। আর সব দিক দিয়ে কাজ যখন গুছিয়ে নিয়েছ, তখন ভীমরুলকে আর দরকার কি ? তবে, ভীমরুল যে কি চীজ, সেটা নানা দিক দিয়ে জেনেও, তারপর—তোমাদের মৃত্যুবাণ ভীমরুলের হাতে, এ সত্ত্বেও যে তোমরা এতটা বে-হুঁসিয়ার হবে, সেটা কিন্তু কল্পনাও করা যায় না।

হরিশের কথা থেকেই আগন্তুক বা ভুনীভাই মানুষটির পরিচয় পাওয়া গেল। ইনি আর কেউ নন—ভীমরুল, তবে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ নকল বেশভূষায় এদিনের সাজপোষাক এক নতুনতম সংস্করণ। ভীমরুলের অনুযোগমূলক কথা শুনে আমতা আমতা করে হরিশ বলল: আপনার সম্বন্ধে আমি বা শশী—কেউই বে-হুঁস নই, জানি, আপনা হতেই নানা ব্যাপারে পয়সা উপায় করেছি—আপনি আমাদের ভাত-ভিত্তি সব।

ভীমরুল বললেন: তাহলে এভাবে প্রতিশ্রুতি ভাঙতে না। তোমাদের সঙ্গে সর্ত ছিল মনে নেই—কোন কিছু নতুন কারবার খুলতে হলে আমার মত নেওয়া চাই। তোমরাও কথা দিয়েছিলে, অথচ—আমাকে লুকিয়ে এই কন্যাদায়োদ্ধার সমিতি খুলে, এক দল

পয়সাওয়ালা বিয়ে-পাগলা বুড়োর ঘাড় ভেঙে পয়সা উপায় করছ, কিন্তু দেশের বয়স্থা মেয়েগুলোর কি সর্বনাশ এতে হচ্ছে, যদি কাজ গুছাবার পর খবর নিতে—তাহলে আর এ কাজে হাত দিতে না। কিন্তু তোমাদের পাপের ভরা পূর্ণ হয়ে উঠেছে—নিরলা দেবী নামে একটি মেয়েকে উপলক্ষ করে। জানো, পণপ্রথা বন্ধ করবার জন্য কলেজের মেয়েরা সমিতি খুলেছেন, তাঁদের উদ্দেশ্য মহৎ জেনে অনেকেই তাতে মাথা দিয়েছেন, আমিও তাঁদের সঙ্গে যোগ দিয়েছি। সরকার পর্য্যন্ত তাঁদের মহৎ উদ্দেশ্য বুঝে নয়া দিল্লীর কেন্দ্রীয় পরিষদে এ সম্বন্ধে আইন করবার ভরসা দিয়েছেন। আর—তোমাদের কন্যাদায়োদ্ধার সমিতির কীর্তিও সবাই জেনেছে, তোমাদের ওপর পুলিসের নজর পড়েছে, সমাজ-কল্যাণের নামে তোমরা সমাজবিরোধী এমন একটা সংস্থা খাড়া করেছ—প্রতারণা আর পয়সা উপার্জনের আখড়া ছাড়া আর কোন ভাল সংজ্ঞা তার দেওয়া যায় না। নিরলা মেয়েটি এই ব্যাপার নিয়ে পুকুর গুলিয়ে ফেলেছে, এর ফল শীঘ্রই জানতে পারবে।

বিচলিত অবস্থাতেই হরিশ বলল: জানি, আপনি বাজে কথা বলবার মানুষ নন। তাহলে কি আমাদের এই সমিতির ওপর উপরওয়ালাদের নজর পড়েছে বলতে চান ?

ভীমরুল বললেন: একজন অচেনা বিশিষ্ট ব্যক্তি তোমাদের সমিতিতে এনকোয়ারী করতে আসেন, ইচ্ছা করেই দশ টাকা দিয়ে স্পেসাল মেম্বার হন। তোমরা তাঁকে বয়স্ক দেখে, ঐ মুটো গাঙ্গুলীদের সামিল করে ভেবেছিলে, তিনিও একজন ক্যাণ্ডিডেট্। তিনি রিটায়ার্ড জজ জেনেও তোমাদের চৈতন্য হয়নি। কিন্তু ভাল করে খোঁজ নিলে জানতে পারতে, তাঁরই মেয়ে কন্যাপীঠের সেক্রেটারী, ওঁরা—নিরলার পক্ষ নিয়েছেন। তোমাদের দুশ্চিন্তা—জজসাহেব পাছে নিরলাকে দেখতে গিয়ে একটা গোল বাধিয়ে বসেন, কিন্তু

তিনি অত কাঁচা লোক নন—তোমাদের জব্দ করতে অন্য পথ খুঁজছেন।

হরিশ অগত্যা শঙ্কিত ভাবেই জিজ্ঞাসা করল: তাহলে আপনি এখন কি করতে বলেন?

ভীমরুল বললেন: তোমার এই আস্তানা থেকেই বিয়ে-পাগলা বুড়োদের পক্ষে পণ-পাগলা লোভী অভিভাবকগুলোকে রীতিমত সায়েস্তা করতে বলি। বয়স্থা মেয়ের লোভে বুড়োরা যেমন আসছে আসুক, কিন্তু এখন থেকে এই সমিতির লক্ষ্য হবে, কায়দা করে কোন রকম প্রমাণ না রেখে তার পর বিয়ের রাতে ছাঁদনাতলা থেকে বেকুব বানিয়ে তাদের ফিরিয়ে দেওয়া। তার পর, চোখের চামড়া বুজিয়ে যে সব পণ-পাহাড় ছেলের জন্যে চড়া দর হাঁকে বিয়ের ব্যাপারে, তাদের প্রত্যেককে রীতিমত আক্কেল দিয়ে শেষ পর্য্যন্ত বিনাপণে বিয়ের ব্যবস্থা করা। এই দুটো শুভ কাজের জন্য যদি অন্যায় করতে হয়, বিচারভার নিজেদের হাতে নিতে হয়, তাতে দোষ নেই; সমাজ আর আমাদের নিরুপায় ভগিনীদের মুখ চেয়ে এ দুটো কাজ চালিয়ে যেতে হবে—যে পর্য্যন্ত না বিলটা পাশ হয়ে যায়।

ইতস্তত: করে হরিশ বলল: কিন্তু এ দুটো কাজই যে ভারি শক্ত—এর জন্য অনেক ঝামেলা—

বাধা দিয়ে ভীমরুল বললেন: ঝামেলার ভয় তোমার নেই। তবে দুটো কাজই যে খুব শক্ত, আর এ কাজ নির্বিঘ্নে সমাধা করবার সামর্থ তোমার নেই, সে আমি জানি। তুমি শুধু দোকান খুলে বসে দোকানদারী করবে—ঝক্কি ঝামেলা সব আমিই সামলে নেব। উপস্থিত, দুটো কাজই হাতে এসে গেছে। একটার আসামী হচ্ছে, নুটু গাঙ্গুলী—তোমারই মক্কেল। তাহলেও ঐ লোকটিকে নতুন করেই এ ব্যাপারে ধরা গেল। আর একটির আসামী হচ্ছে, নসিরাম ঘোষাল, ভদ্রলোকের তিন ছেলে; দুটি ছেলের বিয়ে দিয়ে দুটো

ছাপোঁসা কন্যাপক্ষকে উদ্বাস্তু করেছে, এখন তাঁর হাতের পাঁচ এই ছোট ছেলে, এটি আবার গ্রাজুয়েট। এখন একে নিয়ে দর হেঁকেছেন—নগদ সাড়ে ছ' হাজার থোক, চল্লিশ ভরি সোনা, তার ওপর বরসজ্জা, ফারনিচার, নমস্কারী, সভাউজ্জ্বল খাট-বিছানা, বাসনপত্র। সবশুদ্ধ দশ হাজারের ধাক্কা। ভদ্রলোক ইঞ্জিনিয়ার, দু হাতে টাকা লোটেন, আর মাস মাইনে ত পৌনে দু'হাজার আছেই। তবুও এত খাঁই? কন্যাপীঠ এ কেস্ নিয়েছে, আর আমার ওপরেই এর তদারকের ভার পড়েছে। এখন তুমি যদি আমার প্রস্তাবে রাজি থাক, নতুন বিধি ব্যবস্থা চালু করে আমরা কাজে নামি, আর ঐ দুটো ব্যাপারের নিষ্পত্তি করে সকলকে জানিয়ে দিই—বিয়ে-পাগলা বুড়োদের বরাত ভেঙেছে, আর লোভী পণপাহাড়দের পিছনে জুজুরদল কোমর বেঁধে দাঁড়িয়েছে। কি বল—রাজী?

হরিশ সানন্দে বলল: নিশ্চয়ই। আপনি যখন এ কাজে হাত দিয়েছেন, কখনই নিষ্ফল হতে পারে না; তবে এ দুটো কাজ কি ভাবে শেষ করেন, আমাদের দেখতে হবে, আর—এ থেকে আমাদেরও হাতে খড়ি হবে।

ভীমরুল বললেন: তা'হলে এখনি কাজ সুরু হোক। আগেকার খাতাপত্র সব বাতিল করে নতুন কাজের পত্তন করা যাক। যারা টাকা দিয়ে গ্রাহক হয়ে গেছে—মন্তব্যের ঘরে হিসেব করে উদ্দেশ্যটি লিখতে হবে। তারপর—ঐ পণপাহাড় নসিরাম ঘোষালের নামটাও আলাদা খাতায় বসাতে হবে। কিন্তু সাবধান, তোমার স্নুটুবাবুর দল, কিম্বা সেই ফাজিল ছোকরা চাপলি যেন ঘুণাক্ষরেও জানতে না পারে!

হরিশ গলায় জোর দিয়ে বলল: আমি কি তেমনি কাঁচা ছেলে স্যার, যে কথা ফাঁস করে দেব। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আসুন—এখন খাতা পত্তন করা যাক।

সতেরো

আফিস থেকে ফিরে জলখাবার খেয়ে প্রসন্ন মনেই কালিদাসবাবু বাইরের ঘরে সবে মাত্র তক্তপোষের উপর বসেছেন, এমন সময় বাড়ীর সামনে হর্ণ দিয়ে একখানা মটর কার এসে দাঁড়াল। রাস্তার দিকে জাল দেওয়া খোলা জানালাটির ভিতর দিয়ে তাকাতেই সোফারের পাশে লাল পাগড়ীপরা এক মূর্ত্তি দেখেই কালিদাসবাবুর মনের প্রসন্নতা ঘুচে গেল, সভয়ে শিউরে উঠলেন। পুলিসের লোক নিয়ে এ সময় তাঁর বাড়ীতে কে এল? পরক্ষণেই মুক্ত দরজা দিয়ে দীর্ঘাকৃতি গম্ভীর মূর্ত্তী দুই বর্ষীয়ান পুরুষ কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করলেন। একজনের পরিচ্ছদে কোঁচানো ধুতি, একটু বেশী লম্বা গলাবদ্ধ কোট, কাঁধের উপর রেশমী চাদর একখানা পাট করে ফেলা, হাতে রূপা দিয়ে মাথা বাঁধানো সিঙ্গাপুরী বেতের লাঠি। আর একজন পুলিস অফিসারের ইউনিফরম পরে এসেছেন। এই সার্কেলে যে পুলিস ষ্টেসন আছে, ইনি সেখানকার বড় কর্তা। নাম—নলিনী সান্যাল। ভারি রাসভারী ও কঠিন প্রকৃতির লোক। কালিদাসবাবু দেখবামাত্রই এঁকে চিনতে পেরেছিলেন, তাই তাড়াতাড়ি উঠে সসম্ভ্রমে অভ্যর্থনা করলেন: আস্‌তে আজ্ঞা হোক, বস্‌তে আজ্ঞা হোক, আমার কি সৌভাগ্য!

তক্তপোষের উপরেই দুজনে বসলেন এবং বসতে বসতেই নলিনীবাবু জিজ্ঞাসা করলেন: আপনিই ত কালিদাসবাবু?

সবিনয়ে একটা ঢোঁক গিলে কালিদাসবাবু উত্তর করলেন: আজ্ঞে হ্যাঁ। এরপর একটু থেমে সবিনয়ে বললেন: আপনাকে আমি জানি, স্যার!

নলিনীবাবু মৃদু হেসে বললেন: আমাকে এ অঞ্চলে জানে না—এমন লোক ত দেখি না। কিন্তু এঁকে আপনি জানেন না বোধ হয়?

সদানন্দবাবুর দিকে সভয়ে আর একবার চেয়ে দেখে কালিদাস বাবু বললেন: আজ্ঞে না। দেখেও—

নলিনীবাবু বললেন: ইনি সদানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, হাইকোর্টের রিটায়ার্ড জজ। এখন শুনুন, আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রী নিরলা দেবীর সম্পর্কে আমরা দুজনেই একই রকমের রিপোর্ট পেয়েছি। তাঁকে একবার এই ঘরে আনান, আমরা কতকগুলি কথা জিজ্ঞাসা করব।

কালিদাসবাবু আর দ্বিরুক্তি না করে কম্পিত কণ্ঠে বললেন: যে আজ্ঞে, এখনি তাকে আনছি।

বাড়ীর ভিতরে তখন দুর্ভাবনার একটা ঝড় উঠেছে। পুলিস এসেছে শুনে সবাই তটস্থ হয়ে উঠেছে। কালিদাসবাবুকে দেখে গৃহিণী সারদা দেবী ব্যগ্র কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন: কি হয়েছে গা? পুলিস এসেছে কেন?

কালিদাসবাবু ভগ্নস্বরে বললেন: ভগবান জানেন। এ সার্কেলের ঝুনো কমিসনার নলিনীবাবু এক জজসাহবকে সঙ্গে করে এন্‌কোয়ারী করতে এসেছেন—নিরুকে বাইরের ঘরে যেতে হবে, তাঁকে কি সব জিজ্ঞাসা করবেন।

সারদা দেবী ত একবারে আকাশ থেকে পড়লেন, সেই সঙ্গে নিরলার উদ্দেশ্যে রীতিমত মধুবর্ষণ সুরু হলো, কিন্তু কালিদাসবাবু চাপা গলায় তাঁকে ধমক দিয়ে থামিয়ে নিরলাকে শীঘ্র তৈরী হয়ে তাঁর সঙ্গে আসতে বললেন। নিরলা নিত্যই এ সময় গা ধুয়ে কাপড় ছেড়ে

অভ্যাসমত একটু সেজেগুজে তার ঘরে আশ্রয় নেয়। ইদানীং শিবাণীও এই ঘরে আসে, অল ইণ্ডিয়া রেডিয়োর প্রোগ্রামগুলি এদের শোনা চাইই। এর জন্ম গঞ্জনাও সইতে হয়, কিন্তু সে সব দুই বোনের গা সওয়া হয়ে গেছে।

বাইরের ঘরে প্রবেশ করতেই নিরলা বুঝল জজ সাহেবটি কে? সে ঘরের মেঝের উপর বসে নত হয়ে ভক্তির সঙ্গে প্রথমে সদানন্দবাবু, তারপর নলিনীবাবু ও শেষে কাকাবাবুকে প্রণাম করল। নলিনীবাবু একটু হেসে বললেন: ব'স মা, ব'স। উনি না হয় তোমার কাকাবাবু, কিন্তু আমরা ত একবারে অচেনা মানুষ, আমাদের এমন করে প্রণাম করতে তোমার বিবেকে বাধল না?

অসঙ্কোচে, সপ্রতিভভাবে ও মিষ্ট স্বরে নিরলা বলল: দু'এক জন মানুষ থাকেন, তাঁদের দেখবামাত্র মনে হয়—যেন জন্ম-জন্মান্তরের আত্মীয়, গুরুজন। তাঁদের চরণে মাথা আপনি নুইয়ে পড়ে।

নলিনীবাবু সহাস্যে বললেন: বটে! জবাবটি খাসা দিয়েছ। তুমি তাহলে নিশ্চয়ই খুব বিদুষী।

কথাটা শুনেই কালিদাসবাবু খেঁকিয়ে উঠে বিকৃত কণ্ঠে বললেন: বিদুষী না বিদ্যের ঢেঁকী! রেডিয়ো শুনে আর যত রাজ্যের মাসিক পত্র খবরের কাগজ পড়ে খালি ডেঁপমী শিখেছে। স্কুল-কলেজে পড়েওনি, পাসও করেনি।

কথাটা নিরলার অন্তরে বুঝি কাঁটার মত বিধল, তাই সে আর চুপ করে না থেকে ধীরে ধীরে বলল: সে দোষত আমার নয় কাকাবাবু! এখনকার প্রগতির যুগে সে সুযোগ ত আপনি আমাকে দেননি। নিজের চেষ্টাতেই আমাকে এভাবে শিক্ষার সঙ্গে পরিচিত হতে হয়েছে, এর জন্যে আপনারই লজ্জিত হওয়া উচিত।

কালিদাসবাবু উষ্ণ হয়ে নলিনীবাবুকে লক্ষ্য করে বললেন:

শুনছেন মেয়ের কথা স্যার! স্কুল-কলেজে না গিয়েই এই, গেলে আর রক্ষা ছিল না।

নলিনীবাবু বললেন: এটা হচ্ছে যুগের হাওয়া কালিদাসবাবু। আপনার মতন অভিভাবকরাই এর জন্য দায়ী। এই আপনার কথাই বলি, নিজের মেয়েকে ত পড়াচ্ছেন, বাড়ীতে মাস্টার রেখেছেন শুনেছি; কিন্তু পিতৃমাতৃহীন ভাইঝিকে পড়ানো প্রয়োজন মনে করেননি। অথচ এই মেয়েটির আকৃতি, প্রকৃতি, কথাবার্তা থেকে স্পষ্টই বুঝতে পারা যাচ্ছে—একে যদি পড়াতেন, ভালভাবেই উতরে যেতেন। যাক্, আপনার পারিবারিক ব্যাপারে আমাদের কিছু বলতে যাওয়া হয়ত ঠিক নয়। এখন আপনাকে কিছুক্ষণের জন্য বাইরে যেতে হবে কালিদাস বাবু, আপনার সামনে এঁর এজাহার নেওয়া ঠিক হবে না।

প্রস্তাবটি মনঃপুত না হ'লেও প্রতিবাদ করবার মত সাহস না থাকায় কালিদাসবাবুকে নীরবেই বেরিয়ে যেতে হলো। নলিনীবাবু নিজেই উঠে ঘরের দরজাটি বন্ধ করে যথাস্থানে বসতে বসতে বললেন: স্পষ্ট কথা বলার জন্যে তোমাকে মা, এর পর হয়ত কাকা-কাকীর গঞ্জনা সইতে হবে।

নিরলা বলল: ওটা আমার গা-সওয়া হয়ে গেছে। তবুও আমার এমনি বদ অভ্যাস যে, মিছে কথা আর অন্যায় বরদাস্ত করতে পারি না। আমার ইতিহাস নিশ্চয়ই শুনেছেন, যে জন্যে এসেছেন তদন্ত করতে। কিন্তু ঐ যে বড়লোকের সঙ্গে ওঁদের কথাবার্তা চলেছে আমাকেই উপলক্ষ করে, এর জন্যে যে সব জ্বালাযন্ত্রনা সইতে হচ্ছে আমাকে, শুনলে আপনারাও আগুন হয়ে উঠবেন। এক একবার ইচ্ছা করে, আত্মহত্যা করি; কিন্তু আত্মঘাতীর মুক্তি নেই ভেবে, ভগবানকে ডেকে তাঁরই নাম জপ করি, আর তাতে শান্তিও পাই।

সদানন্দবাবু এই সময় নিরলাকে স্নিগ্ধ স্বরে শুধালেন : ভগবানকে তুমি তাহলে বিশ্বাস কর ?

নিরলা বলল : হিন্দুর ঘরে যখন জন্মেছি, আর খুব ছেলেবেলা থেকে বাপ মা'কে দেখেছি ঠাকুর দেবতাকে ভক্তি করতে, সে সব মন থেকে এখনো মুছে যায় নি। তার ওপর, আমার বাবা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। তাহলেই বুঝবেন—আমার রক্তেও প্রাচীন সংস্কৃতির যোগ আছে।

সদানন্দবাবু পুনরায় প্রশ্ন করলেন : তোমার কাকা ত বলে গেলেন, লেখা পড়া কিছুই হয়নি তোমার—স্কুলেও যাওনি। কিন্তু তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে, যে দিক দিয়েই হোক, পড়াশোনা তুমি করেছ নিজের চেষ্টায়—নয় কি ?

নিরলা একটু থেমে বেশ বিনয়ের সঙ্গে বলল : আপনারা পিতৃতুল্য ব্যক্তি ; তার ওপর আপনাদের যে পরিচয় পেয়েছি, মানুষের মুখ দেখে তার ভিতরটা জানবার মত ভগবানদত্ত ক্ষমতা আপনাদের আছে। তাই আপনার কথাটা অস্বীকার করব না। ছেলেবেলায় মেয়েদের স্কুলে কিছু দিন গিয়েছিলাম, তারপর কাকাবাবু স্কুল থেকে নাম কাটিয়ে দেন। আমার তখন কি কান্না! কিন্তু মনে মনে জিদ হলো, স্কুলে না গেলেও পড়া কখনো ছাড়ব না। কাকার মেয়েকে যে মাষ্টার পড়াতে আসতেন, আমার আগ্রহ দেখে তিনি আমাকে দয়া করে পড়াতেন। কাকাবাবু বিরক্ত হয়ে তাঁকে বলতেন, ওর জন্যে আমি কিন্তু আপনার মাইনে বাড়াতে পারব না। তিনি শুনে বলতেন—সে ভয় আপনার নেই, আমার পক্ষে একাজটি ঠিক বোঝার ওপরে শাকের আঁটির মত, কোন অসুবিধা হবে না। তাঁর কাছে আমি শিক্ষার জন্যে ঋণী হয়েই আছি, ঋণমুক্তির কথা মনে হলে কান্না পায়। এখনো তিনি আমাকে ছাড়েন নি, অনেক বয়েস হয়েছে, চোখে দেখতে পান না, তবু বলেন—এ যে আমার বোঝার ওপর শাকের আঁটি মা!

সদানন্দবাবু বললেন: এক্ষেত্রে, মনে যদি কৃতজ্ঞতা থাকে, ভগবানই সেটা স্বীকার করবার সুযোগ দেন। তখন সে সুযোগ কেউ কেউ গ্রহণ করেন, আবার অনেকে ভুলে যান—গা করেন না। তবে, তেমন সুযোগ যদি তোমার অদৃষ্টে আসে, তুমি তখন ভাল করেই গুরু দক্ষিণা দিও। এখন যে জন্য আমরা এসেছি, সেই কথাই হোক।

নলিনীবাবুও এই সময় বললেন: কথাটা হচ্ছে—তোমার বিবাহ সম্পর্কে। নুটবিহারী নামে এক বৃদ্ধ বড়লোক নাকি তোমাকে বিয়ে করতে চান; এই বিবাহে তিনি খুব খরচপত্রও করতে প্রস্তুত। তোমার কাকা তাতে মত দিয়েছেন, কিন্তু তোমার নাকি খুব আপত্তি। এই খবরগুলো সত্য কি না, তারপর—তোমার এ সম্বন্ধে কোন নালিশ যদি থাকে—কর্তব্য হিসাবে আমাদের জানা উচিত। সেই জন্যই আমরা এসেছি।

নিবিষ্টমনে নিরলা কথাগুলি শুনল, কিছুক্ষণ নীরবে মনে মনে আলোচনা করল; তারপর আস্তে আস্তে বলতে লাগল: দেখুন, আপনারা যে সব কথা জানতে চাইছেন, আমি যতটা সম্ভব সংক্ষেপে আপনাদের কাছে বলছি, তা থেকেই আপনারা বুঝতে পারবেন—কি রকম একটা বিশ্রী পরিস্থিতির ভিতর দিয়ে এ-বাড়ীতে আমাকে দিন কাটাতে হচ্ছে। কাকাবাবুর প্রথমে ইচ্ছা ছিল, হাজারখানেক টাকা খরচ করে আমাকে এমন ঘরে আর এমন পাত্রের হাতে দেবেন—খাওয়া পরার কষ্ট যেখানে না পেতে হয়। এরপরই চোরবাগানের কন্যাদায়োদ্ধার সমিতির বিজ্ঞাপন পড়ে তাঁর মত ঘুরে যায়। তিনি জানতে পারেন, ঐ সমিতির মারফতে টাকাওয়ালা বুড়ো পাত্রের হাতে দিতে পারলে, টাকা পয়সা কিছু লাগেনা—উল্টে তারাই টাকা গয়না মায় বিয়ের খরচ পর্য্যন্ত দিয়ে মেয়ে নিয়ে যায়। তেমনি এক বুড়ো পাত্রের সঙ্গে কথাবার্তা পাকা হয়ে গেছে। আসছে শনিবার সেই পাত্র পাকা দেখতে

আসবে। এদিকে উইমেনস্ কলেজের মেয়েরাও এক সমিতি খুলেছেন বিপন্না ছাত্রীদের রক্ষা করবার উদ্দেশ্য নিয়ে। আমি এই সমিতিকে চিঠি লিখে আমার অবস্থার কথা জানাই। তাঁরাও সঙ্গে সঙ্গে আমাকে ভরসা দিয়ে জানান যে—আমার কোন ভয় নেই; ঐ বুড়ো বরকে তাঁরা সায়েস্তা করবেন। এটা খুব গোপনীয় কথা। ওদিকে কেন জানিনা—সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি আমার কাছে চাপ্লি নামে এক ডেঁপো ছোকরাকে চর করে পাঠান। সে ক্রমাগত আমার কানে মন্তর দিতে থাকে—বুড়োর কত বড় নাম, কত ধন দৌলত, মস্ত কারবারে কত লোক খাটে, আমাকে কত সুখে রাখবে—এই সব। এই সঙ্গে কাকাবাবুকে জানায় যে, এক বুড়ো জজ ও এখানে ক্যান্ডিডেট্, তিনি যেন জজ ব'লে সেদিকে না ভেড়েন। শুধু কি তাই, আমার কাছে পর্য্যন্ত ঐ ডেঁপো ছোকরা তাঁর নামে চুকলি কাটতে থাকে। শেষ পর্য্যন্ত আমি বরদাস্ত করতে না পেরে তাকে শুনিয়ে দিই—যাঁর নামে এই সব কথা বলছ, তিনি ত কোন দিন এখানে আসেন নি, কোন প্রস্তাবও তোলেন নি। এ হচ্ছে ঐ ধড়িবাজ বুড়োকে বাড়াবার মতলব। কিন্তু যাই কর—ভবি ভোলবার নয়, এটা মনে রেখ। এরপর সে আবদার ধরে—আমার কি কি চাই, তার ফর্দ আগে থেকে জানিয়ে দিলে পাক দেখার দিন, তিনি সেইসব জিনিস এনে আমাকে তাক্ লাগিয়ে দেবেন। সে ফর্দ অবিশ্যি আমি দিই নি; তবে সে ছোকরা ত নাছোড়বান্দা—আজই হোক বা কাল সকালেই হোক, এসে হাজীর হবেই। এই আমার বর্তমান জীবনের মোটামুটি কাহিনী—আমি একটু বাড়িয়ে বা মিছে করে কিছুই বলিনি।

নলিনীবাবু বললেন: তোমার এ ভাবে বলা থেকেই আমরা সেটা বুঝেছি। কিন্তু ঐ জজসাহেবটি সম্বন্ধে তোমার মনে কোন সন্দেহ হয় নি?

মুখখানা বিকৃত করে নিরলা বলল: মহাভারত! ও কথা শুনলেও দোষ হয়। শিক্ষা, সভ্যতা, সংস্কৃতির সঙ্গে যাঁদের পরিচয় থাকে, ধর্মাধিকরণে বসে ন্যায়-অন্যায়ের যাঁরা বিচার করেন, তাঁদের নামে এ রকম অপবাদ ঐ মুটবিহারীবাবুর মত বিয়ে-পাগলা বুড়োরাই রটাতে পারে।

: সেই জজটির নাম শুনেছ?

: হাঁ—আগেই নামটা ওঁরা রটিয়েছিলেন।

নলিনীবাবু সদানন্দবাবুর দিকে অপাঙ্গে চাইতেই সদানন্দবাবু দিব্যি গম্ভীর মুখেই নিরলাকে জিজ্ঞাসা করলেন: কিন্তু সেই জজ-সাহেবটি কন্যাদায়োদ্ধার সমিতিতে দশ টাকা ফী দিয়ে যখন মেম্বর হয়েছিলেন, সেক্ষেত্রে তাঁর প্রতি তোমার মনোভাবটি আমরা কি ভাবে কল্পনা করতে পারি?

বিরক্তির সুরে নিরলা উত্তর করল: আমি যা জানি না, তাই নিয়ে আমার কোন কথা বলা কি উচিত? নমস্য গুরুজন ভেবে আমি যাঁদের শ্রদ্ধা-ভক্তি করি, তাঁদের সম্বন্ধে বদ লোকে অপবাদ যদি রটায়, আমি সেখানে শ্রীবিষ্ণু স্মরণ করি।

প্রশ্নটির এভাবে তিক্ত অথচ প্রীতিকর উত্তর পাবেন, সদানন্দবাবু সেটা বোধ হয় প্রত্যাশা করেননি, সুতরাং প্রসন্ন হয়েই তিনি বললেন: তুমি মা, জিতে গেছ। তোমার উত্তর শুনে আমরা খুশি হয়েছি। আর এই সার্কেলের শান্তিরক্ষকদের বড় কর্তা যখন উপস্থিত থেকে সব শুনলেন, তখন তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার।

নলিনীবাবু বললেন: যাঁরা তোমাকে ভরসা দিয়েছেন মা, তুমিও তাঁদের পাল্টা ভরসা দিতে পার—টাকার গরমে মুটবিহারীবাবুরা তোমার মাথার একগাছা চুলও ছুঁতে পারবে না। আর—রূপে-গুণে কার্ত্তিকের মত ছেলের গলাতেই তুমি মা বরমাল্য দেবে। তবে এ সব কথা তোমার কাকাবাবুও যেন না জানতে পারেন।

তুমি যে রকম বুদ্ধিমতী, হিসেব করে কথা বলতে জান, ভবিষ্যত ভেবে কাজ করতেও শিখেছ, সেখানে তোমাকে বেশী কিছু বলাই বাহুল্য মনে করি।

সদানন্দবাবু বললেন: যাই হোক, খুবই একটা ভাবনা হয়েছিল, যেদিন তুমি কলেজের কন্যাপীঠকে প্রথম চিঠি দাও, সেই দিন থেকেই তোমাকে দেখবার ভারি ইচ্ছা ছিল মা, কিন্তু হয়ে ওঠেনি। আজ কিন্তু এসে আর তোমার কথাবার্তা শুনে অত্যন্ত খুশি হয়েছি। এখন তবে উঠি।

তাঁ'রা উঠতেই নিরলা হেঁট হয়ে প্রণাম করে ওষ্ঠপ্রান্তে হাসির একটু ক্ষীণ রেখা ফুটিয়ে জিজ্ঞাসা করল: তাহলে পরীক্ষায় পাশ করেছি?

সদানন্দবাবু বললেন: একবারে ফার্স্ট ডিভিসনে—টপে যেখানে নাম ওঠে।

উভয়েই স্মিতমুখে নিরলার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন—নারীমাত্রেরই যেটি একান্ত কাম্য।

এই সময় নিরলা মৃদু স্বরে বলল: যাবার আগে কাকাবাবুর সঙ্গে একবার দেখা করবেন না? তিনি হয়ত কত কি ভাবছেন! তারপর—আপনারা চলে গেলেই আমাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করবেন, কি সব কথা হলো? তার চেয়ে আপনারা যদি একটিবার দেখা করে—

নলিনীবাবু উৎফুল্ল মুখে বললেন: শোনহে বাঁড়ুয্যে নিরলা মার কথা,—ঠিক বলেছ মা, আমরা কিন্তু ওদিকটার কথা একবারেই ভাবিনি।

সদানন্দবাবু বললেন: হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওঁকে এখানেই ডেকে নিরলার জবাবদিহির ব্যাপারটা বন্ধ করা যাক্। তুমি মা, নিজে গিয়ে কাকাবাবুকে আমাদের নাম করে এখানে ডেকে নিয়ে এস ত।

যেন কতকটা নিশ্চিন্ত হয়েই নিরলা ক্ষিপ্রপদে চলে গেল। কালিদাসবাবু তখন দোতালার দালানে বসে গম্ভীর মুখে স্ত্রীর সঙ্গে এ সম্বন্ধেই আলোচনা করছিলেন। তাঁর কথা থেকেই প্রকাশ পাচ্ছিল, ওঁদের সামনে নিরলাকে চড়া কথা বলার জন্য অনুতপ্ত হয়েছেন। এ অবস্থায় নিরলাকে দেখেই জিজ্ঞাসা করলেন: ওঁরা চলে গেলেন নাকি ?

নিরলা বলল: না, বসে আছেন—আপনাকে নিয়ে যেতে বললেন।

'তাই নাকি ? আচ্ছা চল।' বলেই তিনি উঠে পড়লেন।

নিরলা সঙ্গে থাকলেও কালিদাসবাবু কোন প্রশ্নই তাকে করেননি, নীরবে একেবারে বাইরের ঘরের ভিতরে গেলেন। নলিনীবাবু ও সদানন্দবাবু উভয়েই তাঁকে সম্বর্ধনা করলেন: আসুন, আসুন।

নলিনীবাবু বললেন: দেখুন, আপনার এই ভাইঝির বিবাহ সম্পর্কে আমরা দুজনেই খবর পেয়েছিলাম যে, তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর জবরদস্তি করে কোন কুখ্যাত ধনীর হাতে তাঁকে তুলে দেওয়া হচ্ছে; এই নিয়ে পাড়ায় শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। এ ক্ষেত্রে আমরা তদন্ত করতে বাধ্য, আর এসেই প্রথমে ওঁরই জবানবন্দী নেওয়া প্রয়োজন মনে করি। সেজন্যে আপনাকে—বুঝতে পেরেছেন কথা আমার ?

কালিদাসবাবু বললেন: আপনারা কর্তব্যই করেছেন, এর জন্য আমার দুঃখ করবার কিছু নেই। কিন্তু আমার ভাইঝির জবান-বন্দী থেকে—

নলিনীবাবু খপ করে বললেন: ওঁর জবানবন্দী থেকে বুঝলাম খবরটা ঠিক নয়। কেননা, আপনার ভাইঝির পক্ষে ও সম্বন্ধে কোন নালিশই নেই। উনি বললেন—বিয়ের কথা চলেছে, পাত্র

খুব পয়সাওয়ালা, তাঁকে দিতে-থুতে কিছু হবে না। বিয়ের কথা-বার্তা হচ্ছে, এখনো পাকা দেখা হয়নি। উনি স্পষ্টই বললেন—ওঁর বাপ-মা আপনার ওপর যে দায় চাপিয়ে গেছেন, এভাবে আপনি তা থেকে রেহাই পেলেই উনি খুশি হবেন। কাজেই এখানে আমাদের করবার কিছু নেই।

পুলিসের বড় কর্তার মুখে নিজের বিদ্রোহিনী ভাইঝি সম্পর্কে এ ধরনের কথা শুনে কালিদাসবাবু বিস্ময়ে যেন বিহ্বল হয়ে পড়লেন। তিনি এতটা প্রত্যাশা করেন নি। ভেবেছিলেন, নিরলা মুটবিহারী বাবুর সম্পর্কে সব কথাই ফাঁস করে দেবে, তারপর চাপলি নামে ডেপো ছেলেটার বারবার আনাগোনা এবং তাকে প্রলুব্ধ করবার প্রসঙ্গও বাদ যাবে না। বাইরের একটা ছোকরাকে এভাবে আস্কারা দেওয়ার জন্য হয়ত তাঁকেও জেরার সম্মুখীন হতে হবে এবং যদি দুটো কড়া কথা শুনিয়ে দেন তাঁকে, নীরবেই পরিপাক না করে তাঁর পক্ষে উপায় নেই। হয়ত, এ সূত্রে সম্বন্ধটাই ভেঙে দেবেন। কিন্তু তার পরিবর্তে তিনি একি শুনলেন? মনের উল্লাস চোখে মুখে ফুটিয়ে তিনি নিরলার দিকেই তাকালেন। এ অবস্থায় তাঁর মুখ দিয়ে কোন কথাই বেরুল না।

দুই বিজ্ঞ বর্ষীয়ান পুরুষ এক সঙ্গেই গৃহস্বামী কালিদাসবাবুর দিকে তাকিয়ে ছিলেন। সহসা বিপন্ন ও উদ্বিগ্ন গৃহস্বামীর মুখে প্রসন্নতার আভাস পেয়ে তাঁরাও ব্যাপারটি উপলব্ধি করলেন। তারপর আর এক দফা এই বুদ্ধিমতী মেয়েটির প্রশংসা করে বিদায় নিলেন।

আঠারো

কালিদাসবাবুর কন্যা শিবাণী নিরলার প্রায় সমবয়স্কা। বসন-ভূষণে সেজে এসেন্স পাউডার মেখে সব সময়ই তাকে ফিটফাট হয়ে থাকতে দেখা যায়। আগে সে নিরলাকে এড়িয়ে চলত, তাকে যেন পছন্দই করত না। বিশেষ করে স্কুল-কলেজে পড়া-শোনা না করেও, তারই প্রাইভেট টিউটারকে পাটিয়ে-সাটিয়ে পড়াশোনার ব্যাপারে দিব্যি কাজ গুছিয়ে নিচ্ছে দেখে শিবানী মনে মনে হিংসায় জ্বলতে থাকত। এ অবস্থায় নিরলার সঙ্গে তার সদ্ভাব বা সম্প্রীতি না হওয়াই সম্ভব। বিশেষ করে শিবানী যে চাপা প্রকৃতির মেয়ে, নিরলা গোড়া থেকেই সেটা জানে; আর—ইদানীং কলেজেও সহপাঠিনী ছাত্রী মহলে সে এই আখ্যা পেয়েছে। চাপা মেয়ে বলে প্রায় একটা বছর ধরে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ক্লাসের ছাত্র হীরালালের সঙ্গে তার বিশেষ ঘনিষ্ঠতার কথা কেউ জানতে পারে না! সেও কাউকে জানবার সুযোগ দেয় নি। কিন্তু একদিক দিয়ে এই মেয়েটির যেমন কথা চেপে রাখবার ক্ষমতা ছিল, আর একদিক দিয়ে অতিমাত্রায় সে ছিল আত্মসচেতন। ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউটে শবিানীর আবৃত্তি ও গান শুনে পোষ্ট গ্রাজুয়েট ক্লাশের ছাত্র-হীরালাল যখন তার একান্ত পক্ষপাতী হয়ে ওঠে, সেই সময় শিবানী তার অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টির সাহায্যে জ্ঞাতব্য তথ্যগুলি জেনে এবং নিঃসন্দেহ হয়ে তবে ঘনিষ্ঠতার পথ খুলে দেয়। 'যার সনে যার

মজে মন, কিবা হাড়ি—কিবা ডোম'—প্রেম ধর্মের এই প্রবচনে তার আস্থা না থাকায়—সামাজিক ও পারিবারিক সংস্কার মূলক জাতি কুল বর্ণ গোত্র সব বিচার করে তবে সে চোখে ও মনে লাগা মানুষটিকে প্রশ্রয় দিয়েছে। আরও আশ্চর্যের কথা এই যে, শুধু প্রেমের খাতিরে নয়, বাবার সুবিধা ও অর্থ-সামর্থের কতকটা সুসার করবার উদ্দেশ্যও এ-ব্যাপারে প্রচ্ছন্ন থাকে। তার সুবিধা-বাদী বাবার মত সেও এই প্রেমের ব্যাপারে নিজেদের সুবিধাটুকুর হিসেব করেই তবে হীরালালের সঙ্গে মন-প্রাণ খুলে মিশতে পেরেছে। সে যখন বুঝতে পারে, হীরালাল তাকে পাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে, আর ভরসাও দিয়েছে—তারা বাবাকে সে যেমন করেই হোক এ বিবাহে রাজী করাবেই, তখন সে আত্মমর্যাদা রীতিমত বজায় রেখেই হীরালালের সঙ্গে ভালভাবে মেলামেশা করে, সিনেমা-থিয়েটার বা ফুটবল-ক্রিকেট খেলা দেখতে অসংকোচে তার সঙ্গ নেয়। এরপর, যখন বেশ বুঝতে পারে, তাদের এই আসক্তি ক্রমশঃই নিবিড় হয়ে উঠছে, তখন একদিন হীরালালকে শিবানী বলল: আর আমাদের এগিয়ে যাওয়া ঠিক নয়। আমাদের ঘনিষ্ঠতার কথা বাড়ীতে জানেনা। তুমি এখন কথাটা এমন ভাবে বাড়ীতে পাড়, তাঁরা যাতে শীগ্‌গীর দেখতে এসে বিয়ের দিনস্থির করে ফেলেন। তোমার বাবাকে বলবে, কুল শীল গাঁই গোত্র—কোন দিক দিয়েই অমিল নেই, একেবারে রাজযোটক।

এম-এ ক্লাসের ছাত্র হোলেও শিবানীর তুলনায় হীরালালের বুদ্ধি অনেক কাঁচা, সে শিবানীর বাপের প্রসঙ্গটি সবদিক দিয়ে ভনিতা করে এমন উজ্জ্বলভাবে মায়ের কাছে বলল, যাতে মা বুঝলেন—বংশমর্যাদা ছাড়াও মেয়েটির বাবা রীতিমত পয়সাওয়ালা লোক। শিবানী কিন্তু হীরালালকে পই পই করে বলেছিল: তারা বাবার কুল শীল বড় হোলেও তিনি বড় লোক নয়। বিয়েতে

চলন্ সই মোটামুটি খরচ অবিশ্যি করবেন, কিন্তু তা ব'লে তোমার বাবা যদি বেশী খাঁই করেন, তিনি পেরে উঠবেন না।

একথার উত্তরে হীরালাল তাকে এই বলে আশ্বাস দিয়েছিল: আমার বাবার পয়সার অভাব নেই, তিনখানা বড় বড় বাড়ী ভাড়া খাটে, তিনি অগাধ টাকার মানুষ। তবে গরীবের ছেলে ছিলেন ব'লে, আর ছেলেবেলায় খুব কষ্টে মানুষ হন, তাই টাকার ওপর তাঁর একটু দরদ বেশী—এই যা। এখন তাঁর ছেলে যখন মেয়ে পছন্দ করেছে, তিনি এতে কোন রকম খাঁই করবেন না।

গৃহিণী সুবাসিনী দেবীর মুখে সব কথা শুনে নসিরাম ঘোষাল মশাই একদিন কালিদাসবাবুকে চিঠি লিখে জানালেন: আপনার মেয়েকে দেখে আমার ছেলে পছন্দ করেছে। কুল-পরিচয় পেয়ে জানতে পারলুম, মহাশয় আমাদের পালটি ঘর। যাই হোক, আসছে রবিবার সকালে আমি ওখানে গিয়ে সাক্ষাৎ এ সম্বন্ধে আলোচনা করতে চাই ইত্যাদি।

চিঠি প'ড়ে কালিদাসবাবু অবাক হয়ে যান। কিন্তু গৃহিণীকে জিজ্ঞাসা করতেই জলের মত ব্যাপারটি বুঝিয়ে দিলেন। বললেন: সেই যে ওদের কলেজে জলসা হয়েছিল, শিবি তাতে গান গায়, সেই গান শুনে নসিরামবাবুর ছেলে ওকে বিয়ে করবার জন্যে মেতে ওঠে। কিন্তু তোমার মেয়ে ত আর নিরির মত কাঁচা নয়, আগে সব জেনে শুনে যখন জানতে পারে—ওরা আমাদেরই পালটি ঘর তখন তার সঙ্গে একটু আধটু নাকি মেলামেশা ক'রে ওদের সব খবরের সন্ধান নেয়। খুব নাকি বড় লোক, মস্ত বসত বাড়ী, তিনখানা বাড়ী ভাড়া দেয়। তোমার ত মেয়ে, ও চায় তোমারই সুসার করতে—ভাল পাত্র যোগাড় করে তোমাকে আসান দিতে। বেশ'ত, মিনসে রোববার আসবে লিখেছে—আসুক না, দেখ না কথাবার্তা কয়ে।

কালিদাসবাবু গুম হয়ে যান। ভাবেন : আজকালকার মেয়েরা হোল কি? নিজেই নিজের সম্বন্ধ করে বিয়ের কাজ এগিয়ে রাখতে চায়? ভালো, দেখা যাক—ভদ্রলোক ত আসুক।

কিন্তু যথা সময় ভদ্রলোক এসে যে ফর্দ দাখিল করলেন, তাতে কালিদাস বাবুর চক্ষুস্থির! তিনি ভেবে পাননা, এ কি রকম প্রকৃতির লোক। এসেই দু'চারটে কথার পর একবারে পরম প্রশ্ন করলেন : কি রকম খরচ পত্র করবেন?

কালিদাসবাবু বললেন : আগে মেয়ে দেখুন, মিষ্টিমুখ করুন, তার পরে ও কথা হবে'খন।

কিন্তু নসিরামবাবু বেশ শক্ত হয়েই বললেন : পরে নয় মশাই—ঐটিই আগের কথা। আর, মেয়ে দেখার হাঙ্গামা ত হয়েই গেছে; ছেলে যখন দেখে পছন্দ করেছে, আমার দেখার কি আর দরকার আছে বলতে চান? এখন আমাদের কথাই হোক। আর ঐ যে মিষ্টিমুখ করবার কথা বললেন, ওটাও নিছক বাজে। অষ্টগণ্ডা পয়সার নিমকি সিঙ্গাড়া আর গজা খাওয়ালেই কি মন ভুলবে মনে করেন? ও-সব ঝন্‌ঝাট বাড়াবার কোন প্রয়োজন নেই। বিয়ের যেটা সেরা অঙ্গ—সেই দেনা-পাওনার কথাটাই আগে হোক।

কালিদাসবাবুর মনে হলো, ছেলে মেয়ের ব্যাপারে নানা প্রকৃতির লোক দেখেছেন, কিন্তু এ রকম 'কিম্ভূত-কিমাকার' প্রকৃতি তাদের মধ্যে কারও দেখেছেন বলে মনে হলো না। অগত্যা তাঁকে বলতে হলো : বেশ, আপনিই তা'হলে বলুন।

নসিরাম : আমার মশাই ভারি ভুলো মন, তাই লিখে এনেছি; এখন ফর্দটা শুনুন।

বলেই পকেট থেকে সাদা কাগজের উপর লাল কালিতে লেখা এক ফর্দ লম্বা কাগজ বা'র করে কালিদাসবাবুর দিকে পরিপূর্ণ

দৃষ্টিতে একটিবার চেয়েই অভিনেতার মত মোয়্যান দিয়ে পড়তে আরম্ভ করলেন :

প্রথম দফা—নগদ···সাত হাজার টাকা। তার জায় হচ্ছে—পাত্রের প্রত্যেক পাশটির জন্যে পণের হার দু' হাজার ; ম্যাট্রিক, আই-এ, বি-এ—তিনটির দরুণ দু'হাজার হিসেবে ছ'হাজার ; আর—এম-এ পড়ছে ব'লে—হাজার, মোট হলো নগদ পণ—সাত হাজার টাকা। দ্বিতীয় দফা—সোনা···চল্লিশ ভরি। গয়নার জায় কথা পাকা হলে বলা যাবে। তৃতীয় দফা—রূপা···একশো ভরি। যদিও রূপার গয়না তোড়া, মল, চুটকি এ সবের রেওয়াজ নেই, কিন্তু দাবী ঠিক আছে। আপনারা ও-গুলোর বদলে থালা রেকাব দেবেন। চতুর্থ দফা—বরাভরণ···সোনার হাত-ঘড়ি, আংটি, বোতাম, চশমা, রেশমী জামা, হালফ্যাসানের সেরা জুতা, মোজা ইত্যাদি। পঞ্চম দফা—ঘর সজ্জা···জুবিলী রেডিও—অল্ ওয়েভ্···দাম দেড়শো টাকা। এখানে ফর্দ থেকে মুখখানা তুলে বললেন : দেখুন, আমি কেমন হিসেবী মানুষ, চড়া দামের ফরেন্ রেডিওর বদলে স্বদেশী রেডিও ফর্দে ফেলেছি। তার কারণ, দামের তুলনায় জিনিষটা খাস', স্পষ্ট আওয়াজ শোনা যায়—

কালিদাসবাবু বললেন : জানি। আমার বাড়ীতেও জুবিলী রেডিও চলে ; তবে শুধু কলকাতার। কিন্তু বিয়ের ফর্দে যে রেডিও প্লেস পেয়েছে, এটা জানা ছিল না !

নসিরাম বললেন : সে কি মশাই, দু'বছরের ওপর হতে চলল—ফর্দে রেডিও চালু হয়েছে। এখন শুনুন—পঞ্চম দফার পরের আইটেম হোচ্ছে খাট-বিছানা, ফারনিচার, ছবি, দেওয়াল ঘড়ি। এসব আমার লোক সঙ্গে থেকে পছন্দ করে দেবে। ষষ্ঠ দফা—নমস্কারী তাঁতের কাপড়—পঞ্চাশ খানা, তার মধ্যে শাড়ী অর্ধেক, ধুতি অর্ধেক। আর পট্টবস্ত্র অর্থাৎ আসল গরদের শাড়ী তিন খানা, ধুতি তিন খানা।

কালিদাসবাবু এসময় অসহিষ্ণুভাবে বলে উঠলেন: নমস্কারীতে বরাবর ত শাড়ীই ধরা হয়, কিন্তু ধুতি অর্ধেক কি জন্যে?

নসিরামবাবু উত্তর দিলেন: নমস্কারের যাঁরা যোগ্য তাঁরা কি সবাই মেয়ে? পুরুষ গুরুজন যাঁরা, তাঁরা কি আপনার কন্যার নমস্কার বা প্রণাম প্রত্যাশা করবেন না, বলতে চান? এর পর সপ্তম দফা হচ্ছে—সভাউজ্জ্বল দান সামগ্রী; যেমন—ঘড়া, গাড়ু, থালা, বাটি, গেলাস, বালতি, পানের বাক্স, পিলসুজ, পিকদানি, জলচৌকি, গালচের আসন—এই সব আর কি। এগুলোও আমার লোক পছন্দ করে দেবে।

কালিদাসবাবু সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করলেন: আর কিছু আছে?

নসিরামবাবু গম্ভীর মুখে বললেন: না—এইখানেই ইতি। এখন বলুন, যদি রাজী থাকেন--

কালিদাসবাবু তেমনি সবিনয়ে বললেন: ফর্দ যা পড়লেন, সর্ব-সাকুল্যে পনেরো হাজারের ধাক্কা। এ টাকায় আমাদের ঘরে পাঁচটা মেয়ে পার হবার কথা।

নসিরামবাবু বললেন: কিন্তু ঘর-বরের কথাটাও ভাববেন—ছেলে তিনটে পাস, এম-এ পড়ছে। বাপের বসতবাড়ী তৈরী করতে আশি হাজার টাকা বেরিয়ে গেছে। এ ছাড়াও তিন খানা বাড়ী ভাড়া খাটছে—ফেলে ঝেলে ও থেকে মাসিক আয় যা হয়, তিনশোর কম নয়। এ ঘরে মেয়ে পড়লে আখেরের কোন ভাবনা নেই।

কালিদাসবাবু এবার করযোড়ে বললেন: তা বুঝি, কিন্তু ও ফর্দের সিকি দেবারও সামর্থ্য আমার নেই, কাজেই—

এ কথার পর নসিরামবাবু ফর্দখানি মুড়ে পকেটে রেখে কালিদাসবাবুর কথাটারই উপসংহারে—'আমার উঠে পড়াই উচিত।' এই কয়টি কথা বলে হন্ হন্ করে বাইরের ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

ব্যাপারটা জানাজানি হতে আর বাকি রইল না কিছু। কর্তা বাড়ীর ভিতরে গিয়ে অপ্রসন্নমুখে গৃহিণীকে উদ্দেশ্য করে বললেন: যেমন তোমাদের কাণ্ড! গৃহিণী কন্যাকে ডেকে ছ্যার্ ছ্যার্ করে কতকগুলো কথা শুনিয়ে দিলেন। বললেন: এই তোমার বড়লোকের ছেলের সঙ্গে আলাপের ছিরি! ছি-ছি-ছি! আর মিশবি না ওর সঙ্গে—খবরদার বলছি।

চাপা কথাটা এ-ব্যাপারে জানাজানি হয়ে যায়। শিবানী ভেবেছিল, নিজেই হামরাই হয়ে এমন একটা ব্যয়সাধ্য ব্যাপারের নিষ্পত্তি করে বাড়ীশুদ্ধ সবাইকেই চমৎকৃত করে বাহবা নেবে। কিন্তু এখন 'উল্টা বুঝলি রাম' এই চলতি কথাটাই তাহার অদৃষ্টে সত্য হয়ে দাঁড়াল। নীরবেই মাথা হেঁট করে সে মায়ের কথাগুলি শুনে গেল। এই সময় নিরলা এসে মুখ টিপে হেসে বলল: কি গো, কাদা ঘাঁটাই সার হলো! তা ভাই, ডুবে ডুবে যে জলপান চলেছে, সেটা সন্দেহ হোলেও তোমাকে বলতে পারিনি। এসব কাজ অমন করে চুপিসারে করতে নেই, শেষে লোক হাসে। এখন এক কাজ কর—তোমার নাগরটিকেই চেপে ধর, ফল হবে।

নিরলার কথাগুলো যেন 'কাটা ঘায়ে নুনের ছিটের মত' শিবানীর অন্তরে জ্বালা ধরিয়ে দেয়। সে তখন ঝংকার দিয়ে বলে: থাক গো, তোমাকে আর আত্তি জানাতে হবে না।

নিরলা তেমনি হেসেই মুখ ফিরিয়ে নিল। কিন্তু মুখে যাই বলুক, মনে মনে শিবানী বুঝল যে, নিরলা ঠিকই বলেছে, যা থেকে উৎপত্তি, তাকেই নিষ্পত্তির জন্যে পাকড়াও করা চাই।

সেদিন আর শিবানীর ভাল করে খাওয়াই হলো না, মা-ও অন্য দিনের মতন খাবার তদ্বির করতে এলেন না। শিবানীর মনের মধ্যে তখন পাঁজার আগুন জ্বলছে। এ আগুন দেখা যায় না, কিন্তু নিঃশব্দে কাঁচা মাটি পুড়িয়ে পাকা ইট বানিয়ে দেয়।

যথা সময় হীরালালের সঙ্গে দেখা হয়। কিন্তু হীরালালের মূর্তি দেখে শিবানী চমকে ওঠে। তাকে আর বলতে হয় না কিছু, হীরালালই জানিয়ে দিল : এমন যে কাণ্ড করে বসবেন বাবা, সেটা ভাবিনি। যাঁর টাকার কোন অভাব নেই, তিনি যে ও-রকম একটা ফর্দ দিতে পারেন, কল্পনাও করিনি। এক সময় টাকার কষ্ট খুব পেয়েছিলেন বলে, টাকার ওপরে ওঁর এমনি একটা আসক্তি। কিন্তু এখন যদি আমি রোক দেখিয়ে আপত্তি তুলি, তাহলে উনি যে রকম বদমেজাজি, তাতে আমাকে তেজ্য পুত্তুর করতেও কুণ্ঠিত হবেন না। কিন্তু আমি সেটা চাইনে। এখন আমাদের দুজনকেই মাথা খেলিয়ে কৌশলে কাজ উদ্ধার করতে হবে।

শিবানীর মনের রাগ এতক্ষণে জল হয়ে গেছে। মাথার মধ্যে যে সব প্যাঁচ ঘুরিয়েছিল, সব খুলে যায় হীরালালের কথায়। নির্ভরযোগ্য দৃষ্টি ফেলে সে জিজ্ঞাসা করে : কি করতে চাও তাহলে ?

হীরালাল বলল : নাটক নভেলে এ রকম অবস্থায় ছেলে অবুঝের মত প্রকাশ্যে বাপের বিরুদ্ধে গিয়ে দুঃখ বরণ করে নেয়—সে ত পড়েছ ! আমি কিন্তু ও রাস্তায় যেতে রাজী নই। বিনা পণে বাবা যাতে এ বিবাহে মত দেন, সেই কাজ করতে হবে। তুমি এক কাজ কর, সব কথা খুলে—কন্যাপীঠের প্রেসিডেণ্টকে একখানা চিঠি লেখ। বাবা যে ফর্দ ওখানে পড়েছিলেন, তার নকল আমি এনেছি। এখানা পত্রের সঙ্গে পাঠাতে হবে। পত্রে বিশেষ করে লিখবে—ছেলে পণপ্রথার বিরোধী, বিনাপণেই তিনি আমাকে বিবাহ করতে চান এবং করবেনও; কিন্তু বাপের অমতে বিবাহ করলে তাঁর প্রচুর সম্পত্তি ও টাকা-পয়সা কিছুই পাবেন না, হয়ত পড়াশোনাও বন্ধ হবে। তাই তিনিও আপনাদের সাহায্য চেয়েছেন এবং আপনাদের কাছে গোপনে যুক্তি-পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করতেও

রাজি আছেন। তবে তাঁর নামটি এখন গোপন থাকবে। এরপর তিনি যখন বাপের সম্পত্তি পাবেন, কন্যাপীঠের কথা ভুলবেন না।

হীরালালের যুক্তি শিবানীর মনে ধরল। সেই দিনই দুজনে বসে চিঠি লিখে শিবানীর জবানীতে কন্যাপীঠে পাঠিয়ে দিলো। আগেই বলা হয়েছে, শিবানী খুব চাপা মেয়ে, বাড়ীতে কথাটা সে ভাঙ্গল না, কাউকে কিছু বলল না—এমন কি, নিরলাকেও নয়। অথচ নিরলার বিয়ের ব্যাপারে তখন হৈ হৈ পড়ে গেছে। আজ আসছে কন্যাদায়োদ্ধার থেকে হরিশ বা শশী, কাল আসছে চাপলি ছেলেটি—এমনি কত কাণ্ডই চলেছে। শিবানী সব দেখে, শোনে, খবর রাখে, কিন্তু প্রকাশ্যে নেকা সেজে থাকে। সে জানে—'ঘুঁটে পোড়ে আর গোবর হাসে' ব'লে একটা চলতি কথা আছে। কাজেই তার পক্ষে এখন হাসাহাসি ঠিক নয়। তবে কন্যাপীঠকে সে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করেছে, যদি তাঁরা দয়া করে তার কেস্‌টি নেন, তাহলে আদালতে যেমন কোন কোন মামলার শুনানী সংগোপনে হয়ে থাকে, তাদের ব্যাপারটির তদন্ত সম্পর্কেও যেন তেমনি গোপনে ব্যবস্থা করা হয়।

শিবানীর 'কেস্‌' কন্যাপীঠের প্রেসিডেন্ট নিয়েছেন এবং সমিতির কার্য-নির্বাহকারিণীরা ব্যতীত সাধারণ সদস্যাদের মধ্যে গোপন রেখেছেন। শিবানীকেও তার কলেজের ঠিকানায় পত্র যোগে জানিয়েছেন যে, তাঁরা এ সম্বন্ধে অবহিত হয়েছেন। তবে হীরালাল বাবু ভবিষ্যতে কন্যাপীঠকে সাহায্য করবার যে আশ্বাস দিয়েছেন, সে সম্বন্ধে কন্যাপীঠের বক্তব্য এই যে, পণপ্রথারূপ পাপটির যাতে অবসান হয়, সে সম্বন্ধে তিনি সচেষ্ট হলেই কন্যাপীঠকে সাহায্য করা হবে। শিবানীর ঘটনা সম্পর্কে কন্যাপীঠ গোপনতা অবলম্বন করলেও, ভীমরুলকে বাদ দিতে পারেন নি। প্রেসিডেন্ট স্বয়ং ভীমরুলের সঙ্গে দেখা করে শিবানীর চিঠিখানা তাঁকে দেন, তার

পর এ সম্পর্কে অদ্ভুত প্রকৃতির পণ-পাহাড়টিকে রীতিমত জব্দ করবার জন্য অনুরোধ করেন। ভীমরুলও চিঠির সঙ্গে পণ-পাহাড়ের ফর্দখানা পড়ে বলেন—ও রকম পাহাড়ের প্রচণ্ড খাঁইয়ের ওপর ছাই ঢেলে দেওয়ায় আনন্দ আছে। তিনি আরও বলেন—চেষ্টা করবেন, এক সঙ্গেই যাতে নিরলা ও শিবানীর বিভিন্ন গতির ব্যাপার দুটি নিষ্পত্তি করতে পারেন।

কিন্তু তদন্তে প্রবৃত্ত হয়েই ভীমরুল জানতে পারেন, মেয়ে দুটির অদৃষ্টের গতি বিভিন্ন-মুখী হ'লেও, তারা একই বাগানের একই গাছের দুটি ডালের দুটি রহস্যময় ফুল। একটির সুবাস ইতিমধ্যেই হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে, আর একটি পাতার আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রেখেছে। মনে মনে হেসে ভীমরুল খুব গোপনেই মেয়ে দুটির সম্বন্ধে তদন্তে আত্মনিয়োগ করলেন।

উনিশ

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কিছু পূর্বেও নসিরামবাবুর অবস্থা এখনকার মত এমন শাঁসালো ছিল না। যুদ্ধের ডামাডোলে যেমন অনেকে প্রাসাদ থেকে কুটীরে নেমে আসে, তেমনি আবার অনেকে কুটীর থেকে প্রাসাদবাসী হয়ে প্রতিবেশী এবং পরিচিত মহলকে চমকিত করে দেন। নসিরামবাবুও সেই হিড়িকে দেখতে দেখতে ভাড়া বাড়ী থেকে নিজস্ব প্রাসাদতুল্য অট্টালিকায় বসবাস করতে থাকেন। পাঁচ ছেলে এবং দুই মেয়ে নিয়ে তাঁর সংসার। স্ত্রী সুবাসিনী দেবীর উপর সংসার ও ছেলেপুলেদের পরিচালনার ভার দিয়ে তিনি কটা বছর নিরবচ্ছিন্নভাবে অর্থ সাধনাই করে এসেছেন। উপরের দিকে চারটি ছেলে প্রবেশিকার গণ্ডী পেরিয়ে, কেউ কেউ সেই অবস্থায় আই-এ পর্যন্ত পৌঁছে তার পর বাপের চেষ্টায় সরকারী সেরেস্তায় মোটা মোটা বেতনে বাহাল হয়ে যায়। অবস্থা যখন বেশ সচ্ছল হয়ে ওঠে, সেই সময় ছোট ছেলে হীরালালের প্রতি তাঁর নজর পড়ে—তাকে ইউনিভারসিটির সব কটা পরীক্ষায় কৃতবিদ্য করে তুলে বিয়ের ব্যাপারে উঁচুদরের 'পাস-করা ছেলের দাবী' হাঁকবার আশায়। আগের ছেলেগুলির বিয়ের ব্যাপারে এই খুঁৎটুকু তাঁকে খুবই আঘাত দিয়েছিল। যদিও ছেলেরা রোজগারী, আর বাপের সম্পত্তির জোরে এক এক পাত্রী পক্ষ থেকে তাঁদের 'গরজ বড় বালাই' এই মাত্র চাহিদায় নানা

প্রকারে যে পণ আদায় করেন, শোনা যায়—কন্যাদানের পর তাঁরা নাকি একেবারে নাতোয়ান হয়ে পড়েন। কাউকে বাড়ী বাঁধা দিতে হয়, কেউ প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকাগুলো তুলে আখেরের উপায় হারান, কেউ বা ব্যবসায়ের মূলধন ভেঙ্গে দায় উদ্ধার করেন। কিন্তু প্রত্যেকেই পাত্রদের পাশের অভাব জানিয়ে দর কমাতে চেস্টা করেছিলেন। তিনি অবিশ্যি ও-পক্ষের গরজ জেনে দর কমাননি, কিন্তু পাসের কদরটা বুঝতে পারেন, তাই হীরালালকে পাস করিয়ে সেই ত্রুটিটা শোধরাবার ব্যবস্থায় থাকেন। তিনটে পাস করে ছেলে যখন গ্রাজুয়েট হয়েছে, তার ওপর এম-এ পড়ছে, এখন আর পাসের অভাব বলে কেউ আর নাক নাড়বে না। তাই তিনি পাসগুলোর হিসেব করে বিয়ের ব্যাপারে ওভাবে দর হাঁকতে কিছুমাত্র কুণ্ঠা বা লজ্জা পাননি। এই অশোভন ও অতিমাত্রায় চড়া দর শুনে বন্ধু বা আত্মীয় মহলে কেউ আপত্তি করলে, নসিরামবাবু সেজন্যে লজ্জাবোধ ত করেনই না, উপরন্তু পণপ্রথার পক্ষ নিয়ে দু'কথা শুনিয়ে দিয়ে তৃপ্তি পান।

ভীমরুল এ সম্বন্ধে সকল তথ্য সংগ্রহ করে রাগে জ্বলতে থাকে। তিনি আরও খবর পান যে, বিয়ের পর কন্যা বিদায়ের সময় পণের টাকা গুণে নেবার সময় প্রত্যেক স্থলেই ইনি পণ হিসেবে অতিরিক্ত টাকা দাবী করে বিদায়-বেদনায় অভিভূত কন্যাপক্ষকে হতচকিত করে দেন এবং শেষ পর্যন্ত তাঁরা ভবিষ্যৎ ভেবে বরকর্তার সেই অন্যায় দাবী মেনে নিতে বাধ্য হন। ভীমরুল এই সূত্রে প্রতিজ্ঞা করেছেন যে, সমাজের গ্লানি ও আপদস্বরূপ এই অতিলোভী পণ পাহাড়কে রীতিমত সায়েস্তা করবার জন্য তাঁর শেষের এই দুরাশা ত ভেঙে দেবেনই, উপরন্তু উপরের দিকে তিন পুত্রের বিবাহ-ব্যাপারে কশাইয়ের মনোবৃত্তি নিয়ে যে সব অনাচার করেছেন, সেগুলির দিক দিয়েও উপযুক্ত আক্কেল-সেলামী আদায় করে তবে এঁকে

রেহাই দেবেন। বেশী দিন নয়—মাত্র তিনটি দিনের সম্যকরূপ সন্ধানের ফলে ভীমরুল জানতে পারলেন যে, আফিসের চাকরী-সূত্রে তিন পুত্রের সঙ্গে নসিরাম ঘোষালের উপার্জনের যতখানি আমদানি, তাতে এ-বাজারে সংসারের যাবতীয় ব্যয়, পুত্রের পড়া-শোনা, লোক-লৌকিকতা সব চালিয়ে বিশেষ কিছু সঞ্চয়ই করা যায় না; কিন্তু প্রকাণ্ড বসতবাড়ী ও দু'তিনখানা বড় বড় ভাড়াটিয়া বাড়ী করবার টাকা পেলেন কোথায়? সরকার বিশ্বাস করে এঁর উপর যে দায়িত্বভার দিয়েছিলেন, ইনি পদে পদে তা লঙ্ঘন করে সরকারকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছেন এবং এখনো সেই কুকার্যে লিপ্ত আছেন। বড় বড় কনট্রাক্ট এমন সব প্রতিষ্ঠানকে দিয়েছেন, যাঁদের না আছে প্রতিষ্ঠা, কিম্বা উচিতমত মূলধন। অথচ, শহরের নামী ও বনেদী বড় বড় প্রতিষ্ঠানগুলির বরাতে কিছুই জোটে নি—যেহেতু তাঁরা কর্মকর্তাকে তুষ্ট করতে সমর্থ হননি। ভীমরুল খুঁজে খুঁজে কর্মকর্তার আস্থাভাজন এমন কয়েকটি নামও সংগ্রহ করেন—সরকারী টাকা নেবার কিছু পরেই তাঁরা অর্ডার সরবরাহ করা ত দূরের কথা, দেউলিয়া আদালতের আশ্রয় নিয়ে নিষ্কৃতি পেয়ে গেছেন এবং তলে তলে পুনরায় নূতন ব্যবসায়ের পত্তন করে সহজেই সরকারী তহবিল থেকে অর্ডার সরবরাহ ব্যাপারে দাদন পেয়েছেন। এইভাবে 'পুকুর চুরির' ব্যাপার এই পদস্থ ব্যক্তিটির সেরেস্তা থেকে অবাধে চলেছে। এসব দুর্নীতিমূলক কাজের সন্ধানে ভীমরুলকে সিদ্ধহস্ত বলা যায়। কেতাদুরস্ত ভাবে প্রমাণপত্রগুলি সংগ্রহ করে একদিন তিনি সকালের দিকে ঘোষাল মশায়ের বৈঠক-খানায় উপস্থিত হলেন। ভীমরুলের সৌভাগ্যক্রমে ঠিক এই সময় কেন্দ্রীয় সরকারের এক পরোয়ানার কথা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়ে ব্যবসায়ী-মহলকে সচকিত করে তোলে। বড় বড় হরফে সংবাদপত্রগুলির প্রথম পৃষ্ঠায় এই মর্মে এক সংবাদ মুদ্রিত হয়েছে—

'কয়েক কোটী সরকারী টাকার অপচয়! উপযুক্ত মূলধনহীন সুবিধাবাদী ব্যবসায়ীরা সুপারিশের প্রভাবে বহু টাকা দাদন পাইয়াও চুক্তি ভঙ্গ করিয়াছে। ফলে, উভয়দিক দিয়া সরকারকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছে, অনেকগুলি আরব্ধ কাজ চুক্তিবদ্ধ মালপত্রের অভাবে স্থগিত রহিয়াছে। সরকারী এন্‌ফোর্সমেণ্ট বিভাগের উপর এই দুর্নীতিমূলক অপকর্মের তদন্তভার প্রদত্ত হইয়াছে ইত্যাদি।'

প্রত্যহ সকালে বাইরের ঘরে বসে চা খেতে খেতে নসিরাম ঘোষাল খবরের কাগজ পড়েন। এটি তাঁর নিত্যকার অভ্যাস। সেদিন সকালে চায়ের পিয়ালায় চুমুক দিয়ে কাগজখানা খুলতেই বড় বড় হরফে ছাপা—"সরকারের কোটি কোটি টাকা অপচয়ের" খবরটা চোখে পড়তেই তিনি চমকে উঠলেন। পিয়ালা নামিয়ে রেখে আগে খবরটা এক নিশ্বাসে পড়ে নিলেন, তাঁর বুকের ভিতরটা ঢিপ ঢিপ করে উঠল। চা-টুকু শেষ করে জোরে একটা নিশ্বাস ফেলে বললেন: সর্বনাশ!

এমনি সময় কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করলেন ভীমরুল। বিভিন্ন বেশে তাঁকে দেখা গেছে, কিন্তু এদিনের সাজ-পোষাক খুব দামী এবং কেতাদুরস্ত। সরকারের শাসন-বিভাগের পদস্থ অফিসার-গণকেই সাধারণতঃ এরূপ পরিচ্ছদে দেখা যায়। তাঁকে দিব্যি মানিয়েছিল বলেই ঘোষাল মশাই পর্যন্ত মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাঁর পানে তাকিয়ে রইলেন। ভীমরুল তাঁর টেবিলের সামনে এসে যুক্ত করে নমস্কার করতেই তিনিও সচেতন হয়ে নিজের ত্রুটি বুঝতে পেরে তাড়াতাড়ি প্রত্যভিবাদন করেই বসবার জন্য সামনের আসনখানি দেখিয়ে দিলেন।

আসন গ্রহণ করেই ভীমরুল বললেন: আপনি বোধ হয় শুনেছেন, আমাদের সমাজের শিক্ষিতা মেয়েরা পণপ্রথা তুলে দেবার

জন্য একটা সমিতি খুলেছেন, চারদিকে আন্দোলন চালাচ্ছেন, কেন্দ্রীয় সরকার এটা সঙ্গত ভেবে আইন পর্যন্ত করছেন ?

কথাটা শুনেই ঘোষাল মশাই বিরক্তভাবে বললেন : আমি শুনিনি। আইন যখন হবে, আমার ভাবনার কিছু থাকবে না তখন। তার কারণ, আমার আর একটা ছেলের বিয়ে দিতে বাকি—তারই ব্যবস্থা চলেছে। আর, ঐ যে মেয়েদের সমিতি খোলার কথা বললেন, আমার বাড়ীর মেয়ে হ'লে আমি তাকে জ্যান্ত পুঁতে ফেলতুম।

ভীমরুল : আপনি দেখছি বাহাদুর পুরুষ। ছেলে বিক্রির যে ফর্দ আপনি তৈরী করেছেন, আমরা দেখেছি। কিন্তু ঐ সমিতির মেয়েরাও প্রতিজ্ঞা করেছেন, বিনা পণেই আপনাকে পুত্রবধূ গ্রহণ করিয়ে ছাড়বেন। আমিও তাঁদের এই সাধু উদ্যমে যথাশক্তি সাহায্য করব ব'লে কথা দিয়েছি।

নসিরাম : আপনি কে মশাই—সকালেই একটা বাজে ব্যাপার নিয়ে গায়ে পড়ে ঝগড়া করতে এসেছেন ? কি আপনার মতলব ?

ভীমরুল : মতলবের কথা যখন শুনতে চাইলেন খুলেই তবে বলি ; গোয়াবাগানের কালীবাবুর বিদুষী কন্যা শিবানী দেবীকে বিনাপণে আপনাকে পুত্রবধূর মর্যাদা দিয়ে ঘরে আনতে হবে। আর, আমি কে—সে কথা এখনই নাইবা শুনলেন।

নসিরাম : আমার উপর এ ভাবে হুকুম চালাবার অধিকার কে আপনাকে দিয়েছে মশাই—আর, আমাকেই বা আপনি কি ঠাওরেছেন, শুনি ?

ভীমরুল : শুনবেন ? বেশ, আমার পেশা, আর এখানে আসার আসল উদ্দেশ্যটা তাহলে আগেই বলি। আজকের কাগজে সরকারী অর্থ তছরুপের ব্যাপারে সরকারের টনক নড়বার খবর ছাপা হয়েছে, আপনার পাশেই কাগজখানা দেখে বুঝতে পারছি, আপনি খবরটা এই প্রথম পড়েছেন—

নসিরাম ঃ এই প্রথমই ওটা কাগজে বেরিয়েছে!

ভীমরুল ঃ হ্যাঁ। কিন্তু সরকারের তদন্ত বিভাগে অন্ততঃ তিন মাস আগে ওটা জানাজানি হয়, আর সেই সঙ্গে নির্দেশও আসে—ঐ বিভাগের অফিসাররা কি করবেন! তাঁদের মধ্যে যেমন এই অভাজন, আর—ক্রোড় ক্রোড় সরকারী টাকা সরকারী কর্মচারীরূপে যাঁরা অপচয় করেছেন, তাঁদের মধ্যে তেমনি আপনিও—একজন!

নসিরাম ঃ আপনি বলছেন কি!

ভীমরুল ঃ বলছি—সামান্য ক্যাপিটেল নিয়ে যাঁরা ফার্ম খুলে বসেন, কোনদিক দিয়েই সলভেন্ট নন, এমন যে কটা ফার্মের টেণ্ডার য়্যাক্‌সেপ্ট্ করে মোটা মোটা টাকা দিয়েছেন আপনি স্যার—তাঁদের সম্বন্ধে 'অল য়্যাবাউটস্' আমি সংগ্রহ করেছি; এমন কি, আপনার প্রাইভেট লেটার পর্যন্ত। অবিশ্যি, এ সব সংগ্রহের জন্যে আমাকে চোরের ওপর বাটপাড়ি করতে হয়েছে। ছোট্ট একটি উদাহরণ দিচ্ছি,—সাদি করবার জন্যে আপনার বিশ্বাসী চাপরাসী কেশবলাল ছুটি নিয়েছে না? সে কিন্তু আমারই স্পাই—চতুর্ভুজ। এ থেকেই বুঝতে পারবেন আমি কি করেছি, আর আপনার ভবিষ্যৎ কি! যদি বলেন, ফাইল থেকে কিছু শোনাতে পারি; আপনারই সুপারিস করা—মেসার্স কে, কে, পাইন এণ্ড কোং, এন, সি, সারকেল, আপনার বেনামদার কোম্পানী ঘেসলাল অ্যাণ্ড সন্স—

এই পর্যন্ত বলেই ভীমরুল তাঁর ফাইলটা কোলের ওপর রেখে ফিতা খুলতে উদ্যত হয়েছেন, অমনি নসিরাম ঘোষাল বিবর্ণ মুখখানার ভঙ্গি নম্র ও কাতর করে ধরা গলায় বলে উঠলেন ঃ থাক। আমি মানুষের মুখের কথা শুনেই বুঝতে পারি, খাঁটি কি মিথ্যা। টাইম বোমার কথা শোনা গেছে, আপনি সেটা ফিট করে আমার সঙ্গে রফা করতে এসেছেন। রফা আমি করব, কত টাকা আপনি চান বলুন, চেক নয়—বরাতি নয়, নগদই আমি দেব—বলুন আপনার এমাউণ্ট!

ভীমরুল গম্ভীর ভাবেই বললেন: আপনি যে প্রস্তাব করেছেন, তাতে ঠক্‌বেন। আশি হাজার টাকায় বসতবাড়ী করেছেন, তিনখানি বাড়ী ভাড়া খাটছে—তাদের দামও লাখ টাকার ওপর, ব্যাঙ্কে মজুত টাকা—আড়াই লাখের কাছাকাছি। মিটমাট করতে হলে আধা-আধি শেয়ার না নিয়ে আপনার মৃত্যুবাণ স্বরূপ প্রমাণগুলো ছাড়তে পারি কি? আপনিই বলুন না।

নাসিরামবাবু নীরবে ভাবতে লাগলেন। ভীমরুল বললেন: তার চেয়ে এক কাজ করুন—যে প্রস্তাব এসেই করেছিলাম,—বিনা পণে কালীবাবুর কন্যা শিবানীকে পুত্রবধূ করুন, আর যে কয় ছেলের বিয়ের নামে বৈবাহিকদের সর্বস্বান্ত করেছেন—তাঁদের প্রত্যেককে পাঁচ পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে আত্মীয়-কুটুম্ব আর আপনার মতন ভদ্র কশাই-সমাজকে অবাক করে দিন। আপনাকে টাকার সঙ্গে সহস্তে এই ভাবে চিঠি দিতে হবে—'কন্যাপীঠের মহত্বে মুগ্ধ হয়ে পূর্বপাপের প্রায়শ্চিত্ত করছি।' এখন বলুন—কি করবেন? আমি কিন্তু মিটমাটের এই সর্ত থেকে এক চুলও নড়তে প্রস্তুত নই।

ঘোষাল মশাই চেষ্টা করলেন পুরানো বৈবাহিকদের উদ্দেশে টাকাগুলি দেবার প্রস্তাবটি মকুব করবার জন্য, কিন্তু ভীমরুল কিছুতেই সম্মত হলেন না; বললেন: যে পাপ করেছেন, তার প্রায়শ্চিত্ত অবশ্যই প্রয়োজন। তখন অগত্যা ঘোষাল মশাইকে সম্মত হ'তে হলো। ভীমরুল বললেন: আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, বিয়ের রাত্রে নির্বিঘ্নে বিয়ে হয়ে গেলেই, আপনার আফিস সংক্রান্ত প্রমাণপত্রগুলি সমস্ত ফিরিয়ে দেওয়া হবে।

এই দিনই অপরাহ্নে ভীমরুল বিশিষ্ট ভদ্র বাঙালীর সজ্জায় কালিদাসবাবুর বাহিরের ঘরে উপস্থিত হয়ে কালিদাসবাবুকেও চমৎকৃত করে দিলেন। খুব কৌশলে কন্যাপীঠের কথা তুলে বললেন যে, তিনি যদি নিরলা দেবীর বিবাহ ব্যাপারে নির্লিপ্ত থাকেন, তাহলে

বিশেষ এক সুপাত্রের সঙ্গে যেমন তার বিবাহ হবে, নসিরামবাবুর পুত্র হীরালালের সঙ্গে শিবানীর বিবাহও তেমনি বিনা পণে সদ্ভাবে সম্পন্ন হয়ে যাবে। তবে যদি আগেকার কথা অনুযায়ী লুটবিহারী-বাবুরা শনিবার দিন নিরলাকে পাকা দেখতে আসেন, তাঁদের অবিশ্যি আদর-আপ্যায়ন করে প্রস্তাবটির সমর্থনও করা হবে। এমন কি, যদি তাঁর গৃহিণীকে প্রণামী বলে কিছু তাঁরা দেন, ইচ্ছা করলে তিনি নেবেনও—কিন্তু ঐ পর্যন্ত। এর পরের যে ব্যবস্থা কন্যাপীঠের তরফ থেকে তাঁরাই করবেন এবং শনিবার গোড়া থেকে তিনি উপস্থিত থেকে সেই ছদ্ম দেখা-শোনাটা চালিয়ে নেবেন।

ভীমরুল এখানে জীবনহরি নামে আত্মপরিচয় দেন এবং নিরলার মামার বাড়ীর সম্পর্কে তিনি তার দাদা হন, একথা বলে আস্থা-ভাজন হয়ে পড়েন। শিবানীর ব্যাপারেও নসিরামবাবুর এক পত্র দাখিল করে সেদিক দিয়েও কালিদাসবাবুকে আশ্বস্ত করে, তিনি বিদায় নেন।

কুড়ি

শনিবার। বাড়ির সকলের খাওয়া-দাওয়ার পরেই ভীমরুল—এখানে অবশ্য জীবনহরি বাঁড়ুয্যে নামে পরিচিত, সদালাপী ভদ্র মানুষটি এসে পড়লেন—হুটবিহারীবাবুদের সঙ্গে বোঝা-পড়া করবার উদ্দেশ্যে। কালিদাসবাবুও ভীমরুলের কথায় আশ্বস্ত হয়েছেন এবং শনিবার আফিসে বেরুবার সময় বাড়িতে বলে গেছেন—সেই জীবনহরি নামে ভদ্রলোকটি এলে তাঁর ওপরেই সব ভার দেবে। আর নিরলাকে বলবে, ভদ্রলোক যখন ওর মামার বাড়ির সম্পর্কের লোক, যেন ভাল করে আদর-যত্ন করে।

নিরলা রেখার চিঠিতে জেনেছে, ভদ্রলোকটি কে এবং ইনিই এ-নাটের গুরু—নিরলা এবং শিবানী দুজনেরই গতি-মুক্তির ভার নিয়েছেন। কথাটা নিরলা চুপি চুপি শিবানীকে বলে প্রথমে চমকিত করে দিয়েছিল। কিন্তু নিরলা যখন বলে—তোমার ডুবে ডুবে জল খাওয়ার খবর সব রাখিগো, আমার কাছে আর ঢাক ঢাক গুড়্ গুড়্ কেন? যাই হোক, বুদ্ধি খাটিয়ে ঠিক জায়গায় নালিশ করেছ, ওঁরা যখন ভার নিয়েছেন, আর ভাবনা নেই। হীরালাল বাবুকে যে প্রকারেই হোক তোমার মালঞ্চের মালাকর করে দেবেনই।

এ-কথার পর শিবানী আনন্দে বিহ্বল হয়ে নিরলাকে জড়িয়ে ধরে বলে—এখন থেকে আর তোকে লুকিয়ে কোন কাজ করছিনে।

ভীমরুল আসতেই নিরলা ও শিবানী দুজনেই তাঁকে অভ্যর্থনা করে বাইরের ঘরে বসায়—যেন কতদিনের পরিচিত লোক এলেন। সেইভাবে তাঁদের সংলাপ চলে। ভীমরুল বলেন: তোমরা যে আগে থেকেই এমন করে তৈরী হয়ে আছ, তা তো জানতুম না! ভেবেছিলুম, গম্ভীর হয়ে এমন দু'একটা খবর শোনাব, শুনতে শুনতেই ভির্মি যাবার জো হবে!

নিরলা সহাস্যে বলে: হুল ফোটাবার ফুরসত পেলেন না বলে দুঃখ হচ্ছে বুঝেছি। কিন্তু এ-দুটো অবলা যখন আপনার ওপরেই নির্ভর করে বসে আছে—মুক্তির দিন গণছে, আপনার হুল এখানে কখনো কঠিন হতে পারে না। তারপর, নিজে থেকে 'বড়দা' হয়েছেন —ভুলে যাবেন না।

ভীমরুলের কণ্ঠস্বর এ কথার পর গাঢ় হয়ে আসে, সেই ভাবেই বলেন: দেখ, ভগবান আমাকে একটি বোন দিলেও গোড়া থেকে তার কদর বুঝিনি। সম্প্রতি জেনেছি, বোন কি বস্তু—তাদের মনে ভায়ের জন্যে কত দরদ! এখন তোমরা দুটিতেও আমার সেই বোন হয়েছ। এখন কিন্তু যে কাণ্ড আসছে, ভাই বোন তিনটিতে মিলে সামলাতে হবে।

এর পর বিকেলে নিরলাকে দেখা উপলক্ষ করে যে বৈঠক বসবে, সেই সম্বন্ধেই যুক্তি, পরামর্শ ও পরিকল্পনা চলতে থাকে।

পরিকল্পনা অনুসারে ভীমরুলের কানদুটি বাইরের রাস্তায় পড়ে থাকে। সাধারণতঃ পাত্রপক্ষ এলে কন্যাকে আহ্বান করা হয়। এখানে ভীমরুল তার ব্যতিক্রম ঘটালেন। বাইরের ঘরখানির ভিতর থেকে তক্তপোষ তুলে ঢালা ফরাস পাতা হয়েছিল। সাদা চাদরের উপর সারিবন্দী সাদা সাদা ওয়াড় দেওয়া তাকিয়া। তারই একাংশে সুসজ্জিতা নিরলাকে বসানো হয়েছে—সামনে একটি হারমোনিয়ম। শিবানীও তার পাশে বিশিষ্ট একটি ভঙ্গিতে বসতে

বাধ্য হয়েছে। ভীমরুলের পরিকল্পনা মত দুই বোন আগাগোড়া ফুলের সাজে সেজেছে। ফুলের নানাপ্রকার অলঙ্কার ভীমরুলকে সরবরাহ করতে হয়েছে।

ঘড়িতে কাঁটায় কাঁটায় চারটে বাজল। এমনি সময় বাইরে প্রাইভেট মটরের হর্ণ শোনা গেল। ভীমরুল প্রস্তুত হয়েই ছিলেন। হর্ণ শুনে বললেন: আসছেন ওঁরা—শুরু কর।

সঙ্গে সঙ্গে নিরলা ও শিবানী সমস্বরে গান ধরল—ভীমরুল হারমোনিয়ম বাজিয়ে গীতায়নে সুরের প্রেরণা দিতে লাগল। ওদিকে মটরখানা গলির মধ্যে ঢুকে বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। ভিতর থেকে তখন কৌতুক-গীতির ঝংকার উঠেছে:

চির-তরুণ রূপে অরুণ, অসিছে গো আজি এ দীন ভবনে,
বয়স তাঁর হয়েছে গো পার, ষাটের কোঠাটি গত ফাগুনে।
মাথায় কলপ সাদা অলকে
কেটেছেন সীঁথি কত পুলকে
বাঁধানো দশন শোভিছে কেমন অপরূপ ঐ লোল আননে।
গৃহেতে তাঁহার আছে কত পরিজন
ছেলে-মেয়ে বধূ নাতি-পুতি অগনন
ষোড়শীর পাণি লাগিয়া তবু কত সাধ আজি জাগে গো মনে।
স্বাগতম্! স্বাগতম্! স্বাগতম্! ধন্য করহে দরশন দানে॥

বাইরে গাড়ির মধ্যে ঝুটবিহারী গাঙ্গুলী, রামহরি, সাতকড়ি ও চাপলির সঙ্গে বসেছিলেন। চারজনই উৎকর্ণ হয়ে গানের শব্দগুলি যেন গলাধঃকরণ করছিলেন।

চাপলি বলল: আমরা যে এসেছি জানতে পারেনি—চলুন, কোন সাড়াশব্দ না দিয়ে একেবার ক'জনে এক সঙ্গেই ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ি।

মুটবিহারিবাবু ইশারায় চাপলির কথা সমর্থন করে গাড়ি থেকে নেমে পড়লেন। সহযাত্রীরাও তাঁর অনুসরণ করে চললেন।

গানের শেষ ছত্রটি গীতিকণ্ঠে ঝংকৃত হবার সঙ্গে সঙ্গে মুটবিহারী-বাবু সদলবলে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করলেন। ভীমরুল যেন প্রস্তুত হয়েই ছিলেন, তৎক্ষণাৎ হারমোনিয়মটি ঠেলে রেখে তাড়াতাড়ি উঠে আগন্তুকগণকে অভ্যর্থনা করলেন: আসুন, আসুন, আসতে আজ্ঞা হোক—স্বাগতম্, সুস্বাগতম্।

মুটবিহারীবাবুর উভয় চক্ষুর দৃষ্টি তখন ফরাসে আসীনা তরুণীদের দিকে আকৃষ্ট হয়েছে, সেই অবস্থাতেই মুখ থেকে একটা কথা প্রশ্নের মত বেরিয়ে এল: কালিদাসবাবু কোথায়?

ভীমরুল পূর্বের ব্যবস্থামত প্রথমে ফরাসে উপবিষ্টা তরুণীদ্বয়কে লক্ষ্য করে বললেন: উঠ না তোমরা, ব'স।...তারপর মুটবিহারী বাবুর প্রশ্নের উত্তর দিলেন: তিনি আজ এখনো ফেরেননি; আফিসে একটা জরুরী কাজ পড়ে গেছে—তা' আপনারা আসুন, বসুন। আমার উপরেই আপনাদের অভ্যর্থনার ভার দিয়ে গেছেন।

পিছনের দিকে তাকিয়ে—'এসো হে, বসা যাক।' বলেই মুটবিহারীবাবু ফরাসের উপর নিরলা ও শিবানীর দিকে মুখ করে বসে পড়লেন। তাঁর সমবয়স্ক দুই বন্ধু এবং বাচ্চা বয়স্য চাপলি তাঁর পিছনে এসে একে একে বসলেন।

মুটবিহারীবাবু কিঞ্চিৎ ক্রুদ্ধ ভাবে বললেন: কবে থেকে কথা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু সব দিকেই গোলমাল। এ ঘটনার ঘটক হরিশ, শশীরও জরুরী কাজ পড়ে গেছে; এখানেও সেই অবস্থা, গৃহকর্তা ত—

কথায় বাধা দিয়ে ভীমরুল সবিনয়ে বললেন: তাঁর জন্যে কাজ আটকাবে না; তাহলে আমি রয়েছি কি করতে। সব ব্যবস্থাই ঠিক আছে।

নুটবিহারী : আপনি ?

ভীমরুল : ওঁর ভাইঝি নিরলা দেবীর আমি মামাতো ভাই। খবর পেয়েই চলে এসেছি গাঁ থেকে।

নুটবিহারী : এঁরা ?

নিরলা ও শিবানীকে নির্দেশ করেই এই প্রশ্ন। শুনেই ভীমরুল হো হো করে হেসে উঠলেন। নুটবিহারী জিজ্ঞাসা করলেন : হাসলেন যে ?

ভীমরুল : তাও বলতে হবে স্যার! শুনেছিলুম, আপনার ভাবী বধূর ফটো দেখেই মশগুল হয়ে গেছেন! তাকে পাবার জন্যে ধনুর্ভঙ্গ পণ করে বসে আছেন। সব শুনে আমি স্যার মাথা খেলিয়ে পাত্রী দেখাবার ব্যবস্থাটা একটু ঘুরিয়ে দিই, আপনাদের আসবার সময় হয়েছে বুঝে হবু পাত্রীকে সাজিয়ে-গুজিয়ে আগে থেকেই ফরাসে এনে বসিয়ে রাখি—যাতে ওঁরাই অভ্যর্থনা করেন। অথচ আপনি স্যার জিজ্ঞেস করছেন—এঁরা কে ?

নুটবিহারীবাবুর দুই বন্ধু প্রায় একই সঙ্গে বলে উঠলেন : সাবাস, সাবাস! নুটু, তুমি ঠকে গেলে। আরে, চিনছ না ? এ কি মাইরী সোনা—যে কোষতে হবে ?

রামহরিবাবু ভীমরুলকে বললেন : আপনি এক কাজ করুন মশাই,—শুভদৃষ্টিটা করিয়ে দিন। নুটু আমাদের ভারি লাজুক, মেয়ে দেখলে একেবারে কেন্নোর মত কুঁকড়ে পড়ে। যাক্—মশায়ের নামটা ?

ভীমরুল : জীবনহরি।

রামহরি সোল্লাসে বললেন : বা! আমার নাম রামহরি। বেশ মিলে গেছে।

এই সময় চাপলি হামাগুড়ি দিয়ে নিরলার কাছে গিয়ে একটা প্রণাম ঠুকে বলল : পায়ের ধুলো দিন বৌদি! ভাল আছেন ত ?

সপ্রতিভ কণ্ঠে নিরলা বলল: দেখতেই পাচ্ছ! চাপলির চোখ পড়ল শিবানীর দিকে, বলল: ছোড়দিও যে আজকে আপনার কাছে এসে বসেছেন? আগে ত দেখিনি?

নিরলা: ছোড়দিরও বিয়ের ফুল ফুটেছে তাই এগিয়ে পড়েছে? এখন তোমার দাদাকে ধর না—বোঝার ওপর শাকের আঁটির মত যদি একে তুলে নেন?

চাপলি আড়চোখে তাকাল নুটবিহারীর দিকে। নিরলার কথাগুলি তাঁর কানে যেন মধুবর্ষণ করছিল। শুনতে শুনতে মাঝে মাঝে তুই বন্ধুর পানেও তাকাচ্ছিলেন। নিরলার কথাটা শুনে তিনি চাপলিকেই বললেন: তোর বৌদিকে বলনা চাপলি—তোলবার রাখবার মালিক ত উনি, ওনার যা মর্জি তাই হবে।

সাতকড়িবাবু বললেন: কথাগুলো মুখোমুখিই চলুক না—জনান্তিকে য়্যাক্‌টিং এখন আর চলে না।

নুটবিহারী ভীমরুলকে বললেন: জীবনবাবু, আপনিই যখন গৃহস্বামী কালিদাসবাবুর প্রতিনিধিরূপে আমাদের অভ্যর্থনা করলেন, তখন যে জন্যে আশা হয়েছে, সেটার সুব্যবস্থা করুন।

ভীমরুল জবাব দিলেন: আমি ত সে জন্য প্রস্তুত হয়ে আপনাদের হুকুম প্রত্যাশা করছি। যে জন্যে আসা, আসল জিনিস আমি আগে থেকেই সাজিয়ে-গুছিয়ে বসে আছি। আজ্ঞা করুন—

রামহরিবাবু জিজ্ঞাসা করলেন: চাপলি, তোমার ছোড়দির পরিচয় ত দিলে না?

চাপলি বিনম্র ভাবে জানিয়ে দিল: উনি হচ্ছেন খোদ মালিকের আপন কন্যা, নাম শিবানী দেবী।

নুটবিহারী বিস্মিত ভঙ্গিতে বললেন: সর্বনাশ! ইনি ত বোঝার ওপর শাকের আঁটির মতন বিকোবার মাল নন—মডার্ন কোন মহাদেব

এসে এঁকে মাথায় করে নিয়ে যাবেন। যাক্ এখন আমার কথা হচ্ছে জীবনবাবু, নিরলা দেবীকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে চাই।

ভীমরুল বললেন : স্বচ্ছন্দে করুন—বাধার কোন কারণ নেই।

নুটবিহারী : হ্যাঁ, তাহলে আমাকে বলবেন নিরলা দেবী, আমাদের আসবার আগে ঐ গানখানা গাইছিলেন কেন? যতখানি শুনেছি, তাতে আমার সম্বন্ধেই—

নিরলা : আপনার কথা বুঝেছি। কিন্তু গানে আপনার সম্বন্ধে যা যা বলা হয়েছে, সেগুলি কি মিথ্যে? যদি বলেন, গানের প্রত্যেক কথা ধরে আপনার বয়স, সাজ-সজ্জা, প্রসাধন প্রত্যেকটি এনালাইজ করে প্রমাণ করতে রাজী আছি—মিথ্যা বলা হয় নি।

নুটবিহারী : না, না, ওসব প্রমাণের দরকার নেই—জানতে কৌতূহল হলো বলেই—

ভীমরুল : কৌতুক করবার জন্য ওটা করা হয়েছে স্যার, ও নিয়ে আলোচনা না করাই ভাল।

নিরলা : স্বয়ং পার্বতী বৃদ্ধ বরের বেশবাস বয়েস নিয়ে কত কথাই বলেছেন। কিন্তু তা বলে কি বুঝতে হবে, শিবকে তিনি ভালবাসতেন না? আনব ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্যখানা—

বাধা দিয়ে নুটবিহারী বাবু বললেন : থাক, থাক—আমি মানছি, আর বই আনতে হবে না। বুঝতে পেরেছি, নিরলা দেবীর পড়াশোনা খুব আছে। সব চেয়ে আনন্দের কথা, ঐ বাজে লজ্জা-সঙ্কোচের উনি পরোয়া করেন না। বেশ, বেশ। এই ত চাই!

ভীমরুল : তাহলে বুঝতে পারা যাচ্ছে—পাত্র পাত্রী কেউ কাউকে অপছন্দ করেন নি। কাজেই বিবাহে কোন বাধা নেই। কর্তা স্থির করেছেন—একই দিনে দুটো বিয়ে হবে। শিবানীর বিয়ের কথাও এক রকম পাকা হয়ে গেছে। আমাদের ইচ্ছা,

একখানা আলাদা বাড়ি ভাড়া করে সেখানে একটু ঘটা করে বিয়ের উৎসব হয়।

মুটবিহারী বাবু বললেন: খুব ভাল কথা, আমি ত আগেই বলেছি—বিয়ের দরুণ যে উৎসব হবে, তার সমস্ত ব্যয়ভার আমিই বহন করব। কালিদাসবাবুকে এদিক দিয়ে কোন খরচপত্র করতে হবে না। তাহলে পাকা দেখার ব্যাপারটা এখনই সেরে ফেলা যাক, আর বিয়ের দিনটাও স্থির হোক।

ভীমরুল বললেন: এঁদের একটা প্রথা আছে, কথাবার্তা পাকা হলেও পাত্র-পাত্রীকে যৌতুক দিয়ে আশীর্বাদ করা হয়—বিয়ের রাতে সম্প্রদানের আগেই। তার পর সেখানেই গায়ে হলুদ পাত্র-পাত্রীর কপালে ঠেকিয়ে নেম-কর্ম সারা হয়। কাজেই এখন কথাবার্তা পাকা হতে পারে।

মুটবিহারী বললেন: বেশ, তাহলে কথাই আজ পাকা হয়ে গেল। এখন বিয়ের দিনটা—

ভীমরুল বললেন: নিরলার মতন শিবানীর কথাটা পাকা হলেই দিনটা ঠিক করে আপনাকে জানানো হবে। তবে আজ থেকে পনেরো দিনের মধ্যেই যাতে কাজটা হয়, সেদিকে আমরা বিশেষ লক্ষ্য রাখব।

মুটবিহারী: এখন আমার একটা কথা আছে। এঁদের প্রথা ত আমার জানা ছিল না, তাই স্থির করেছিলুম, আর তার একটু আভাসও দিয়ে রেখেছিলুম—আজই কথা পাকা হবার পর, নিরলা দেবীকে নিয়ে বাজারে বেরুব, ওঁর পছন্দমত জিনিসপত্র কিনে পাকা দেখার যৌতুক বলে দাখিল করব। উনিও রাজী ছিলেন, কথাও দিয়েছিলেন।

ভীমরুল বিদ্রূপের ভঙ্গিতে নিরলাকে লক্ষ্য করে বলে উঠলেন: তাই নাকি? তলে তলে এত কথা চালাচালিও করা হয়েছিল?

নিরলা দিব্যি সপ্রতিভ ভাবে কথাটার জবাব দিল: তখন কি জেনেছিলুম বিয়ের আগে ভাবী বরের কাছ থেকে যৌতুক বলে কিছু নিতে নেই? যেমন আমার বরাত! এমন একটা দাঁও কুলপ্রথার জন্য নষ্ট হয়ে গেল!

নুটবিহারীবাবু কথাটা শুনে একটু ব্যথিত হয়েই বললেন: নষ্ট হবে কেন? প্রথা যেমন আছে থাকনা, আমি যদি ওঁকে আর শিবানী দেবীকে নিয়ে নিউ মার্কেট পর্যন্ত একটা ট্রিপ দিই, আর উপহার বলে ওঁদেরই পছন্দমত কিছু কিছু—

নিরলা কথাটায় বাধা দিয়ে একটু মিষ্টি হেসে বলল: এ লোভ এখন সামলাতে হচ্ছে। তবে কথা রইল, বিয়ের পর বাসরে না বসেই আমরা বাজারে বেরুব। শিবানীকেও সঙ্গে নেব, কিন্তু আজ নয়, কাকাবাবু তাহলে রাগ করবেন।

নুটবিহারী অগত্যা ভীমরুলকে লক্ষ্য করে বললেন: কালিদাস বাবু এবং তাঁর স্ত্রীর সম্বন্ধে আমার কিছু দেয় আছে। আজই সেটা দেবার কথা আছে, আমিও তৈরী হয়ে এসেছি।

ভীমরুল বললেন: ওঁরাও ঠিক ঐ কারণে ওগুলো এখনি নেওয়া স্থগিত রেখেছেন। আপনাকে বলতে বলেছেন, বিয়ের রাতে পাত্র-পাত্রীর আশীর্বাদের পর কথামত ও সব নেবেন, তার আগে নয়।

চাপলি এ সময় হঠাৎ আক্ষেপ করে উঠল: তাহলে আজকের সব প্ল্যান ভেস্তে গেল স্যার! কত কি এঁচে রাখা গিয়েছিল! শুধু কি জিনিস কেনা—সোডা ফাউণ্টেন, ইস্টার্ণ হোটেল, ইডিন গার্ডেন—খাই দাই বেড়ানো, সব গুলিয়ে গেল বৌদি!

নিরলা মুখখানা ম্লান করে বলল: বরাত ঠাকুর পো! তবে ও সব তোলাই রইল—কটা দিন বৈ ত নয়!

নুটবিহারী বাবু একটা নিঃশ্বাস ত্যাগ করে বললেন: তাহলে এখন ওঠা যাক—

ভীমরুল ব্যগ্রভাবে আপত্তির ভঙ্গিতে বললেন: তাকি হয়? একটু মিষ্টিমুখ করে তবে উঠবেন। নিরলা নিজের হাতে বাড়িতে খাবার তৈরি করেছেন; তার আস্বাদ আপনাকে নিতেই হবে।

সুতরাং তখনই ওঠা আর হলো না; তৎক্ষণাৎ বাইরের ঘরে ফরাসের উপরেই ডিসে করে বাজার থেকে কেনা খাবার পরিবেশনের ব্যবস্থা হোতে লাগল।

একুশ

অবশেষে—সত্য সত্যই উপরোক্ত রহস্যময় বিয়ের দিন সংশ্লিষ্ট-মহলকে চমৎকৃত করে একদা বেশ ঘটা করেই উপস্থিত হলো। আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের উপর একখানা প্রকাণ্ড বাড়ি ভাড়া করে সেখানেই যাবতীয় অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করবার আয়োজন চলেছে। এই উপলক্ষে নুটবিহারীবাবু হাজার টাকার একখানি চেক কালিদাস বাবুর বরাবর পাঠিয়ে জানিয়েছেন যে, উৎসবের যাবতীয় খরচপত্র তিনিই বহন কববেন। তাঁকেও জানানো হয়েছে, শুভদিনে সায়াহ্নে তিনি সবান্ধব বিবাহভবনে উপস্থিত হয়ে এখানেই বর-সজ্জায় সজ্জিত হবেন। সদানন্দ ও নসিরাম উভয়েই জ্ঞাত হয়েছেন, তাঁদের পুত্র—শঙ্কর ও হীরালাল তাদের বাঞ্ছিতা পাত্রীর সঙ্গেই পরিণীত হবে। নসিরাম এ বিবাহে দায়ে পড়েই বাধ্য হয়েছেন। সদানন্দবাবুও ছদ্মবেশী জ্যোতিষীর অদ্ভুত গণনামূলক বাক্‌জালে আষ্টেপৃষ্টে আবদ্ধ হয়েই এরূপ একটা রহস্যময় পরিবেশের মধ্যে তাঁর ন্যায় সম্ভ্রান্ত ও বিশিষ্ট ব্যক্তির পুত্রের বিবাহ এভাবে সংগোপনে অনুষ্ঠিত হবার অনুকূলে মত দিয়েছেন। পুত্র যে তাঁরই মনোনীতা পাত্রীর পানিগ্রহণ করছেন, এতেই তিনি সন্তুষ্ট এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা দেখে পণের মোহও ত্যাগ করেছেন। এহেন রহস্যময় বিরাট ব্যাপারটি যুগপৎ ভীমরুল ও কন্যাপীঠের প্রেসিডেণ্ট লীলাদেবীর যুগ্ম-পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাধীনে যথাযথভাবে পরিচালিত হোচ্ছে। ভীমরুল সদানন্দ ও নসিরামকে স্ব স্ব পুত্রের বিবাহ সম্পর্কে

জ্যোতিষী ও সরকারী অফিসাররূপে নির্লিপ্ত থাকতে বাধ্য করেছেন। সদানন্দবাবু জেনেছেন, পিতা ও পুত্রের মধ্যে গ্রহ-সংস্থান এমনি প্রতিকূল যে, সম্প্রদানের সময় তাঁর উপস্থিতি শুভজনক নহে। আর নসিরামবাবু ত সর্বতোভাবে ভীমরুলের আজ্ঞাধীন অবস্থাতেই আছেন—বিবাহ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হোলে তবে তিনি পাবেন নিষ্কৃতি।

বিবাহের দিন সকাল থেকেই কন্যা-পীঠের কন্যারা বিবাহ-বাড়িতে এসে আসর জমিয়েছেন। প্রেসিডেণ্ট লীলাদেবী আগে থেকেই কন্যাপীঠের প্রত্যেক ছাত্রীকে সকালেই এখানে আসবার জন্য সাদর নিমন্ত্রণ করে রাখেন। এদের নিয়েই তিনি দুটো বিবাহের সমস্ত কাজ সম্পন্ন করবার ব্যবস্থা করতে উৎসাহ পেয়েছেন। মাথার ওপরে অবশ্য ভীমরুল আছেন। পাত্রদের আনবার ব্যবস্থা, পুরোহিত সংগ্রহ করা, বহির্মহলের প্রাঙ্গণে প্যাণ্ডেল ও নাট্যমঞ্চ নির্মাণ প্রভৃতি শক্ত শক্ত কাজগুলির ব্যবস্থা তাঁকেই করতে হচ্ছে। এদিন সকাল থেকে ভীমরুলকে সরকারী পদস্থ কোন অফিসারের ছদ্মবেশে ঘোরাফেরা করতে দেখা যায়। নসিরাম ঘোষালের বৈঠকখানায় যে ধরণের সাজ-সজ্জায় দেখা গিয়েছিল, অনেকটা সেই ধাঁজের দামী পোষাক, উপরন্তু চোখে বিশেষ প্রণালীতে নির্মিত একটা কালো চশমা এবং মাথার টুপিটা এদেশী—অনেকটা গুজরাট বা পাঞ্জাবী প্যাটার্ণ।

এত বড় একটা অনুষ্ঠান—দু'দুটো মেয়ের একই লগ্নে বিয়ে, দুটো মনোনীত আসল পাত্র, আর অমনোনীত একটা বুড়ো জাঁদরেল পাত্রের জন্যেও আর এক দফা কনে সাজিয়ে তাঁকে তুষ্ট করবার বিচিত্র ব্যবস্থা, তার ওপর—মণ্ডপে প্যাণ্ডেল বেঁধে সিন সিনারীর সাহায্যে একটা কৌতুক নাট্যাভিনয়ের আয়োজন,—এ সমস্তই এমন বাঁধাধরা নিয়মে কোন রকম হৈ চৈ না করে সারাদিন ধরে সন্ধ্যার মধ্যেই সমস্ত হয়ে ওঠে যে, তার জন্য কর্মকর্তা ভীমরুল এবং

কর্মকর্ত্রী লীলাদেবী উভয়েই তুল্যাংশে প্রশংসার দাবী করতে পারেন।

এ-দিন বিয়ের তুটো লগ্ন থাকে; একটা একেবারে দিন ঘেঁষে,—অর্থাৎ দিনের পর সন্ধ্যা পড়তেই শুরু হয়ে ঘণ্টাখানেক থাকবে তার অধিকার। একেই গোধূলী-লগ্ন বলা হয়। এরই মধ্যে এই লগ্নের বিবাহ অনুষ্ঠান শেষ করে নিতে হবে। দ্বিতীয় লগ্ন রাত দশটায়। নুটবিহারীবাবু জানিয়েছেন যে, অত সকাল সকাল সবার সামনে বিয়ের কাজ না করে রাত দশটার লগ্নে করাই ভাল। তিনি ঠিক আটটায় বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে বিবাহ-মণ্ডপে আসবেন। ঐ সময় মেয়েরা মঞ্চে নেমে 'মজার বিবাহ' নাটকের অভিনয় করবেন। সবান্ধব তিনি সেই অভিনয়টা গোড়া থেকে দেখবেন। তারপর তাঁদের বিয়েটা একটু নিরালায় যাতে হয়—সে সম্বন্ধেও অনুরোধ থাকে। নুটবিহারীবাবুর এই অনুরোধ অনুষ্ঠানের কর্মকর্তাদের কাজের পরিকল্পনা অনেকটা সহজ করে দেয়।

প্রকাণ্ড বাড়ি—ভিতরে তু'তিনটে মহল। কোথায় কি হচ্ছে, জানবার যো নেই। বাড়িখানা যেন এক গোলকধাঁধা। অনেক দেখাদেখির পর এই বাড়ি ভীমরুল পছন্দ করেন। গোধূলী-লগ্নেই বাড়ীর ভিতরে একই সঙ্গে তুই মহলে যে তু'-তুটো বিয়ের অনুষ্ঠান বিধিব্যবস্থামত বিচক্ষণ পুরোহিতের তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হচ্ছে, বাইরে তার কোন সাড়াই আসেনি; অবশ্য শঙ্খধ্বনি চেপে রাখা যায় না। কিন্তু দ্বারের পর রুদ্ধ বহু দ্বার অতিক্রম করে তার ক্ষীণ আওয়াজ বায়ু-প্রবাহে বাইরে এলেও, সেটা প্রাসঙ্গিক জেনেই সংশ্লিষ্টমহল সন্তুষ্ট থাকেন।

আটটার মধ্যেই ভিতর মহলের শুভানুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়ে যায়। সে অবস্থায় কন্যাপীঠের কন্যারা তুই জোড়া বর-কনেকে প্রীতিভোজে পরিতৃপ্ত করে বলেন: বিয়ে আলাদা আলাদা হলেও

বাসর কিন্তু একই ঘরে বসবে। সারারাত ধরে বাসর জাগা যাবে। কিন্তু তার আগে 'মজার বিয়ে' দেখা চাই। এক ঘন্টার প্লে, কোন কষ্ট হবে না। আর উপর থেকে দেখবার এমন ব্যবস্থা করা হয়েছে, নিচে থেকে কেউই দেখতে পাবে না নব-বরবধূযুগলকে।

সেই ব্যবস্থাই হয়; পাশাপাশি দুই জোড়া দম্পতি কন্যাপীঠের কন্যাদল পরিবেষ্ঠিতা হয়ে পুষ্পসম্ভারে সাজানো নির্দিষ্ট স্থানটি অলঙ্কৃত করে। নাটিকায় যাঁদের কোন ভূমিকা নেই—তাঁরা এখান থেকেই অভিনয় দেখেন।

নীচের মণ্ডপে নুটবিহারীবাবুর আমন্ত্রিত বন্ধু-বান্ধব ছাড়া, কন্যাপীঠ তথা ভীমরুলের পছন্দমত কতকগুলি বিশিষ্ট নর-নারীও আমন্ত্রিত হ'য়ে এসেছেন। সদানন্দবাবু তাঁর পুলিসবন্ধু নলিনীবাবু ছাড়া বাইরের কাউকে বলেন নাই। তিনি জানিয়ে রেখেছেন, বিয়ের পর তাঁর বাড়ীতে বিশেষ ঘটা করে একটা প্রীতিভোজের আয়োজন করবেন। নসিরামবাবুও তাঁর আত্মীয়-কুটুম্বদের বাদ দিয়ে বিশেষ অন্তরঙ্গ কতকগুলি অফিস-বন্ধুকে মাত্র মিমন্ত্রণ করে আনিয়েছেন—যাঁরা এই রহস্যময় ঘটনাটির সঙ্গে সুপরিচিত।

মণ্ডপ মধ্যে একটি বিশেষ স্থানে বিশেষভাবে পুষ্পদলে সজ্জিত পাশাপাশি দুইখানি 'সিংহাসন' সবার দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। তার একখানি অলঙ্কৃত করেছেন এই বিবাহ-অনুষ্ঠানের বৃদ্ধ বর নুটবিহারী; তাঁর দক্ষিণদিকের আসনগুলিও পুষ্পসজ্জিত, সেগুলিতে বরের বয়স্য রামহরি, সাত-কড়ি, নিতবর চাপলি এবং তাঁর আফিস-সংক্রান্ত ঘনিষ্ঠ বয়োবৃদ্ধদল উপবিষ্ট। নুটবিহারীবাবুর বাম দিকের আসনখানি ভাবী কনের জন্য রাখা হয়েছে। তাঁকে চুপি চুপি বলা হয়েছে, অভিনয় আরম্ভ হলেই কনে এখানে এসে বসবেন। কিন্তু এত লোকের সামনে তিনি লম্বা ঘোমটায় মুখ ঢেকে থাকবেন, আপনি যেন তাঁকে ঘোমটা খোলবার জন্যে পীড়াপীড়ি করবেন না, কিম্বা

এখানে ওঁর সঙ্গে কথাও কইবেন না। কেননা, বিয়ের দিন বিয়ের আগে বর-কনের আলাপ নিষিদ্ধ। মুটবিহারীবাবু সানন্দে প্রস্তাবটির সমর্থন করে বলেছেন—আপনাদের ব্যবস্থা দেখে আমরা ভারি খুশি হয়েছি, কোন দিকে খুঁত রাখেন নি দেখছি।

ঠিক আটটায় ড্রপ উঠল। সেই সঙ্গে লীলা দেবী মঞ্চে এসে দর্শকবৃন্দকে নমস্কার করে বললেন: কন্যাপীঠের কন্যাদের পরিকল্পনায় এই নাট্যাভিনয়। আমাদের সমাজে এক শ্রেণীর বিশিষ্ট শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তির রুচি-প্রবৃত্তির অনুসরণ করে বাস্তবধর্মী এই নাটিকাখানির অভিনয় হবে। আপনারা অনুগ্রহ করে ধৈর্য ধরে শেষ পর্যন্ত অভিনয় দেখেন—এই অনুরোধ।

'রায়বাহাদুর' উপাধিধারী সমাজে গণ্যমান্য এক পদস্থ ব্যক্তি এই কৌতুক নাট্যের নায়ক। প্রথম দৃশ্যেই দেখা গেল—বালিকা বিদ্যালয়ের অঙ্গনে পারিতোষিক বিতরণের সভা। রায়বাহাদুর সভাপতির আসন অলংকৃত করেছেন, তিনিই করবেন পারিতোষিক বিতরণ। ইন্দ্রাণী নাম্নী এক কিশোরী একটি গান গেয়ে সভাপতি বরণ ও সভার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করলেন। রায়বাহাদুর সেই রূপসী মেয়েটিকে দেখে, তার গান শুনে সভাস্থলেই বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। ইন্দ্রাণীর পানে তাঁকে ঘন ঘন তাকাতে দেখে সভাস্থ অনেকেই অবাক হয়ে যান। গান গেয়ে মেয়েটি চলে যাবেন, এমন সময় রায়বাহাদুর তাকে ডেকে—অশোভন হোলেও, তার নাম, ঠিকানা, বাপের নাম, কোথায় পড়াশোনা করে, গান কার কাছে শিখেছে—এই সব জিজ্ঞাসা করেন। তাঁর প্রশ্ন আর ফুরায় না। এই সময় বিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষয়িত্রী তাঁর পাশে এসে হেঁট হয়ে মৃদুস্বরে বললেন: ওকে যেতে দিন রায়বাহাদুর, বড্ডো লেট্ হয়ে যাচ্ছে। এই সংলাপের মধ্যে মেয়েটিই লজ্জা পেয়ে চলে গেল। রায়বাহাদুর হতাশের সুরে বললেন: চলে গেলে ইন্দ্রাণী!

দর্শকদের ভিতর থেকে অনেকেই হেসে ওঠেন। রায়বাহাদুর চীৎকার করে ধমক দেন: হাসছ যে? জানো আমি রিটায়ার্ড সেসন জজ—কত লোককে ফাঁসি দিয়েছি!

বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রীরা উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন। তাঁরা কি আগে জেনেছিলেন—এই বর্ষীয়ান পদস্থ লোকটি এমন পাগল।

তখন তাঁরা স্থির করলেন—তাড়াতাড়ি পুরস্কারগুলো এঁকে দিয়ে বিতরণ করিয়ে বিদেয় দেওয়া হোক। যাঁদের পুরস্কার দেওয়া হবে, তাঁদের নামের তালিকা রায়বাহাদুরকে দিয়ে বলা হলো—নাম দেখে এক একজনকে ডেকে পুরস্কার দিন।

কিন্তু রায়বাহাদুর তালিকা দেখে চটে উঠে বলেন: এর মধ্যে ইন্দ্রাণী দেবীর নাম ত নেই? কেন নেই?

প্রধানা শিক্ষয়িত্রী সবিনয়ে বললেন: ইন্দ্রাণী দেবী ত এবার পরীক্ষা দেন নি, গেল বছর ওঁর এখানকার পড়া শেষ হয়ে গেছে। ভাল গান জানে বলে ওঁকে আনা হয়েছিল।

রায়বাহাদুর একথায় রেগে আগুন। বলেন: অমন গুণবতী মেয়েকে বেগার দিতে ধরে এনেছেন? তা হবে না—ওঁকে আগে পুরস্কার দিতে হবে, সেরা পুরস্কার।

শিক্ষয়িত্রী বলেন: আমাদের ফণ্ড সেটা 'এলাও' করে নি। উৎসবে অনেকেই আসেন, গান করেন, কিন্তু তার জন্যে কাউকে পারিতোষিক দেওয়া হয় না।

রায়বাহাদুর বললেন: আর কাউকে দেওয়া না হোক, আজকের সভায় গান গেয়েছেন বলে ইন্দ্রাণী দেবীকেই সবার আগে পারিতোষিক দিতে হবে।

শিক্ষয়িত্রী বললেন: কিন্তু নির্দিষ্ট সংখ্যক পারিতোষিক আনা হয়েছে একষ্ট্রা পারিতোষিক তো—

রায় বাহাদুর বললেন : আপনাদের ফাণ্ডে টাকে না থাকে, কিম্বা দিতে বাধে, আমি সেটা মেক-আপ্ করে দেব।

এর পরই রায়বাহাদুর পকেট থেকে দামী কলমটি বার করে তালিকার প্রথমে ইন্দ্রাণী দেবীর নামটি বসিয়ে দিয়েই ডাকলেন : শ্রীমতী ইন্দ্রাণী দেবী !

ইন্দ্রাণী ত প্রথমে আসতে চায় না লজ্জায়, কিন্তু চার দিক থেকে যাবার জন্য অনেকেই বলতে থাকায় সে কম্পিত পদে প্রেসিডেণ্টের টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে নমস্কার করতেই তিনি তার পানে চেয়ে সহাস্যে বললেন : গানের জন্যে তুমি ফার্ষ্ট প্রাইজ পাচ্ছ। কিন্তু এঁদের ফণ্ডে একস্ট্রা প্রাইজ নেই, আমিও তৈরি হয়ে আসিনি ; অগত্যা নতুন কেনা পার্কারের এই সোনা-বাঁধানো কলমটি আমি তোমাকে 'প্রাইজ' দিলাম।

যে-কলমে একটু আগে রায়বাহাদুর তালিকায় স্বহস্তে ইন্দ্রাণীর নাম লিখেছিলেন, সেই দামী কলমটি ইন্দ্রাণীর হাতে গুঁজে দিলেন।

চার দিক থেকে 'ক্লাপ' পড়ল। বাইরের একটা ডেঁপো মেয়ে সুর করে বলল : থ্রী চিয়ার্স ফর প্রেসিডেণ্ট রায়বাহাদুর অ্যাণ্ড সংষ্ট্রেস ইন্দ্রাণী দেবী !

এ ঘটনাটি হলো নাটকের সূচনা। এই নিয়ে রীতিমত আলোচনা চলতে লাগল। রায়বাহাদুরও এই ঘটনার পর ইন্দ্রাণীর জন্য অধীর হয়ে পড়লেন। তাঁর নিজের মস্ত সংসার, প্রবীনা স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে, নাতী-নাতনী নিয়ে বহু পরিবার। কিন্তু তিনি সে সব 'go to hell' করে ইন্দ্রাণীকে পাবার জন্যে নানা চাল চালতে লাগলেন। ইন্দ্রাণী নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে, বাপের চাকরি সম্বল। কিন্তু তাঁর আফিসের বড় বাবু রায়বাহাদুরের পরম বন্ধু—একই শ্রেণীর যাত্রী তাঁরা। শেষে ইন্দ্রাণীর বাবা চন্দ্রনাথবাবু এমন বিপাকে পড়লেন, রায়বাহাদুরের হাতে ইন্দ্রাণীকে তুলে না দিলে চাকরি থাকবে না।

সেই অবস্থায় ইন্দ্রাণী বেচারী কন্যাপীঠের শরণ নিলেন এবং কন্যাপীঠ তাঁকে দিলেন অভয়। এরপর শুভ দিন দেখে বিয়ে হয়ে গেল।

বিয়ের পর বাসর ঘর—এই নাটিকার শেষ দৃশ্য। বহু কন্যার মধ্যে বৃদ্ধ বর রায়বাহাদুর এবং দীর্ঘ অবগুণ্ঠনবতী কনে বসে আছেন। বাসর-সঙ্গিনীদের নৃত্যগীত চলেছে, রায়বাহাদুর বাহোবা দিচ্ছেন, এমন সময় সি. আই. ডি. পুলিশের এক ইনেস্‌পেক্টর সেখানে এসে হাজির। কন্যাদের নৃত্যগীত থেমে যায়, ভয়ে চীৎকার করে ওঠে।

রায়বাহাদুর জিজ্ঞাসা করেন: কি ব্যাপার?

গোয়েন্দা চীফ বলেন: স্যার, এক খুনী আসামী—নাম তার পশুপতি দাঁ, ফেরার হয়ে বিয়ের কনে সেজে বেড়াচ্ছে। আজ আমরা খবর পেয়েছি, বাঘের ঘরে ঘোঘ সেঁধিয়েছে, অর্থাৎ আপনিই নাকি একটা ফল্‌স বিয়ের ব্যাপার করে, তাকে সরিয়ে দেবার মতলবে আছেন।

রায়বাহাদুর রাগে কাঁপতে কাঁপতে বলেন: এমন একটা নোংরা কথা তোমরা আমাকে বলতে সাহস কর, ইনেস্‌পেক্টর?

ইনেস্‌পেক্টর বলেন: কি করব স্যার, আমাদের চীফ্‌ স্যার হরিহরের হুকুম! জানেন ত, তিনি নামে হরি হর, কাজেও তাই—এক সঙ্গে পালন ও সংহার-কর্তা।

রায়বাহাদুর চমকে ওঠেন। জানেন—স্যার হরিহর তাঁর পরম শত্রু, আর ইন্দ্রাণীর ব্যাপারে তিনিও নাকি পিছনে লেগেছেন—এমন কথাও শুনেছেন। বললেন: তোমরা কি করতে চাও?

ইনেস্‌পেক্টর বললেন: আপনার পাশে যিনি মেঝে পর্যন্ত লম্বা ঘোমটায় মুখ ঢেকে বসেছেন, ওটা খুলে ওঁর মুখখানা দেখতে চাই।

রায়বাহাদুর শুনেই হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন: সাট্‌ আপ্‌, ইয়ু ব্রুট!

কিন্তু কনেই ঝামেলাটা মিটিয়ে দিলে। সে ঘোমটার ভিতর

থেকে বলে উঠল: ঝামেলার দরকার নেই দারোগাবাবু, আমি আপনার কাজের আসান করে দিচ্ছি, তবে আমার কেসটার একটু সুরাহা করে দেবেন দয়া করে।

সঙ্গে সঙ্গে লম্বা ঘোমটা খুলতেই দেখা গেল—২৫।২৬ বছরের বেঁটে-সেঁটে ষণ্ডামার্কা এক ছোকরার ভীতিপ্রদ মুখ; তিন-চার জায়গায় কাটা দাগ, ওপর পাটির দাঁতগুলো ঠোঁঠের এলাকা পেরিয়ে ঝুলে পড়েছে, দেখবামাত্র চমকে উঠতে হয়।

"হ্যাল্লো—এই ত আমাদের ফেরারী আসামী পশুপতি দাঁ—দাঁত দেখেই ধরেছি। এখন রায়বাহাদুর কি বলতে চান? আপনাকেও তো তাহলে আমাদের সঙ্গে চীফের কাছে যেতে হয়।"

রায়বাহাদুর তখন একবারে বিহ্বল হয়ে পড়েন; শেষে ইনেস্‌পেক্টর বলেন: যদি রায়বাহাদুর এই মর্মে এক একরার করেন, আর কখনো কোন বয়স্থা সুন্দরী মেয়ে দেখে তার পিছনে ছুটবেন না বিয়ে করবার আশায়, তার গার্জেনকে জ্বালাবেন না, তাহলে আমাদের চীফ এ যাত্রা আপনাকে রেহাই দিতে পারেন, নতুবা আমরা আপনারও হাতে—

ইনেস্‌পেক্টর তাঁর পকেট থেকে এক জোড়া হ্যাণ্ডকাপ বার করতেই রায়বাহাদুর সভয়ে বলে উঠলেন: আমি রাজী ইনেস্‌পেক্টর, রাজী। আমার মোহ ভেঙ্গে দিয়েছে এই মজার বিয়ে।

এইখানেই কৌতুক-নাট্যের শেষ—যবনিকা পতন।

কন্যাপীঠের এই কৌতুক-নাট্যের অভিনয় অনেকেই উপভোগ করলেন, আবার কতকগুলি দর্শক বিরক্তও হলেন। দর্শকদের মধ্যে একটা বিতর্কের গুঞ্জন চলেছে, এমন সময় আর এক নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হলো উক্ত নাট্যাভিনয়ের জনপূর্ণ প্রেক্ষাগারে।

সরকারী পদস্থ কর্মচারীর উপযুক্ত পরিচ্ছদধারী এক ব্যক্তি উপবিষ্ট দর্শকদের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে একেবারে লুটবিহারীবাবুর সামনে এসে বললেন: এখানে যাঁরা উপস্থিত আছেন, তাঁদের সকলকেই উদ্দেশ করে আমি বলছি—অভিনয়ের ব্যাপার অনেক সময় বাস্তব হয়ে দাঁড়ায়। নাটকের খুনী আসামী পশুপতি দাঁর ঘটনার সঙ্গে পশ্চিম বাংলা সরকারের হুলিয়াবর্ণিত পলাতক দস্যু বিচ্চুর নাকি অস্তিত্ব আছে অবগুণ্ঠনবতী এই হবু বধূটির মধ্যে! আপনারা শুনলেই হয়ত স্তম্ভিত হবেন।

লুটবিহারীবাবু কথাটা শুনে কাঁপতে কাঁপতে উঠে বলতে থাকেন: প্লে দেখে আপনার মাথা নিশ্চয়ই গরম হয়ে গেছে, তাই আপনি এত বড় কথা—

লীলা দেবী এই সময় তাড়াতাড়ি দ্রুতপদে সেখানে এসে বললেন: কথা-কাটাকাটির দরকার কি, আমি কনের ঘোমটা খুলে দিচ্ছি, আপনারা দেখুন—

কিন্তু ঘোমটার ভিতর থেকে যে মূর্তি বেরিয়ে তার আকর্ণ বিস্তৃত দন্তরাজি বিকাশ করে বিচিত্র ভঙ্গিতে দাঁড়াল, তাকে দেখেই লুটবিহারীবাবুর অবস্থা ভির্মী যাবার মত হলো, তিনি টলতে টলতে বসে পড়লেন তাঁর আসনে।

ভীমরুল তাঁর পানে চেয়ে তর্জনের সুরে সুধালেন: এখন কি জবাব দেবেন?

লুটবিহারী ভাঙ্গাগলায় চীৎকার করে ওঠলেন: এ পলিসি! চক্রান্ত! ষড়যন্ত্র! আমি সহজে ছাড়ব না।

ভীমরুলও তাঁর গলার স্বর চড়িয়ে বললেন: আগে বিচ্চুর ব্যাপার থেকে সামলান ত!

ব্যাপার দেখে সদানন্দবাবুও তাঁর বন্ধু নলিনীকে নিয়ে এগিয়ে

এলেন। শ্রান্তি এবং ভ্রান্তি বশতঃ ভীমরুল এই সময় চোখের পুরু চশমাটি খুলে তার পাথরগুলি রুমালে মুছছেন, এমন সময় সদানন্দবাবু একেবারে সামনে এসে তার একখানা হাত ধরে বললেন: তুমি কে? বল—তুমি কে?

ভীমরুল স্থাণুর মত স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন, কোন কথা তাঁর মুখে নেই।

সদানন্দবাবু এবার কণ্ঠস্বর গাঢ় করে বললেন: তুমি না বল, আমি বলছি—তুমি পরিমল, আমার নিরুদ্দিষ্ট ছেলে—

কথার সঙ্গে সঙ্গে এত বড় এই দৃঢ়চেতা কঠিনমনা পুরুষটির ছুই চোখ দিয়ে যেন অশ্রুর বন্যা নামল। তিনি এবার দু'হাতে পরিমলকে জড়িয়ে ধরে উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে বলে উঠলেন: এইবার ধরেছি, এতদিনে পেয়েছি! আমার পরিমল—আমার ছেলে! ভাই নলিনী, এই পরিমল—আমার ছেলে।

পিতার আলিঙ্গনের মধ্য থেকেই ঝুঁকে নীচু হয়ে পরিমল তাঁর পদধূলি নিয়ে মাথায় দিলেন। লীলাদেবী নিকটেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি বললেন: কিন্তু সমাজ এঁকে ভীমরুল বলেই জানে বাবা! যদিও অনেক আগে আমি এঁকে আপনার সেই নিরুদ্দিষ্ট ছেলে বলে চিনেছিলুম। কিন্তু জেনেও ওঁর ধ্যান ভাঙ্গিনি।

লীলাদেবীও এগিয়ে গিয়ে হেঁট হয়ে সদানন্দবাবুর পদতলে মাথাটি নত করে দিলেন। সদানন্দবাবু জিজ্ঞাসা করলেন: তুমি কে মা?

লীলাদেবী বললেন: এলাহাবাদের শ্রীমতী প্রতিমা। এখানে কন্যাপীঠের প্রেসিডেন্ট লীলা দেবী।

বিস্ময়ের সুরে সদানন্দবাবু বললেন: তুমি প্রতিমা! বেশ, বেশ, ঈশ্বর মঙ্গলময়, এখন আমি সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করব। তোমার মা কোথায়, মা?

লীলাদেবী নীরবে ঊর্ধ্বে তাঁর চাঁপার কলির মত আঙ্গুলটি তুলে জানালেন—তিনি ঊর্ধ্বলোকে চলে গেছেন।

নলিনীবাবু বললেন: তোমাদের কথা আমি সব শুনেছি। আর তোমরা আজকের ব্যাপারের সবই জানো। এখন এসো, আমি নিজে তোমাকে পরিমলের হাতে সমর্পণ করে বন্ধুর ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করি।

লীলাদেবী বললেন: আপনার অপার দয়া! কিন্তু কাকাবাবু, আমার ত্যাগের ব্রত ত পূর্ণ হয়নি এখনো—

সদানন্দবাবু সুধালেন: ত্যাগের ব্রত—

পরিমল গাঢ়স্বরে জানালেন: পণপ্রথার সঙ্গে আমাদের সমাজের অনাচারগুলো বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত, আমরা করব এই ব্রতের সাধনা। সে পর্যন্ত পরিমলের পরিচয়—ভীমরুল।

সঙ্গে সঙ্গে লীলাদেবীও কথাগুলির যেন প্রতিধ্বনি করলেন: আর আমারও লক্ষ্যস্থল, ব্রতধর্ম এই—কন্যা-পীঠ।